মে ২০০৫ পনেরো টাকা

আনন্দমেলা

ভূত আছে, নাকি নেই? ভূতের গল্প কিন্তু আছে!

বারো ভূতের গল্প

বিশেষ সংখ্যা

লিখেছেন সত্যজিৎ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দুলেন্দ্র ভৌমিক, অশোক বসু, ইন্দ্রাণী লস্কর, অমিতাভ পাল, জয়দীপ চক্রবর্তী, বিপুল দাস, সৌগত চক্রবর্তী, সুকুমার রুজ, শমিত মণ্ডল ও বিপুল মজুমদার।



● কোন ভূত কীরকম, এই নিয়ে মজাদার লেখা

ভূতের রকমসকম

● দেশ-বিদেশের হানাবাড়ির কথা

কলকাতার ভুতুড়ে বাড়ি

বিদেশের ভুতুড়ে বাড়ি

● রঙিন কমিক্‌স মরুভূমির অভিশাপ

এ ছাড়া সমস্ত নিয়মিত বিভাগ

আনন্দমেলা

৩১ বর্ষ ১ সংখ্যা মে ২০০৫ বৈশাখ ১৪১২

বিশেষ সংখ্যা

বারো ভূতের গল্প

ভূত সত্যিই আছে কিনা, সে-নিয়ে তর্কের শেষ নেই। কিন্তু মানুষ যতদিন থাকবে, ভূতও থাকবে ততদিন। আজকের দিনের টিভি, পাতাল রেল, সেল ফোন যখন মিউজিয়ামের জিনিস হয়ে যাবে, তখনও কিন্তু ভূত থাকবে। আসলে ভূত যে আছে আমাদের মনের মধ্যে! আমরাই ভূতকে সৃষ্টি করেছি মনের ইচ্ছে থেকে। তাই পৃথিবী জুড়ে ভূত নিয়ে কল্প-কাহিনিরও শেষ নেই। এই বিশেষ ভূতের গল্প সংখ্যায় এরকমই বারোটি ভূতের গল্প নিয়ে 'বারো ভূতের গল্প'। লিখেছেন **সত্যজিৎ রায়** ব্রাউন সাহেবের বাড়ি ৮, **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়** ধুলোটে কাগজ ১৯, **দুলেন্দ্র ভৌমিক** জোড়া ভূতের কান্না ২৮, **অশোক বসু** যত অন্ধকার তত ভূত ৩৩, **ইন্দ্রাণী লস্কর** কপালের কাটা দাগটা ৩৭, **অমিতাভ পাল** আঁকশির মতো হাত ৪৮, **জয়দীপ চক্রবর্তী** নারায়ণগঞ্জে দু'রাত ৫৭, **বিপুল দাস** কুসুমডাঙার আমগাছ ৬২, **সৌগত চক্রবর্তী** ডান হাতের জড়ুল ৬৯, **সুকুমার রুজ** আমবাগানের ভূত ৭২, **শমিত মণ্ডল** নিস্তারিণীর হাসি, ৭৭ এবং **বিপুল মজুমদার** ভুতুড়ে রোলার ৮০।



ভূতের রকমসকম ৪২



ভূত থাকুক বা না থাকুক, ভূত আছে দেশ-বিদেশের মানুষের মনে। মানুষ আর ভূতের মধ্যে রয়েছে অনেক প্রভেদ। মানুষ গৃহী আর অন্নপায়ী। কিন্তু ভূত নিরালম্ব, বায়ুভুক। মানুষের ছায়া পড়লেও ভূতের নাকি ছায়া পড়ে না। কেউ-কেউ ভূত দ্যাখে, কেউ-কেউ আবার ভূত দেখতে পায় না। আবার এক-একটি ভূতের আচারব্যবহারও নাকি এক-একরকম। ভূতের অদ্ভুত চালচলন ও মজার কাণ্ডকারখানার কথা জানিয়েছেন কার্তিক মজুমদার।

অন্যান্য পাতায়

হানাবাড়ি

ধারাবাহিক উপন্যাস

ধারাবাহিক রঙিন কমিক্স

খেলাধুলো

প্রচ্ছদ: সমীর সরকার

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক: অভীক সরকার।
বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর দু' টাকা।
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।



'ডাকবাক্স' নেই কেন

ডাকবাক্স না দেখতে পেয়ে 'আনন্দমেলা'র উপর খুব রেগে আছি। আমি চাই, এই বিভাগটি ফের চালু হোক। আনন্দমেলায় কম্পিউটার নিয়ে কোনও লেখা থাকলে খুব ভাল লাগবে। 'গোখরো দ্বীপের ডাকিনী' খুব ভাল লেগেছে।

শুভম মুখোপাধ্যায়
সালকিয়া হিন্দু হাই স্কুল
সালকিয়া, হাওড়া

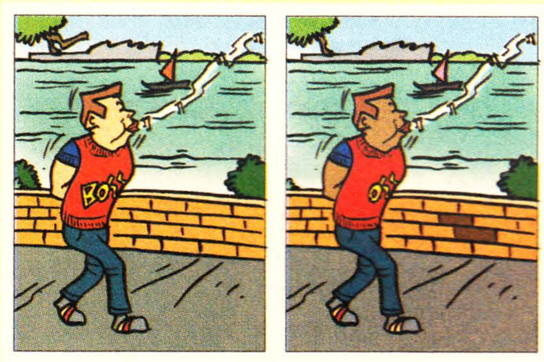
পরিবেশ দূষণ নিয়ে লেখা চাই

'আনন্দমেলা' পত্রিকা নিয়মিত পড়ি। ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'গা ছমছম' উপন্যাসের তৃতীয় কিস্তি পড়ে দারুণ লাগল। আনন্দমেলায় পরিবেশ দূষণ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে কোনও লেখা ছাপা হলে উপকৃত হব। 'রোবো-পুলিশ'-এর মতো উপন্যাস এবং 'রাতের ওয়েটিং রুম'-এর মতো গল্প আরও ছাপলে খুশি হব।

বিশ্বনাথ নস্কর
অষ্টম শ্রেণি, লেক ভিউ হাই স্কুল

ন'টি অমিল

ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। মার্চ সংখ্যা 'আনন্দমেলা' পড়লাম। প্রথম গল্প এবং অন্য গল্পগুলো পড়ে খুব ভাল লাগল। 'অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো' বিভাগে কয়েকটি ভুল চোখে পড়ল। মোট অমিল রয়েছে ন'টি, অথচ উত্তরে লেখা হয়েছে মোট অমিলের সংখ্যা আট। 'শব্দসন্ধান' বিভাগটিতেও ভুল চোখে পড়ল। ৩-এর পাশাপাশি ঘর থাকলেও সংকেত দেওয়া নেই, আবার ২-এর পাশাপাশি সংকেত সূত্র দেওয়া আছে অথচ ঘর দেওয়া নেই। তাই শব্দসন্ধান সমাধান করতে আমার একটু অসুবিধে হয়েছে।



অন্তর্লীনা সিকদার
লেকটাউন, কলকাতা

খুব ভাল লেগেছে মার্চ সংখ্যা

'আনন্দমেলা' পড়তে এখন আরও ভাল লাগছে। কমিক্স পড়তে সবচেয়ে ভাল লাগে। তবে উপন্যাস পড়তে আমার একেবারে ভাল লাগে না। মার্চ মাসের আনন্দমেলায় তো একেবারে ফাটাফাটি কাণ্ড! বারোটি গল্পই দুর্দান্ত। এর মধ্যে তপন মিত্রের 'যমজ ভূত', প্রচেত গুপ্তের 'ঝগড়ুটে ফাইভ', অরবিন্দ ভট্টাচার্যের 'হনুম্যান', সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'লটারির গেরো', ও সুমন নাথের 'ভূতবাগান' অনবদ্য।

পূজা ভট্টাচার্য
পঞ্চম শ্রেণি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক)

ফাঁকা লেগেছে

মার্চ সংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় 'গাবলু', 'ডাকবাক্স', 'রিপ্লির আজব কিন্তু সত্যি' এই বিভাগগুলো না থাকায় আনন্দমেলা খুব ফাঁকা-ফাঁকা লেগেছে। আমার অনুরোধ, এই বিভাগগুলোকে দয়া করে ফিরিয়ে দিন।

সুদীপন সুর
সপ্তম শ্রেণি, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল

'বই সমালোচনা' বিভাগ

গত আট মাস ধরে 'আনন্দমেলা'র নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার গল্প, কমিক্স ও অন্যান্য বিভাগ খুবই আকর্ষক। আগে আনন্দমেলায় একটি 'বই সমালোচনা' বিভাগ ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। এতে আমরা খুব হতাশ হয়েছি। এই বিভাগটি ফিরিয়ে আনলে খুব ভাল লাগবে।

আর-একটা কথা, এই পত্রিকা মাসে একবার বেরোয়, ফলে আমাদের অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। এর ফলে ধারাবাহিক বিভাগগুলোর অনেক কিছুই ভুলে যাই। পত্রিকাটি মাসে দু'বার প্রকাশ করলে আনন্দিত হব।

মণিশঙ্কর মাইতি
দশম শ্রেণি, বালিঘাই ফকিরদাস হাই স্কুল

খেলা নিয়ে আরও লেখা চাই

মাঝে-মাঝেই আমাদের প্রিয় 'ডাকবাক্স' থাকছে না 'আনন্দমেলা'র পাতায়। মনের কথা বলার মতো এই বিভাগটি আবার চাই। পৌলোমীর উপর সুভাষ সরকারের লেখাটি ভাল লাগল। এই রকম লেখা পড়তে সব সময়ই ভাল লাগে।

'কুইজ' বিভাগটিকে আরও অভিনবভাবে দেখতে চাই। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'গা ছমছম' এক কথায় অনবদ্য। মার্চ সংখ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পটি অসাধারণ।

'পাঠকের পাতা' আবার দু'পাতার হলে ভাল হয়। খেলার আরও লেখা চাই। মনীষীদের নিয়ে নানা শিক্ষামূলক লেখা আনন্দমেলায় দেখতে চাই।

প্রদীপকুমার দত্ত
চাঁপাতলা, চুঁচুড়া, হুগলি

পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পারো 'ই-মেল'-এও।
ঠিকানা:
anandamela@ abpmail.com
লেখকের স্কুলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।



আশ্চর্য ঘড়ি

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-র ২৫ বছরের ছাত্রী গৌরী নন্দা তৈরি করেছে আশ্চর্য এক ঘড়ি। ভোরবেলা, নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিতে জুড়ি নেই এই ঘড়ির। যত ঘুমকাতুরে লোকই হোক না কেন, বিশেষ প্রযুক্তির তৈরি এই ঘড়ি তাকে ঘুম থেকে ‘ডেকে’ তুলবেই। ধরা যাক, ভোর ঠিক পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠতেই হবে কাউকে। রাতে শুতে যাওয়ার আগে এই ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখলেই হবে। ভোর পাঁচটা বাজতে না-বাজতেই কাজ শুরু করে দেবে বুদ্ধিমান এই অ্যালার্ম ঘড়ি। প্রথমে টেবিল থেকে লাফিয়ে নীচে নামবে। তারপর গড়াতে-গড়াতে চলে যাবে ঘুমন্ত মানুষটির একেবারে কাছে। একটানা বাজতেই থাকবে অ্যালার্ম। এর পর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়া ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে বেচারি ঘুমকাতুরে ওই মানুষটির? মেঝের উপর দিয়ে যাতে স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে-গড়িয়ে যেতে পারে সেজন্য দুটো রবারের চাকা লাগানো আছে ঘড়িতে।



কার্পেট দিয়ে মোড়া এই ঘড়ি (উপরের ছবি), তাই মাটিতে লাফিয়ে নামার সময় আঘাত লাগবে না কোনও জায়গায়। ঘড়িটির ভিতরে রয়েছে একটি কম্পিউটার চিপ। ঠিক কতটা দূরে গিয়ে থামবে ঘড়িটি, সেটা ঠিক করে দেবে এই কম্পিউটার চিপ।

মহাকাশে ডিসকভারি

দু'বছর আগে ভয়ংকর এক দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়েছিল মহাকাশযান কলম্বিয়া। সেই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন কল্পনা চাওলাসহ সাতজন মহাকাশচারী। তারপর থেকে মানুষসমেত আর কোনও মহাকাশযান পাঠায়নি নাসা। তবে এখন ডিসকভারিকে মহাকাশে পাঠানোর জন্য মোটামুটি প্রস্তুত নাসা। নাসার ফ্লাইট ডিরেক্টর লিয়র কেন-এর মতে মহাকাশ অভিযানে বিপদ আছে সব সময়ই। আর সেই বিপদের আশঙ্কায় তো আর বন্ধ থাকতে পারে না মহাকাশযাত্রা। আর তাই খুব শিগগিরই পৃথিবীর মাটি ছাড়বে ডিসকভারি। মোট ১২ দিন মহাকাশে থাকবে এই মহাকাশযানটি।

চাঁদের দেশে

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অভিভূত। কারণ, পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদে তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন এমন এক জায়গা, যা সব সময় ভেসে চলেছে সূর্যের আলোয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এর খুব কাছেই রয়েছে সেই জায়গা যেখানে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে বরফ। চাঁদের উত্তর মেরুতে, যেখানে রয়েছে পিয়ারি, হারমাইট আর রোজ়্‌ডেস্তভেনস্কি নামের তিনটি ক্রেটার, তার খুব কাছেই রয়েছে সর্বক্ষণ সূর্যের আলোয় প্লাবিত সেই জায়গা। ওই জায়গার তাপমাত্রা মাইনাস ৬০ ডিগ্রি থেকে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বিজ্ঞানীদের মতে, ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানুষকে যদি চাঁদে বসবাস করতে হয়, তা হলে এর মতো আদর্শ জায়গা আর নেই।

পাপারোর কেরামতি

বাড়িতে যদি পাপারো থাকে তা হলে ছোট ছেলেমেয়েরা যেন হাতে চাঁদ পেয়ে যাবে। কারণ, ছোটদের সঙ্গে গান গাওয়া থেকে আরম্ভ করে কুইজ়ের দারুণ-দারুণ সব প্রশ্ন করা, তারপর সেই প্রশ্নের উত্তর কে সঠিক দিচ্ছে আর কে ভুল দিচ্ছে তা ধরে ফেলা—এ-সবই জলভাত পাপারোর কাছে। পাপারো কিন্তু মানুষ



নয়, ছোটখাটো এক রোবট। লম্বায় সাড়ে ৩৮ সেন্টিমিটার। সেকেন্ডে ২০ সেন্টিমিটার গতিবেগে হাঁটতেও পারে পাপারো। পাপারোকে তৈরি করেছে জাপানের জুনিচি ওসাডা কোম্পানি।

জয় সেনগুপ্ত

গত সংখ্যার প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'নববর্ষের স্বপ্ন-সফর'। আমরা কবিতার চারটি লাইন লিখে দিয়েছিলাম—'নতুন বছরে কেউ চাঁদে যাক/কেউ যাক উড়ে মঙ্গলে/ আমি যেতে চাই পয়লা বোশেখে/ফেলুদাকে নিয়ে জঙ্গলে।' তোমাদের বলা হয়েছিল, কবিতার শেষ চারটি লাইন লিখে পাঠাতে। তোমাদের পাঠানো কবিতা থেকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিসেবে তিনটি কবিতা ছাপা হল এই সংখ্যায়। সেইসঙ্গে ছাপা হল আরও কয়েকটি সুন্দর কবিতাও।

এবারের প্রতিযোগিতা

'পাঠকের পাতা'য় প্রতিযোগিতার জন্যে পাঠানো লেখা বা ছবি থেকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিসেবে তিনটি লেখা বা ছবি বেছে নিয়ে আকর্ষক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তাই এই বিভাগে পাঠকদের লেখার বা ছবির সঙ্গে সম্পূর্ণ ঠিকানা (পিনকোড ও টেলিফোন নম্বরসহ) অবশ্যই পাঠাতে হবে। **এই সংখ্যায় যারা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছ, লেখার সঙ্গে তোমরা তোমাদের বাড়ির সম্পূর্ণ ঠিকানা পাঠিয়েছিলে।** আমরা তোমাদের পুরস্কার শিগগির পাঠিয়ে দেব। এ মাসে তোমরা সকলেই নতুন ক্লাসে উঠেছ। নতুন বই, নতুন বন্ধু, নতুন ক্লাসরুম...এক নতুন আনন্দের দেশ। কেমন কাটল নতুন ক্লাসের প্রথম দিন, ১০টি বাক্যে লিখে পাঠাও গদ্যটি। স্কুলের যে-কোনও ছাত্রছাত্রী, যারা ফোর থেকে এইট-এ পড়ো, তারাই লিখে পাঠাতে পার। লেখাটি হতে হবে মৌলিক এবং অপ্রকাশিত। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে লেখাটি প্রত্যয়িত করিয়ে নিতে হবে।
সেরা তিনটি লেখা ছাপা হবে 'আনন্দমেলা'য়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি লেখাও ছাপা হবে। লেখাটি ২০ মে ২০০৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে নীচের ঠিকানায়।

'নতুন ক্লাসের প্রথম দিন'
পাঠকের পাতা
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০১

প্রথম

শুনে ফেলু বলে, "তোপসে, জটায়ু,
রেডি হও লোটা-কম্বলে।
পেলে রহস্যভেদ করা যাবে,
মগজাস্ত্রের সম্বলে।"

কাব্য ব্যানার্জি
ষষ্ঠ শ্রেণি
এম পি বিড়লা ফাউন্ডেশন এইচ এস স্কুল
কলকাতা

দ্বিতীয়

আর সাথে যাবে শার্লক হোমস
ঘনাদা টেনিদা সকলে,
করব সেথায় হাজার হুল্লোড়
প্রাণ খুলে ভাই মন খুলে।

সাম্যদীপ সাহা
পঞ্চম শ্রেণি
লবণহ্রদ বিদ্যাপীঠ
কলকাতা

তৃতীয়

চোরাশিকারের হাত থেকে বন,
পশুপাখিদের বাঁচাতে,
দয়া করে কেউ 'হ্যাঁচ্চো' কোরো না
আমাদের যাওয়া কাঁচাতে!

অরণ্যসোম মুখোপাধ্যায়
অষ্টম শ্রেণি
পাঁচাল উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁকুড়া

তোপসে-জটায়ু থাকবে না কেউ,
থাকব না কোনও রহস্যে।
স্বপ্ন সফর কাটাব শুধু,
দু'জনে মিলে সহাস্যে।

পৃথ্বীশ দত্ত
পঞ্চম শ্রেণি
বসিরহাট হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা

কতই মজা করব দু'জন
গভীর সেই জঙ্গলেতে,
নববর্ষের দিনটি শুধুই
আনন্দেতে থাকব মেতে।

শ্রীকণা সরকার
সপ্তম শ্রেণি
কল্যাণী বিধান গার্লস, নদিয়া

হয়ে তোপসের মতো সহকারী,
ধরব আমরা চোরাশিকারি।
জটায়ু লিখবে নতুন গল্প,
বন্ধুরা হবে অবাক ভারী!

তনুশ্রী দাস
বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয়
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ফেলু গোয়েন্দা আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট
ফন্দি এঁটে যাব কনস্ট্যান্ট।
জঙ্গলদস্যুরা হবে কুপোকাত
বুদ্ধির জোরে করব বাজিমাত!

দেবাঙ্গনা দে
সপ্তম শ্রেণি
বসন্তকুমারী বালিকা বিদ্যাপীঠ,
চাকদহ, নদিয়া

মঙ্গলে গিয়ে মেতে থাক ওরা
প্রাণসন্ধানে ভরপুর
ফেলুদাকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে
আনন্দে মাতি দিনদুপুর।

তিতিপর্ণা বটব্যাল
আরামবাগ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
হুগলি

সেখানে দাঁড়িয়ে টিনটিনদাদা
সঙ্গে রয়েছে তোপসে
খাট থেকে আমি পড়েছি হঠাৎ
কোমরে লেগেছে জোরসে।

অগ্নি বসু
আগরপাড়া মহাজাতি বিদ্যাপীঠ
উত্তর ২৪ পরগনা

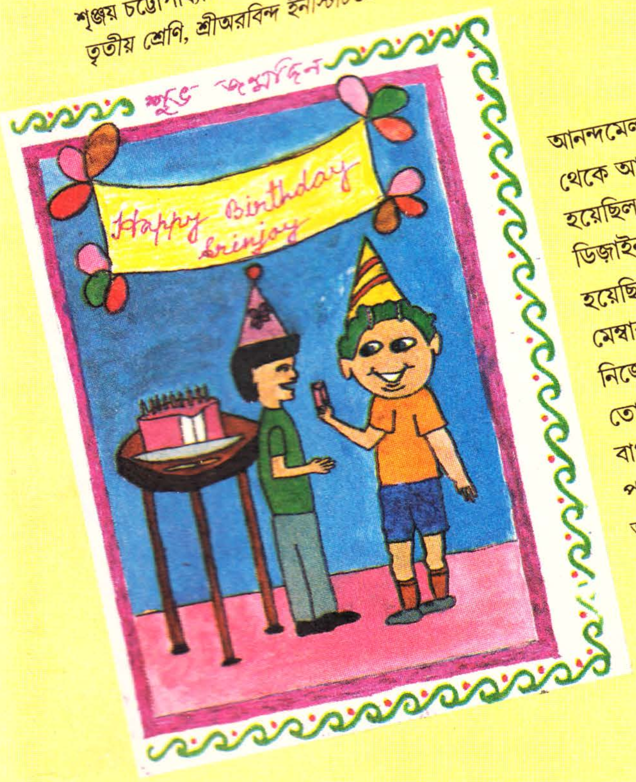
স্বাগত জানাতে নববর্ষে
ভাসব আমি খুশির জোয়ারে
কল্পনা শেষে করব সফল
নববর্ষের স্বপ্ন-সফরে।

সৌগত ভট্টাচার্য
ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশন
জলপাইগুড়ি

তোপসে আর জটায়ুকে আমি
মোটেই নেব না সঙ্গে
ওরা ছাড়া কি রহস্যভেদ
করা যায় নাকো বঙ্গে?

ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়
বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন
কলকাতা

প্রথম
শৃঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
তৃতীয় শ্রেণি, শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন



আনন্দমেলা ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল ‘বার্থডে কার্ড ডিজ়াইন কনটেস্ট’। বলা হয়েছিল, তোমরা যারা ক্লাব মেম্বার, তারা বানিয়ে পাঠাও নিজের জন্মদিনের কার্ড। তোমরা অনেকেই নিজের বার্থডে কার্ড নিজেই বানিয়ে পাঠিয়েছ। তার মধ্যে থেকে আমরা বেছে নিয়েছি সেরা তিনটি কার্ড। সেই তিনটি সেরা কার্ড ছাপা হল এই সংখ্যায়।

দ্বিতীয়
রিষভ দত্ত
দ্বিতীয় শ্রেণি
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল



আনন্দমেলা ক্লাবের ‘সামার ওয়ার্কশপ’

সকলেরই অ্যানুয়াল পরীক্ষা মোটামুটি শেষ। সামনেই একটা ল-ম্বা গরমের ছুটি। রোদের তাপে সবাই হাঁসফাঁস, ঘরে-বাইরে দেদার বিক্রি হবে নিম্বুপানি! কিন্তু তোমরা কিছু স্পেশ্যাল প্ল্যান করেছ কি এবারের ছুটি কাটানোর? নাকি অন্যবারের মতো এবারও পাড়ায় ক্রিকেট-ফুটবল খেলে আর টিভি দেখে বা বই পড়েই কাটিয়ে দেবে ছুটিটা? যদি এখনও প্ল্যান না করে থাকো, তা হলে আনন্দমেলা ক্লাবের সঙ্গে চলে এসো। তোমাদের জন্য আমরা আয়োজন করেছি একটা মজার ওয়ার্কশপের। এখানে শেখানো হবে অনেক মজার জিনিস। যেমন, শ্যাডোগ্রাফি, আর্ট অফ কমিউনিকেশন, গ্লাস পেন্টিং, অরিগামি, পুতুল তৈরি ইত্যাদি। একবার শিখে নিয়ে তারপর বাড়িতে বসে সেগুলো তৈরির মজাই আলাদা। আর আনন্দমেলা ক্লাবের অনুষ্ঠান মানেই নতুন বন্ধু বানানোর ফাটাফাটি সুযোগ! এই ওয়ার্কশপ সমস্ত আনন্দমেলা ক্লাব সদস্যদের জন্য একেবারে ফ্রি! তবে সদস্যদের অবশ্যই আগে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। তার জন্য কোনও টাকা দিতে হবে না! আর যারা এখনও সদস্য হওনি, এই ওয়ার্কশপে যোগ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে তাদেরও। সুতরাং দেরি না করে সদস্য হওয়ার এবং নাম নথিভুক্ত করার জন্য আজই যোগাযোগ করো নীচে দেওয়া নম্বরে।

যোগাযোগ: (০৩৩) ২৪৫৪ ৬২১২ (সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে)



তৃতীয় নীলায়ন চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় শ্রেণি, *মডার্ন স্কুল (প্রাথমিক)*

ব্রাউন সাহেবের বাড়ি

সত্যজিৎ রায়

ব্রাউন সাহেবের ডায়রিটি হাতে আসার পর থেকেই ব্যাঙ্গালোর যাবার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। সেটা এল বেশ অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমাদের বালিগঞ্জ স্কুলের বাৎসরিক রি-ইউনিয়নে দেখা হয়ে গেল আমার পুরনো সহপাঠী অনীকেন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে। অনীক বলল সে ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে চাকরি করছে। 'একবার ঘুরে যা না এসে আমার ওখানে। দ্য বেস্ট প্লেস ইন ইন্ডিয়া! একটা বাড়তি ঘরও আছে আমার বাড়িতে। আসবি?'

অনীক স্কুলে থাকতে আমার খুবই বন্ধু ছিল। তারপর যা হয় আর কী। কলেজ হয়ে গেল দু'জনের আলাদা। তা ছাড়া ও বিজ্ঞান আর আমি আর্টস। দু'জনে প্রায় উলটোমুখো রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। মাঝে ও আবার চলে গেল বিলেতে। ফলে ক্রমে দু'জনের বন্ধুত্বের মধ্যেও অনেকটা ব্যবধান এসে পড়ল। আর আজ প্রায় বারো বছর পর তার সঙ্গে দেখা। বললাম, 'গিয়ে পড়তে পারি। কোন সময়টা ভাল?'

'এনি টাইম। ব্যাঙ্গালোরে গরম নেই। সাধে কি জায়গাটা সাহেবদের এত প্রিয়? তুই যখনই আসতে চাস আসিস। তবে সাতদিনের নোটিশ পেলে ভাল হয়।'

যাক, তা হলে ব্রাউন সাহেবের বাড়িটা দেখার সৌভাগ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু তার আগে সাহেবের ডায়রিটার কথা বলা দরকার।

আমি হলাম যাকে বলে পুরনো বইয়ের পোকা। ব্যাঙ্কে কাজ করে প্রতি মাসে যা রোজগার হয়, তার অন্তত অর্ধেক টাকা পুরনো বই কেনার পিছনে খরচ হয়। ভ্রমণকাহিনী, শিকারের গল্প, ইতিহাস, আত্মজীবনী, ডায়রি—কতরকম বই না গত পাঁচ বছরে জমে উঠেছে আমার। পোকায় কাটা পাতা, বার্ধক্যে ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া পাতা, ড্যাম্পে বিবর্ণ হওয়া পাতা—এসবই আমার কাছে অতি পরিচিত এবং অতি প্রিয় জিনিস। আর পুরনো বইয়ের গন্ধ—এর জুড়ি নেই। অগুরু কস্তুরী গোলাপ হাসনুহানা—মায় ফরাসি সেরা পারফিউমের সুবাস এই দুটো গন্ধর কাছে হার মেনে যায়।

এই পুরনো বই কেনাই আমার একমাত্র নেশা, আর পুরনো বই কিনতে গিয়েই পাওয়া ব্রাউন সাহেবের ডায়রিটা। বলে রাখি এ ডায়রি কিন্তু ছাপা ডায়রি নয়—যদিও সেরকম ডায়রিও আমার আছে। এ ডায়রি একেবারে খাগের কলমে লেখা আসল ডায়রি। লাল চামড়ায় বাঁধানো সাড়ে তিনশো পাতার রুলটানা খাতা। ছ' ইঞ্চি বাই সাড়ে চার ইঞ্চি। মলাটের চারপাশে সোনার জলের নকশা করা বর্ডার, তার মাঝখানে সোনার ছাপার অক্ষরে লেখা সাহেবের নাম—জন মিডলটন ব্রাউন। মলাট খুললে প্রথম পাতায় সাহেবের নিজের হাতে নাম সই, তার নীচে সাহেবের ঠিকানা—এভারগ্রিন লজ, ফ্রেজার টাউন, ব্যাঙ্গালোর—আর তার নীচে লেখা—জানুয়ারি, ১৮৫৮। অর্থাৎ এ ডায়রির বয়স হল একশো তেরো। এই ব্রাউন সাহেবের নাম লেখা অন্য আরো খানকতক বইয়ের সঙ্গে ছিল এই লাল চামড়ায় বাঁধানো খাতাটা। নামকরা বইয়ের তুলনায় দাম খুবই কম। মকবুল চাইল কুড়ি, আমি বললাম দশ, শেষটায় বারো টাকার বিনিময়ে বইটা আমার সম্পত্তি হয়ে গেল। ব্রাউন যদি নামকরা কেউ হতেন তা হলে এই বইয়ের দাম হাজার টাকা হতে পারত।

ডায়রিটাতে তখনকার দিনের ভারতবর্ষে সাহেবদের দৈনন্দিন জীবনের বাইরে আর কিছু জানতে পাব এমন আশা করিনি। সত্যি বলতে কী, প্রথম শ'খানেক পাতা পড়ে তার বেশি পাইওনি। ব্রাউন সাহেবের পেশা ছিল ইস্কুলমাস্টারি। ব্যাঙ্গালোরের কোনও একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সাহেব নিজের কথাই বেশি বলেছেন; মাঝে মাঝে ব্যাঙ্গালোর শহরের বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় তখনকার বড়লাটের গিন্নি লেডি ক্যানিং-এর ব্যাঙ্গালোর আসার ঘটনা বলেছেন, ব্যাঙ্গালোরের ফুল ফল গাছপালা ও তাঁর নিজের বাগানের কথা বলেছেন। এক এক জায়গায় আবার ইংল্যান্ডের সাসেক্স অঞ্চলে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, আর তাঁর পিছনে-ফেলে আসা আত্মীয়স্বজনের কথা বলেছেন। তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথের উল্লেখও আছে, তবে স্ত্রীটি কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন।

সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সাইমন নামে কোনও এক ব্যক্তির বারংবার উল্লেখ। এই সাইমন যে কে



ছিলেন—তাঁর ছেলে না ভাই না ভাগ্নে না বন্ধু না কি—সেটা বোঝার কোনও উপায় ডায়রিতে নেই। তবে সাইমনের প্রতি ব্রাউন সাহেবের যে একটা গভীর টান ছিল সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। সাইমনের বুদ্ধি, সাইমনের সাহস, সাইমনের রাগ অভিমান দুষ্টুমি খামখেয়ালিপনা ইত্যাদির কথা বারবার আছে ডায়রিতে। সাইমন অমুক চেয়ারটায় বসতে ভালবাসে, আজ সাইমনের শরীরটা ভাল নেই, সাইমনকে আজ সারাদিন দেখতে পাইনি বলে মনখারাপ—এই ধরনের সব খুঁটিনাটি খবরও আছে। আর আছে সাইমনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর। ২২শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বজ্রাঘাতে সাইমনের মৃত্যু হয়। পরের দিন ভোরবেলা ব্রাউন সাহেবের বাগানে একটা বাজে ঝলসে যাওয়া ইউক্যালিপটাস গাছের পাশে সাইমনের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

এর পর থেকে একটা মাস ডায়রিতে প্রায় আর কিছুই লেখা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তার মধ্যে শোক আর হতাশার কথা ছাড়া আর কিছু নেই। ব্রাউন সাহেব দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন—কিন্তু সাইমনের আত্মা থেকে দূরে সরে যেতে তাঁর মন চায়নি। সাহেবের স্বাস্থ্যও যেন অল্প অল্প ভেঙে পড়েছে। 'আজও স্কুলে গেলাম না' কথাটা পাঁচ জায়গায় বলা হয়েছে। লুকাস বলে একজন ডাক্তারের উল্লেখও আছে। তিনি ব্রাউন সাহেবকে পরীক্ষা করে ওষুধ বাতলে গেছেন।

তারপর হঠাৎ—২রা নভেম্বর—ডায়রিতে এক আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ; এবং এই ঘটনাই আমার কাছে ডায়রির মূল্য হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্রাউন সাহেব এ ঘটনাটা লিখেছেন রোজকার নীলের বদলে লাল কালিতে। তাতে বলেছেন (আমি বাংলায় অনুবাদ করছি) —'আজ এক অভাবনীয় আশ্চর্য ঘটনা। আমি বিকালে লালবাগে গিয়েছিলাম গাছপালার সান্নিধ্যে আমার মনটাকে একটু শান্ত করার জন্য। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি—সাইমন ফায়ারপ্লেসের পাশে তার প্রিয় হাই-ব্যাকড চেয়ারটিতে বসে আছে। সাইমন! সত্যিই সাইমন! আমি তো দেখে আনন্দে আত্মহারা। আর শুধু যে বসে আছে তা নয়—সে একদৃষ্টে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে তার স্নেহমাখানো চোখ দুটি দিয়ে। এদিকে ঘরে বাতি নেই। আমার ফাঁকিবাজ খানসামা টমাস এখনও ল্যাম্প জ্বালেনি। তাই সাইমনকে আরেকটু ভাল করে দেখব বলে আমি পকেট থেকে দেশলাইটা বার করলাম। কাঠি বার করে বাক্সের গায়ে ঘষতেই আলো জ্বলে উঠল—কিন্তু কী আফসোস! এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সাইমন উধাও! অবিশ্যি সাইমনকে যে কোনওদিন আবার দেখতে পাব সেটাই তো আশা করিনি! এইভাবে ভূত অবস্থাতেও যদি মাঝে মাঝে সে দেখা দিয়ে যায়, তা হলে আমার মন থেকে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। সত্যি আজ এক অপূর্ব আনন্দের দিন। সাইমন মরে গিয়েও আমাকে ভোলেনি; এমনকী তার প্রিয় চেয়ারটিকেও সে ভোলেনি। দোহাই সাইমন—মাঝে মাঝে দেখা দিও—আর কিছু চাই না আমি তোমার কাছে। এইটুকু পেলেই আমি বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারব।'

এর পরে ডায়রি আর বেশিদিন চলেনি। যেটুকু আছে তার মধ্যে কোনও দুঃখের ছাপ নেই, কারণ সাইমনের সঙ্গে ব্রাউন সাহেবের প্রতিদিনই একবার করে দেখা হয়েছে। সাইমনের ভূত সাহেবকে হতাশ করেনি।

ডায়রির শেষ পাতায় লেখা আছে—'যে আমাকে ভালবাসে, তার মৃত্যুর পরেও যে তার সে-ভালবাসা অটুট থাকে, এই জ্ঞান লাভ করে আমি পরম শান্তি পেয়েছি।'

ব্যস্—এই শেষ। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে—ব্রাউন সাহেবের এই বাড়ি—ব্যাঙ্গালোরের ফ্রেজার টাউনের এভারগ্রিন লজ—এখনও আছে কি? আর সেখানে এখনও সন্ধ্যাকালে সাইমন সাহেবের ভূতের আগমন হয় কি? আর সে ভূত কি অচেনা লোককে দেখা দেয়? আমি যদি সে-বাড়িতে গিয়ে একটা সন্ধ্যা কাটাই—তা হলে সাইমনের ভূতকে দেখতে পাব কি?

ব্যাঙ্গালোরে এসে প্রথম দিন অনীককে এসব কিছুই বলিনি। সে আমাকে তার অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে করে সমস্ত ব্যাঙ্গালোর শহর ঘুরিয়ে দেখিয়েছে—এমনকী ফ্রেজার টাউনও। ব্যাঙ্গালোর সত্যিই সুন্দর জায়গা, তাই শহরটা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে আমার কোনও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি। শুধু সুন্দর নয়—কলকাতার পর এমন একটা শান্ত কোলাহলশূন্য শহরকে প্রায় একটা অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের মতো মনে হয়।

দ্বিতীয় দিন ছিল রবিবার। সকালে অনীকের বাগানে রঙিন ছাতার তলায় বসে চা খেতে খেতে প্রথম ব্রাউন সাহেবের প্রসঙ্গটা তুললাম। ও শুনেটুনে হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে বেতের টেবিলের উপর রেখে বলল, 'দ্যাখ রঞ্জন—যে বাড়ির কথা বলছিস সে বাড়ি হয়তো থাকলেও থাকতে পারে, একশো বছর আর এমন কী বেশি। তবে সেখানে গিয়ে যদি ভূতটুত দেখার লোভ থেকে থাকে তোর, তা হলে আমি ওর মধ্যে নেই। কিছু মনে করিসনি ভাই—আমি চিরকালই একটু অতিরিক্ত সেন্সিটিভ। এমনি দিব্যি আছি—আজকের দিনের শহরের কোনও উপদ্রব নেই এখানে—ভূতের পিছনে ছোটা মানে সাধ করে উপদ্রব ডেকে আনা। ওর মধ্যে আমি নেই!'

অনীকের কথা শুনে বুঝলাম এই বারো বছরে ও বিশেষ বদলায়নি। ইস্কুলে ভিতু বলে ওর বদনাম ছিল বটে। মনে পড়ল একবার আমাদের ক্লাসেরই জয়ন্ত আর আরো কয়েকটি ডানপিটে ছেলে ওকে এক সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের রাইডিং স্কুলের কাছটাতে আপাদমস্তক সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল। অনীক এই ঘটনার পর দু'দিন ইস্কুলে আসেনি, এবং অনীকের বাবা নিজে হেডমাস্টার বীরেশ্বরবাবুর কাছে এসে ব্যাপারটা নিয়ে কমপ্লেন করেছিলেন।

আমি এ বিষয়ে কিছু বলার আগেই অনীক হঠাৎ বলে



ব্রাউন সাহেবের বাড়ি

উঠল, 'তবে নেহাতই যদি তোর যেতে হয়, তা হলে সঙ্গীর অভাব হবে না। আসুন মিস্টার ব্যানার্জি।'

পিছন ফিরে দেখি একটি বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক অনীকের বাগানের গেট দিয়ে ঢুকে হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, প্রায় ছ' ফুট হাইট, পরনে ছাই রঙের হ্যান্ডলুমের প্যান্টের উপর গাঢ় নীল টেরিলিনের বুশশার্টের গলায় সাদা-কালো বাটিকের ছোপ মারা সিল্কের মাফলার।

অনীক পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বন্ধু রঞ্জন সেনগুপ্ত—মিস্টার হৃষীকেশ ব্যানার্জি।'

ভদ্রলোক শুনলাম ব্যাঙ্গালোরে এয়ারক্রাফট ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন, বহুদিন বাংলাদেশ ছাড়া, তাই কথার মধ্যে একটা অবাঙালি টান এসে পড়েছে, আর অজস্র ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন।

অনীক বেয়ারাকে ডেকে আর এক পেয়ালা চায়ের কথা বলে দিয়ে একেবারে সোজাসুজি ব্রাউন সাহেবের বাড়ির কথাটা পেড়ে বসল। কথাটা শুনে ভদ্রলোক এমন অট্টহাস্য করে উঠলেন যে, কিছুক্ষণ থেকে যে কাঠবিড়ালিটাকে দেখছিলাম আমাদের টেবিলের আশেপাশে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করছে, সেটা ল্যাজ উচিয়ে একটা দেবদারু গাছের গুঁড়ি বেয়ে সটান একেবারে মগডালে পৌঁছে গেল।

'গোস্টস? গোস্টস? ইউ সিরিয়াসলি বিলিভ ইন গোস্টস? আজকের দিনে? আজকের যুগে?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'একটা কৌতূহল থাকতে ক্ষতি কি? এমনও তো হতে পারে যে, ভূতেরও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, যেটা দশ বছরের মধ্যে জানা যাবে।'

ব্যানার্জির হাসি তবুও থামে না। লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের দাঁতগুলো ভারী ঝকঝকে ও মজবুত।

অনীক বলল, 'যাই হোক মিস্টার ব্যানার্জি—গোস্ট অর নো গোস্ট—এমন বাড়ি যদি একটা থেকেই থাকে, আর রঞ্জনের যদি একটা উদ্ভট খেয়াল হয়েই থাকে—একটা সন্ধেবেলা ওকে নিয়ে খানিকটা সময়ের জন্য ও বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারেন কি না সেইটে বলুন। ও কলকাতা থেকে এসেছে, আমার গেস্ট—ওকে তো আর আমি একা যেতে দিতে পারি না সেখানে। আর সত্যি বলতে কী—আমি নিজে মানুষটা একটু অতিরিক্ত, যাকে বলে, সাবধানী। আমি যদি নিয়ে যাই তা হলে বোধহয় ওর সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই হবে বেশি।'

মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর শার্টের পকেট থেকে একটা বাঁকা পাইপ বার করে তার মধ্যে তামাক গুঁজতে গুঁজতে বললেন, 'আমার আপত্তি নেই—তবে আমি যেতে পারি কেবল একটা কন্ডিশনে—আমি সঙ্গে শুধু একজনকে নেব না, দু'জনকেই নেব।'

কথাটা শেষ করে ব্যানার্জি আবার হাসলেন, আর তার ফলে এবার আশেপাশের গাছ থেকে চার-পাঁচরকম পাখির চিৎকার ও ডানা-ঝাপটানির আওয়াজ শোনা গেল।

অনীকের মুখ কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে দেখালেও, সে আপত্তি করতে পারল না।

'কী নাম বললেন বাড়িটার?' ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

'এভারগ্রিন লজ।'

'ফ্রেজার টাউনে?'

'তাই তো বলছে ডায়রিতে।'

'হুঁ...' ভদ্রলোক পাইপে টান দিলেন। 'ফ্রেজার টাউনে সাহেবদের কিছু পুরনো বাড়ি আছে বটে, কটেজ টাইপের। এনিওয়ে—যেতেই যদি হয় তো দেরি করে লাভ কী? হোয়াট অ্যাবাউট আজ বিকেল? এই ধরুন চারটে নাগাদ?'

ইঞ্জিনিয়ার হলে কী হবে—মেজাজটা একেবারে পুরোদস্তুর মিলিটারি এবং সাহেবি। ঘড়ি ধরে চারটের সময় হৃষীকেশ ব্যানার্জি তাঁর মরিস মাইনর গাড়িটা নিয়ে হাজির। গাড়িতে যখন উঠছি তখন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'সঙ্গে কী কী নিলেন?'

অনীক ফিরিস্তি দিল—একটা পাঁচসেলের টর্চ, ছ'টা মোমবাতি, ফার্স্ট-এড বক্স, একটা বড় ফ্লাস্ক ভর্তি গরম কফি, এক বাক্স হ্যাম স্যান্ডউইচ, এক প্যাকেট তাস, মাটিতে পাতবার চাদর, মশা তাড়ানোর জন্য এক টিউব ওডোমস।

'আর অস্ত্রশস্ত্র?' ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

'ভূতকে কি অস্ত্র দিয়ে কিছু করা যায়? কীরে রঞ্জন—তোর সাইমনের ভূত কি সলিড নাকি?'

'যাই হোক,' মিস্টার ব্যানার্জি গাড়ির দরজা বন্ধ করে বললেন, 'আমার কাছে একটি ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্র আছে, সুতরাং সলিড-লিকুইড নিয়ে চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই।'

গাড়ি ছাড়ার পর ব্যানার্জি বললেন, 'এভারগ্রিন লজের ব্যাপারটা একেবারে কাল্পনিক নয়।'

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'আপনি কি এর মধ্যেই খোঁজ নিয়েছেন নাকি?'

ব্যানার্জি রীতিমতো কসরতের সঙ্গে দুটো সাইকেল চালককে পর পর পাশ কাটিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম এ ভেরি মেথডিক্যাল ম্যান, মিস্টার সেনগুপ্ত। যেখানে যাচ্ছি, সে জায়গাটা অ্যাট অল আছে কি না সেটার সম্বন্ধে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রাখা উচিত নয় কি? ও দিকটায় শ্রীনিবাস দেশমুখ থাকে—আমরা একসঙ্গে গল্ফ খেলি—অনেকদিনের আলাপ। সকালে এখান থেকে ওর বাড়িতেই গেসলাম। বলল এভারগ্রিন লজ বলে একটা একতলা কটেজ নাকি প্রায় পঞ্চাশ বছর থেকে খালি পড়ে আছে। বাড়ির বাইরের বাগানে বছর দশেক আগে পর্যন্ত লোকে পিকনিক করতে যেত, এখন আর যায় না। খুব নিরিবিলি জায়গায় বাড়িটা। আগেও নাকি একটানা বেশিদিন কেউ ও বাড়িতে থাকেনি। তবে হন্টেড হাউস বলে কেউ কোনওদিন অপবাদ দেয়নি বাড়িটার। বাড়ির ফার্নিচার সব বহুদিন আগেই নিলাম হয়ে গেছে। তার কিছু নাকি কর্নেল মার্সারের বাড়িতে আছে। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। তিনিও ফ্রেজার

টাউনেই থাকতেন। সব শুনেটুনে, বুঝেছেন মিস্টার সেনগুপ্ত, মনে হচ্ছে আমাদেরও এই পিকনিক জাতীয়ই একটা কিছু করে ফেরত আসতে হবে। অনীকেন্দ্র তাসটা এনে ভালই করেছে।'

ব্যাঙ্গালোরের পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে বারবারই মনে হচ্ছিল যে শহরটা এতই অভুতুড়ে যে, এখানে একটা হানাবাড়ির অস্তিত্বই কল্পনা করাই কঠিন।

কিন্তু তার পরেই আবার মনে পড়ে যাচ্ছিল ব্রাউন সাহেবের ডায়রির কথা। লোকে নেহাত পাগল না হলে ডায়রিতে আজগুবি কথা বানিয়ে লিখবে কেন? সাইমনের ভূত ব্রাউন নিজে দেখেছেন। একবার নয়, অনেকবার। সে ভূত কি আমাদের জন্য একবার দেখা দেবে না?

বিলেত আমি যাইনি, কিন্তু বিলেতের কটেজের ছবি বইয়ের পাতায় ঢের দেখেছি। এভারগ্রিন লজের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল সত্যিই যেন ইংল্যান্ডের কোনও গ্রামাঞ্চলের একটা পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে এসে পড়েছি।

কটেজের সামনেই ছিল বাগান। সেখানে ফুলের কেয়ারির বদলে এখন শুধু ঘাস আর আগাছা। একটা ছোট্ট কাঠের গেট (যাকে ইংরেজিতে বলে wicket) দিয়ে বাগানে ঢুকতে হয়। সেই গেটের গায়ে একটা ফলকে খোদাই করে এখনও লেখা রয়েছে বাড়ির নামটা। তবে হয়তো কোনও চড়ুইভাতির দলেরই কেউ রসিকতা করে এভারগ্রিন কথাটার আগে একটা N জুড়ে দিয়ে সেটাকে নেভারগ্রিন করে দিয়েছে।

আমরা গেট দিয়ে ঢুকে বাড়ির দিকে এগোলাম। চারিদিকে অজস্র গাছপালা। ইউক্যালিপটাসও গোটা তিনেক রয়েছে দেখলাম। আর যা গাছ আছে তার অনেকগুলোরই নাম আমার জানা নেই, চোখেও দেখিনি এর আগে কোনওদিন। ব্যাঙ্গালোরের জলমাটির নাকি এমনই গুণ যে, সেখানে যে-কোনও দেশের যে-কোনও গাছই বেঁচে থাকে।

কটেজের সামনে একটা টালির ছাউনি দেওয়া পোর্টিকো, তার বাঁকা থামগুলো বেয়ে লতা উঠেছে ওপর দিকে। ছাউনির অনেক টালিই নেই, ফলে ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সামনের দরজার একটা পাল্লা ভেঙে কাত হয়ে আছে। বাড়ির সামনের দিকের দরজা-জানলার কাচ অধিকাংশই ভাঙা। দেয়ালের ওপর শেওলা ধরে এমন অবস্থা হয়েছে যে বাড়ির আসল রংটা যে কী ছিল তা আজ বোঝার উপায় নেই।

দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম আমরা।

ঢুকেই একটা প্যাসেজ। পিছন দিকে একটা ভাঙা দরজার ভিতর দিয়ে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। আমাদের ডাইনে-বাঁয়েও ঘর। ডাইনেরটাই বেশি বড় বলে মনে হল। আন্দাজে বুঝলাম এটাই হয়তো বৈঠকখানা ছিল। মেঝেতে বিলিতি কায়দায় কাঠের তক্তা বসানো—তার কোনওটাই প্রায় আস্ত নেই। সাবধানে পা ফেলতে হয়, এবং প্রতি পদক্ষেপে খুটখাট খচখচ শব্দ থাকে।

আমরা ঘরটাতে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর, ফার্নিচার না থাকাতে আরো খাঁ খাঁ করছে। পশ্চিম আর উত্তর দিকে জানলার সারি। একদিকের জানলা দিয়ে গেট সমেত বাগান, আর অন্যদিক দিয়ে গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। এরই একটাতে কি বাজ পড়েছিল? সাইমন দাঁড়িয়েছিল সেই গাছের নীচে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। ভাবতে গা-টা ছমছম করে উঠল।

এবারে দক্ষিণদিকের জানলাবিহীন দেয়ালের দিকে চাইলাম। বাঁ কোণে ফায়ারপ্লেস। এই ফায়ারপ্লেসের পাশেই ছিল সাইমনের প্রিয় চেয়ারখানা।

ঘরের সিলিং-এর দিকে চাইতে চোখে পড়ল ঝুল আর মাকড়সার জাল। এককালে সুদৃশ্য এভারগ্রিন লজের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়।

মিস্টার ব্যানার্জি প্রথমদিকে লা লা করে বিলিতি সুর ভাঁজছিলেন, এখন নতুন করে পাইপ ধরিয়ে বললেন, 'কী খেলা আসে আপনাদের? ব্রিজ, না পোকার, না রামি?'

অনীক হাতের জিনিসপত্র মেঝেতে সাজিয়ে চাদরটা বিছিয়ে মাটিতে বসতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা শব্দ কানে এল।

অন্য কোনও ঘরে কেউ জুতো পায়ে হাঁটছে।

অনীকের দিকে চেয়ে দেখলাম সে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

পায়ের শব্দটা থামল। মিস্টার ব্যানার্জি হঠাৎ মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিয়ে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'ইজ এনিবডি দেয়ার?' সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনে প্যাসেজের দিকে এগোলাম। অনীক আলতো করে আমার কোটের আস্তিনটা ধরে নিয়েছে।

এবার জুতোর শব্দটা আবার শুরু হল। আমরা বাইরে প্যাসেজে গিয়ে পড়তেই ডানদিকের ঘরটা থেকে একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে সামনে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লোকটি ভারতীয়। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ সত্ত্বেও ইনি যে ভদ্র এবং শিক্ষিত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যালো।'

আমরা কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না, এমন সময় আগন্তুক নিজেই আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করলেন।

'আমার নাম ভেঙ্কটেশ। আই অ্যাম এ পেন্টার। আপনারা কি এই বাড়ির মালিক না খদ্দের?'

ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'দুটোর একটাও না। আমরা এমনি ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি।'

'আই সি। আমি ভাবছিলাম এই বাড়িটা যদি পাওয়া যেত তা হলে আমার কাজের জন্য একটা স্টুডিও হতে পারত। ভাঙাচোরায় আমার আপত্তি নেই। মালিক কে জানেন না বোধহয়?'

'আজ্ঞে না। সরি।' ব্যানার্জি বললেন। 'তবে আপনি

কর্নেল মার্সারের ওখানে খোঁজ করে দেখতে পারেন। সামনের রাস্তা ধরে বাঁদিকে চলে যাবেন। মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে মিস্টার ভেঙ্কটেশ বেরিয়ে চলে গেলেন।

গেট খোলার এবং বন্ধ করার শব্দ পাবার পর ব্যানার্জি আবার তাঁর অট্টহাসি হেসে বললেন, 'মিস্টার সেনগুপ্ত, ইনি নিশ্চয়ই আপনার সাইমন বা ওই জাতীয় কোনও ভূতটুত নন!'

আমি হেসে বললাম, 'সবেমাত্র সোয়া পাঁচটা, এর মধ্যেই আপনি ভূতের আশা করেন কী করে? আর ইনি ভূত হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চয়ই নন, কারণ তা হলে পোশাকটা অন্যরকম হত।'

আমরা ইতিমধ্যে বৈঠকখানায় ফিরে এসেছি। অনীক মাটিতে পাতা চাদরের উপর বসে পড়ে বলল, 'মিথ্যে কল্পনার প্রশ্রয় দিয়ে নার্ভাসনেস বাড়ানো! তার চেয়ে তাস হোক।'

'আগে মোমবাতি খানকতক জ্বালাও দেখি,' ব্যানার্জি বললেন, 'এখানে বড় ঝপ্ করে সন্ধে নামে।'

দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে কাঠের মেঝেতে দাঁড় করিয়ে ফ্লাস্কের ঢাকনিতে কফি ঢেলে তিনজনে পালা করে খেয়ে নিলাম। একটা কথা আমার কিছুক্ষণ থেকে মনে আসছিল সেটা আর না বলে পারলাম না। ভূতের নেশা যে আমার ঘাড়ে কীভাবে চেপেছে সেটা আমার এই কথা থেকেই বোঝা যাবে। ব্যানার্জিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আপনি বলেছিলেন কর্নেল মার্সার এ-বাড়ির ফার্নিচার কিছু কিনেছিলেন। তিনি যদি এতই কাছে থাকেন তা হলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে একটা জিনিসের খোঁজ করে আসা যায় কি?'

'কী জিনিস?' ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন।

'একটা বিশেষ ধরনের হাই-ব্যাক্ড চেয়ার।'

অনীক যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে, 'কেন বল তো? হঠাৎ এখন হাই-ব্যাক্ড চেয়ারের খোঁজ করে কী হবে?'

'না, মানে, ব্রাউন সাহেব বলেছেন ওটা নাকি সাইমনের খুব প্রিয় চেয়ার ছিল। সে ভূত হয়েও ওটাতে এসে বসত। ওটা থাকত ওই ফায়ারপ্লেসটার পাশে। হয়তো ওটা ওখানে এনে রাখতে পারলে—'

অনীক বাধা দিয়ে বলল, 'তুই ব্যানার্জি সাহেবের ওই মরিস গাড়িতে করে হাই-ব্যাক্ড চেয়ার নিয়ে আসবি? না কি আমরা তিনজনে ওটাকে কাঁধে করে আনব? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

ব্যানার্জি এবার হাত তুলে আমাদের দু'জনকেই থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কর্নেল মার্সার যা কিনেছেন তার মধ্যে ওরকম চেয়ার নেই এটা আমি জানি। তাঁর বাড়িতে আমার যথেষ্ট যাতায়াত আছে। ওটা থাকলে আমার চোখে পড়ত। আমি যতদূর জানি উনি কিনেছিলেন দুটো বেক কেস, দুটো অয়েল পেন্টিং, খানকতক ফুলদানি, আর শেলফে সাজিয়ে রাখার জন্য গুটিকতক শখের জিনিস, যাকে আর্ট অবজেক্টস বলে।'

আমি দমে গেলাম। অনীক তাস বার করে সাফল করতে আরম্ভ করেছে। ব্যানার্জি বললেন, 'রামিই হোক। আর এসব খেলা জমে ভাল যদি পয়সা দিয়ে খেলা যায়। আপনাদের আপত্তি আছে কি?'

বললাম, 'মোটেই না। তবে আমি ব্যাঙ্কের সামান্য চাকুরে, বেশি হারাবার সামর্থ্য আমার নেই।'

বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। আমরা খেলায় মন দিলাম। আমার তাসের ভাগ্য কোনওদিনই ভাল না। আজও তার ব্যতিক্রম লক্ষ করলাম না। আমি জানি অনীক মনে মনে নার্ভাস হয়ে আছে, সুতরাং সে জিতলে পরে আমি অন্তত একটু নিশ্চিন্ত হতাম, কিন্তু তারও কোনও লক্ষণ দেখলাম না। কপাল ভাল একমাত্র মিস্টার ব্যানার্জির। গুনগুন করে বিলিতি সুর ভাঁজছেন, আর দানের পর দান জিতে চলেছেন। খেলতে খেলতে নিস্তব্ধতার মধ্যে একবার একটা বেড়ালের ডাক শুনলাম। তার ফলে আমার মনটা আরো যেন একটু দমে গেল। হানাবাড়িতে বেড়ালেরও থাকা উচিত নয়। কথাটা বলাতে ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'বাট ইট ওয়াজ এ ব্ল্যাক ক্যাট—ওই প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে গেল। ব্ল্যাক ক্যাট তো ভূতের সঙ্গে যায় ভালই—তাই না?'

খেলা চলতে থাকল। বেশ কিছুক্ষণের জন্য একবার মাত্র একটা অজানা পাখির কর্কশ ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ, দৃশ্য বা ঘটনা আমাদের একাগ্রতায় বাধা পড়তে দেয়নি।

ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা, বাইরের আলো নেই বললেই চলে, আমি একটু ভাল তাস পেয়ে পর পর দু'বার জিতেছি, আর এক রাউন্ড রামি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, এমন সময় হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক শব্দ কানে এল।

কে যেন বাইরের দরজায় টোকা মারছে।

আমাদের তিনজনেরই হাত তাসসুদ্ধ নীচে নেমে এল।

টক্ টক্ টক্ টক্।

অনীক এবার আরো ফ্যাকাশে। আমার বুকের ভিতরেও মৃদু কম্পন শুরু হয়েছে। কিন্তু ব্যানার্জি দেখলাম সত্যিই ঘাবড়াবার লোক নন। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করে তাঁর বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হু ইজ ইট?'

আবার দরজায় টোকা—টক্ টক্ টক্।

ব্যানার্জি তদন্ত করার জন্য তড়াক করে উঠে পড়লেন। আমি খপ করে ভদ্রলোকের প্যান্টটা ধরে চাপা গলায় বললাম, 'একা যাবেন না।'

তিনজনে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরোলাম। প্যাসেজে এসে বাঁদিকে চাইতেই দেখলাম দরজার বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে—তার পরনে সুট ও হাতে একটা লাঠি। অন্ধকারে তাকে চেনার কোনও উপায় নেই। অনীক আবার আমার আস্তিন চেপে ধরল। এবার আরো জোরে। ওর অবস্থা দেখেই বোধহয় আমার মনে আপনা থেকেই একটা সাহসের ভাব এল।

ব্যানার্জি ইতিমধ্যে আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ



ব্রাউন সাহেবের বাড়ি



ব্রাউন সাহেবের বাড়ি

চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও-হ্যালো, ডক্টর লার্কিন! আপনি এখানে?'

এবার আমিও প্রৌঢ় সাহেবটিকে বেশ ভালভাবেই দেখতে পেলাম। অমায়িক সাহেবটি তাঁর সোনার চশমার পিছনে নীল চোখ দুটোকে কুঁচকে হেসে বললেন, 'তোমার মরিস গাড়িখানা দেখলাম বাইরে। তারপর দেখি বাড়ির জানলা দিয়ে মোমবাতির আলো দেখা যাচ্ছে। তাই ভাবলাম একবার ঢুঁ মেরে দেখে যাই তুমি কী পাগলামি করছ এই পোড়ো বাড়ির ভেতর।'

ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'আমার এই যুবক বন্ধু দুটির একটু উদ্ভট ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের শখ। বলল এভারগ্রিন লজে বসে তাস খেলবে, তাই আর কী!'

'ভেরি গুড, ভেরি গুড! যুবা বয়সটাই তো এ-ধরনের পাগলামির সময়। আমরা বুড়োরাই কেবল নিজেদের বাড়ির কৌচে বসে রোমন্থন করি। ওয়েল ওয়েল—হ্যাভ এ গুড টাইম!'

লার্কিন সাহেব হাত তুলে গুডবাই করে লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে চলে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার ভূতের আশা পরিত্যাগ করতে হল। কী আর করি, আবার তাসে মনোনিবেশ করলাম। প্রথমদিকে প্রায় সাড়ে চার টাকার মতো হারছিলাম, গত আধঘণ্টায় তার খানিকটা ফিরে পেয়েছি। সাইমনের ভূত না দেখলেও, শেষ পর্যন্ত তাসে কিছু জিতে বাড়ি ফিরতে পারলেও আজকের আউটিংটা কিছুটা সার্থক হয়।

ঘড়ির দিকে মাঝে মাঝেই চোখটা চলে যাচ্ছিল। আসল ঘটনাটা কখন ঘটেছিল তার টাইম আমার জানা আছে। ব্রাউন সাহেবের ডায়রি থেকে জেনেছিলাম যে সন্ধ্যার এই সময়টাতেই বাজ পড়ে সাইমনের মৃত্যু হয়।

আমি তাস বাঁটছি, মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন, অনীক সবেমাত্র স্যান্ডউইচ খাবার মতলবে প্যাকেটটাতে হাত লাগিয়েছে, এমন সময় তার চোখের চাহনিটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেল।

তার দৃষ্টি দরজার বাইরে প্যাসেজের দিকে। বাকি দু'জনের চোখও স্বভাবতই সেদিকে চলে গেল। যা দেখলাম তাতে আমারও কয়েক মুহূর্তের জন্য গলা শুকিয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে প্যাসেজের অন্ধকারের মধ্যে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফসফরাসের মতো ফিকে সবুজ আর হলদে মেশানো একটা আভা এই নিষ্পলক চাহনিতে।

মিস্টার ব্যানার্জির ডানহাতটা ধীরে ধীরে তাঁর কোটের ভেস্ট পকেটের দিকে চলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন ম্যাজিকের মতো আমার কাছে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আমার মন থেকে সমস্ত ভয় দূর করে দিল। বললাম, 'আপনার পিস্তলের দরকার নেই মশাই—এটা সেই কোলো বেড়ালটা।'

আমার কথায় অনীকও যেন ভরসা পেল। ব্যানার্জি পকেট থেকে তাঁর হাত বার করে এনে চাপা গলায় বললেন, 'হাউ রিডিকুলাস!'

এবার জ্বলন্ত চোখ দুটো আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে এল। চৌকাঠ পেরোতেই মোমবাতির আলোতে প্রমাণ হল আমার কথা। এটা সেই কালো বেড়ালটাই বটে।

চৌকাঠ পেরিয়ে বেড়ালটা বাঁদিকে ঘুরল। আমাদের দৃষ্টি তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, তাকে অনুসরণ করছে।

এবারে আমাদের তিনজনের গলা দিয়ে একসঙ্গে একটা শব্দ বেরিয়ে পড়ল। আচমকা বিস্ময়ের ফলে যে-শব্দ আপনা থেকেই মানুষের মুখ থেকে বেরোয়—এ সেই শব্দ। এই শব্দের কারণ আর কিছুই না—আমরা যতক্ষণ তন্ময় হয়ে তাস খেলেছি তারই ফাঁকে কীভাবে কোত্থেকে জানি একটা গাঢ় লাল মখমলে মোড়া হাই-ব্যাক্ড চেয়ার এসে ফায়ার প্লেসের পাশে তার জায়গা করে নিয়েছে।

অমাবস্যার রাতের অন্ধকারের মতো কালো বেড়ালটা চেয়ারটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। তারপর এক মুহূর্ত সেটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা নিঃশব্দ লাফে সেটার ওপর উঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। কোনও এক অশরীরী বৃদ্ধের খিলখিলে হাসির ফাঁকে ফাঁকে বারবার উচ্চারিত হচ্ছে—"সাইমন সাইমন সাইমন সাইমন"—আর তার সঙ্গে ছেলেমানুষি খুশি হওয়া হাততালি।

একটা আর্তনাদ শুনে বুঝলাম অনীক অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর মিস্টার ব্যানার্জি? তিনি অনীককে কোলপাঁজা করে তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে দরজার দিকে ছুটছেন।

আমিও আর থাকতে পারলাম না। তাস মোমবাতি ফ্লাস্ক চাদর স্যান্ডউইচ সব পড়ে রইল। দরজা পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে গেট, গেট পেরিয়ে ব্যানার্জির মরিস মাইনর।

ভাগ্যে ব্যাঙ্গালোরের রাস্তায় লোক চলাচল কম, নইলে আজ একটিমাত্র পাগলা গাড়ির পাগলা ছুটে ক'টা লোক যে জখম হতে পারত তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

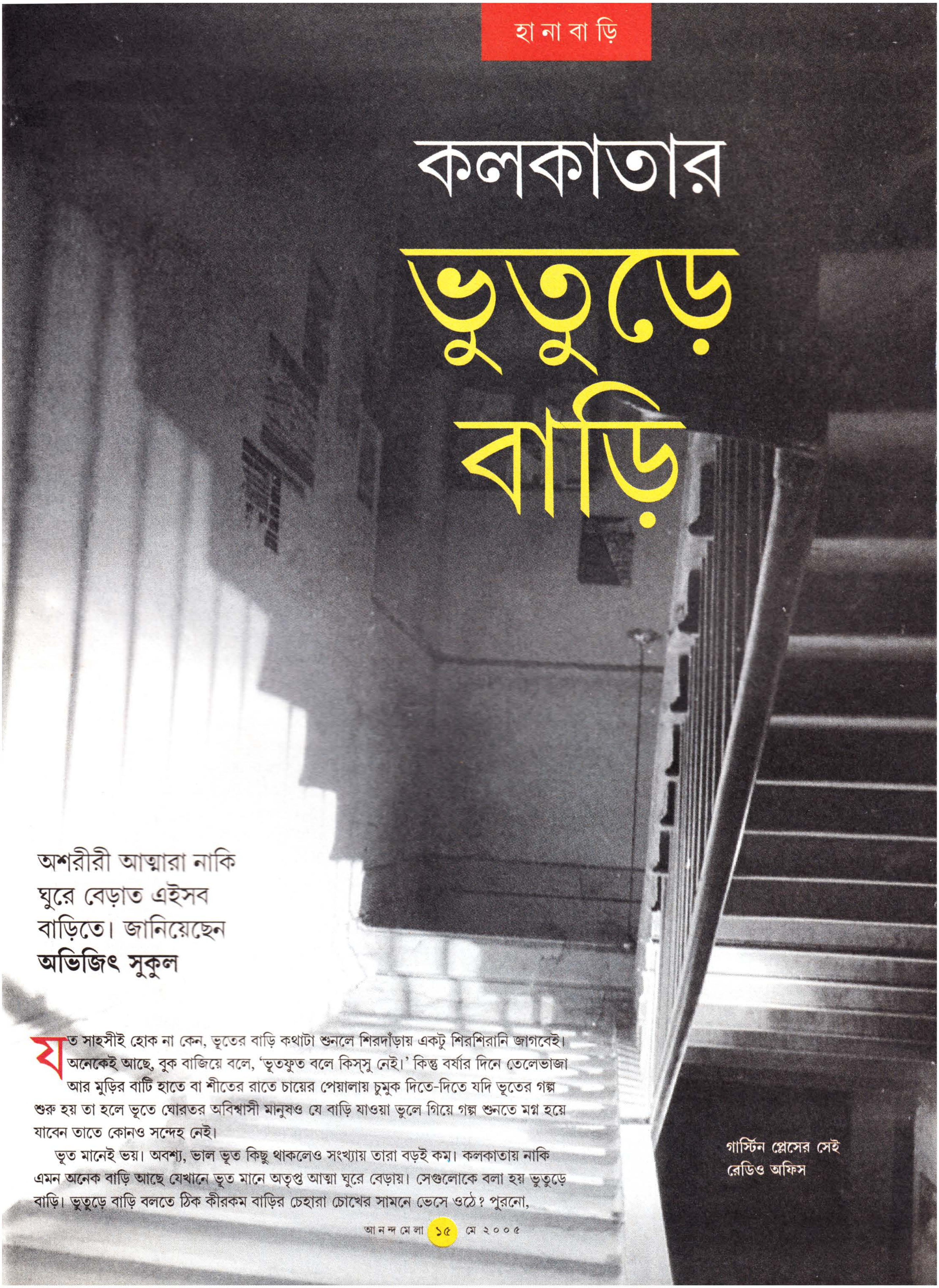
অনীকের জ্ঞান গাড়িতেই ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার মুখে কোনও কথা নেই। প্রথম কথা বললেন মিস্টার ব্যানার্জি। অনীকের বেয়ারার হাত থেকে ব্র্যান্ডির গেলাসটা ছিনিয়ে নিয়ে এক ঢোকে অর্ধেকটা নামিয়ে দিয়ে ঘড়ঘড়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'সো সাইমন ওয়াজ এ ক্যাট!'

আমার নিজেরও কিছুই বলার অবস্থা নেই, কিন্তু আমার মন তাঁর কথায় সায় দিল।

সত্যিই, ব্রাউন সাহেবের বুদ্ধিমান, খামখেয়ালি, অভিমানী, অনুগত, আদরের সাইমন—যার মৃত্যু হয় বজ্রাঘাতে আজ থেকে একশো তেরো বছর আগে—সেই সাইমন ছিল আমাদের আজকের দেখা একটি পোষা কালো বেড়াল!

(পুনর্মুদ্রিত)

ছবি: সত্যজিৎ রায়



কলকাতার ভুতুড়ে বাড়ি

অশরীরী আত্মারা নাকি ঘুরে বেড়াত এইসব বাড়িতে। জানিয়েছেন **অভিজিৎ সুকুল**

যত সাহসীই হোক না কেন, ভূতের বাড়ি কথাটা শুনলে শিরদাঁড়ায় একটু শিরশিরানি জাগবেই। অনেকেই আছে, বুক বাজিয়ে বলে, 'ভূতফুত বলে কিস্‌সু নেই।' কিন্তু বর্ষার দিনে তেলেভাজা আর মুড়ির বাটি হাতে বা শীতের রাতে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে যদি ভূতের গল্প শুরু হয় তা হলে ভূতে ঘোরতর অবিশ্বাসী মানুষও যে বাড়ি যাওয়া ভুলে গিয়ে গল্প শুনতে মগ্ন হয়ে যাবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ভূত মানেই ভয়। অবশ্য, ভাল ভূত কিছু থাকলেও সংখ্যায় তারা বড়ই কম। কলকাতায় নাকি এমন অনেক বাড়ি আছে যেখানে ভূত মানে অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়। সেগুলোকে বলা হয় ভুতুড়ে বাড়ি। ভুতুড়ে বাড়ি বলতে ঠিক কীরকম বাড়ির চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে? পুরনো,

গার্স্টিন প্লেসের সেই রেডিও অফিস



আলিপুরের হেস্টিংস হাউস

পলস্তারা খসে পড়া, আগাছায় ঢাকা একটা বাড়ি, যার দরজা খুললেই ক্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা-চ করে একটা বিচ্ছিরি আওয়াজে পিলে চমকে যাবে! তারপর দুদ্দাড় করে উড়তে শুরু করবে বাদুড় আর চামচিকেরা। সঙ্গে থাকবে মাকড়সার জাল। অনেকের কাছে এটাই হল একেবারে আদর্শ ভুতুড়ে বাড়ির বর্ণনা। কিন্তু যদি বলা যায় একটা অফিস-বাড়ি, যেখানে অনেক লোক কাজ করে, আর তাদের সঙ্গেই থাকে ভূত, তা হলে ব্যাপারটা কেমন হয়? শোনা যায়, আমাদের কলকাতা শহরেই ছিল ঠিক এরকম একটা বাড়ি। জায়গাটা হল গার্স্টিন প্লেস। সে সময়কার রেডিও-অফিস ছিল ওই বাড়িতে। ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক।

কলকাতায় আকাশবাণীর সূচনা হয়েছিল ১৯২৭ সালের ২৬ অগস্ট। ওই বছরই তৎকালীন বোম্বাইতে ভারতের প্রথম বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় বেতারকেন্দ্রটি স্থাপিত হয় কলকাতায়। তখনও নাম 'আকাশবাণী' হয়নি। (এই নামটি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন কিছুদিন পরে)। নাম ছিল 'ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিমিটেড'। পরে অবশ্য 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' নাম হয়। আমাদের কাহিনি সেই অল ইন্ডিয়া রেডিওর গার্স্টিন প্লেসের অফিসবাড়িকে ঘিরেই। সেখানে স্টুডিওর ঠিক পাশেই পুরনো সব রেকর্ড জমা করে রাখবার জন্য ছোট্ট একটা ঘর ছিল। একদিন অফিসের দুই কর্মচারী সেখানে গেছেন রেকর্ড আনতে। একজন তাক থেকে রেকর্ড বাছছেন, আর অন্যজন সেগুলো গুছিয়ে রাখছেন। হঠাৎ প্রথমজনের এগিয়ে দেওয়া একটি রেকর্ড দ্বিতীয়জন হাত বাড়িয়ে ধরার আগেই পাশ থেকে কেউ যেন সেটি ছিনিয়ে নিল। দু'জনেই হাত ঘুরিয়ে দেখলেন, পাশে হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন ধবধবে সাদা এক সাহেব। ওঁরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মিলিয়ে গেলেন সেই সাহেব। সারা বেতার অফিসে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। কে ওই সাহেব, সেই নিয়ে চলতে লাগল গবেষণা। ওই ঘটনার পর প্রায়ই নাকি টের পাওয়া যেতে লাগল সাহেবের অস্তিত্ব। বেশিরভাগ সময়ই তাঁর দেখা মিলত সন্ধেবেলায়, ওই রেকর্ডরুমের আশপাশেই।ওই সময়ে আকাশবাণীর নামী ব্যক্তিত্ব বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রই প্রথম বললেন ব্যাপারটা। ওই সাহেব আসলে এক ভূত। ওই সাহেবভূতের সঙ্গে নাকি মোলাকাতের 'সৌভাগ্য' হয়েছে অনেক বড়-বড় তারকারই। আকাশবাণীর পুরনো রেকর্ডে বিকাশ রায়ের স্মৃতিচারণাতেও পাওয়া যায় সেই ভূত-অ্যাখ্যান। "আমাদের সঙ্গে এক অপূর্ব সহাবস্থান করছিল এক সাহেবভূত। নাম তার গ্যারিসাহেব। সাহেবভূত কাউকে কিছু বলত না। বরং মাঝে-মাঝে কাজের সময় আলমারি ধরে টানাটানি করলে, বীরেনদা, মানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বকাবকি করতেন। ভূত ভয় পেয়ে চুপ করে যেত। একবার শুধু একটা

বেয়ারাকে পিছনের ঘোরানো সিঁড়িতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। আমরা সাহেবের ওই সহযোগিতার জন্য খুব খুশি হয়েছিলাম। কারণ, ওই বেয়ারাটি ছিল ইউতিকারউল্লা সাহেবের খাস বেয়ারা।"

ভূতের গল্প শুনিয়েছিলেন লীলা মজুমদারও। অল ইন্ডিয়া রেডিওয় চাকরি করার সময় তাঁর যে অভিজ্ঞতাটি হয়েছিল সেটি এরকম—স্টুডিওয় ঘোষিকার চাকরি নিয়ে এসেছিলেন এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে। একদিন রাতে যতবার তিনি ঘোষণা করার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন, ততবারই দেখছেন, কেউ একজন ঘরের ভিতর পায়চারি করছেন, কিন্তু কোনও কাজ করছেন না। ভদ্রমহিলা খোঁজ নিয়ে যখন জানতে পারলেন ওটি একটি সাহেবভূত, সেই যে তিনি পিঠটান দিলেন, আর ফেরেননি অফিসে। এমনকী, মাসের শেষে মাইনে নিতেও নয়। অনেকেই বলেন, আকাশবাণী অফিসের পাশেই ছিল এক সমাধিস্থান। সেখানকারই কোনও সঙ্গীতপ্রেমী সাহেব বাসা বেঁধেছিলেন বেতার অফিসে। রাতের অফিসে অনেকেই নাকি শুনেছেন গ্যারিসাহেবের ভূতের পিয়ানো বাজানোর শব্দ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রও একবার এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, যদিও তিনি কখনও ভূত দেখেননি, তবে অনেকটা দেখার মতোই। তিনি বলতেন যে, এই ভূত কারও ক্ষতি করার বান্দা নয়। ভূতের সাংস্কৃতিক বোধের প্রশংসাও করেছিলেন তিনি। অবশ্য গানবাজনা যে ভূতেদের খুব প্রিয় একটা আইটেম, সে তো 'গুপী গাইন, বাঘা বাইন'-এর সময়ও বোঝা গিয়েছিল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর সঙ্গে বেশ একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল সাহেবভূতের। অবিশ্বাসীরা আবার বলতেন অন্য কথা। তাঁদের মতে, "আকাশবাণীর কোনও-এক বড়কর্তা সন্ধের পর নিজের বিনোদনের জন্য ওই রেকর্ডরুমকে ব্যবহার করতেন। তাঁকে যাতে কেউ বিরক্ত করতে না পারে, সে জন্য তিনিই নাকি রটিয়েছিলেন ভূতগুজব। তবে, সত্যি-মিথ্যে যাই হোক কলকাতার ভুতুড়েবাড়ির লিস্টে একনম্বর জায়গাটা দখল করে আছে গার্স্টিন প্লেসের ওই বাড়ি।

পরের নামটা শুনলে একটু অবাক হওয়ারই কথা। রাইটার্স বিল্ডিং। খোদ মহাকরণে ভূতদের আনাগোনা নাকি সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই। যদিও রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ভূত দেখতে পাননি কেউই। তবে অদ্ভুতুড়ে সব আওয়াজ শোনার অভিজ্ঞতা হয়েছে নাকি অনেক রাত-পাহারাদারেরই। শোনা যায়, মহাকরণের দোতলা থেকে নাকি একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ শোনা যেত। তারপর ক্রমশ সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠে যেত সেই আওয়াজ। তবে এই আওয়াজের পিছনে কোনও কাহিনি আছে কিনা সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।



রাইটার্স বিল্ডিং

আলিপুরের কাছে হেস্টিংস হাউসে আবার নাকি দেখা পাওয়া যেত ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূতের। গভীর রাতে দূর থেকে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি আসার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যেত। সে আওয়াজ এসে থামত হেস্টিংস হাউসের ঠিক সামনে। তারপর শোনা যেত ভারী বুটের শব্দ। কেউ গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে ঢুকতেন বাড়িটিতে। তারপর কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠত সেই বুটের আওয়াজ। উপরের লাইব্রেরিতে বই, ফাইল ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করে যে পথে আসতেন, সেই পথেই ফিরে যেতেন ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূত। শোনা যায়, হেস্টিংসের ভূতের ভয়ে সেসময় রাতের বেলা ওই বাড়ি পাহারা দিতে চাইতেন না পাহারাদাররা।

কলকাতার আর-এক ভূতের বাড়ি হিসেবে কুখ্যাতি ছিল যে বাড়িটার সে বাড়িতে এখন দুর্গাপুজো হয়। শাঁখারিটোলার এই বাড়িটিতে স্বাধীনতার বহু আগে ছিল হাসপাতাল। মূলত, প্লেগের রোগীদের চিকিৎসা করা হত এখানে। হাসপাতালটি উঠে যাওয়ার পর ফাঁকা বাড়িতে রাতের দিকে শোনা যেত হইহল্লা আর অদ্ভুত সব আওয়াজ। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে, প্লেগে মৃত মানুষদের আত্মারাই ওইসব অলক্ষুণে কাণ্ড ঘটাত। স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা পরে স্বপ্নে ওই বাড়িটার হদিশ পান। তিনি ওই বাড়িটি কিনে নেন। এর পর থেকে ওখানকার ঠাকুরদালানে দুর্গাপুজো হতে থাকে এবং লোকের বসবাস শুরু হয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার নাকি প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন ভূতের দৌলতে। আর সে ঘটনাও ঘটেছিল আবার খাস কলকাতাতেই, জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে। কোনও-এক সময় অবন ঠাকুর যখন ভীষণ অসুস্থ, সেই সময় এক রাতে নাকি তাঁর মৃতা মা তাঁর শিয়রে বসে সারারাত শুশ্রূষা করে তাঁকে সুস্থ করে তুলেছিলেন।

ভূত আছে বলে শোনা যায় বেথুন কলেজের পাশের চার্চেও। তবে যে হারে শহর কলকাতার লোকসংখ্যা বাড়ছে তাতে দু'দণ্ড নিশ্চিন্তে থাকার জো নেই ভূতেদের। গ্রামেগঞ্জে অবশ্য এখনও খোঁজ করলে পাওয়া যাবে এমন সব বাড়ির হদিশ, যেখানে তাদের বাস। তাই ভূতদের টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার ওইসব ভুতুড়েবাড়ির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ। তা না হলে অচিরেই ভূতদের হদিশ মিলবে শুধুমাত্র গল্পগাছাতেই। কলকাতায় আরও অনেক ভুতুড়ে বাড়ির কথা শোনা যায়। ভূত আছে কি নেই সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায়, সেইসব ভুতুড়ে বাড়ির গল্প কম জমাটি নয়।

খোদ মহাকরণে ভূতদের আনাগোনা নাকি সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই। যদিও রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ভূত দেখতে পাননি কেউই। তবে অদ্ভুতুড়ে সব আওয়াজ শোনার অভিজ্ঞতা হয়েছে নাকি অনেক রাত-পাহারাদারেরই।

কুইজ

গৃহপালিত পশু বলতে প্রথমেই মনে আসে কুকুরের কথা। শান্ত এবং প্রভুভক্ত কুকুর যেমন রয়েছে, তেমনই অনেক হিংস্র স্বভাবের কুকুরও দেখা যায়। এই প্রাণীকে নিয়েই এবারের কুইজ।

অভিজিৎ সুকুল, তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল anandamela@abpmail.com

জবাব চাই

১. 'ব্লন্ডি' নামের বিখ্যাত অ্যালসেশিয়ানটির মালিক ছিলেন কোন বিখ্যাত জার্মান?
২. কমিক্সের কোন বিখ্যাত চরিত্রের পোষা কুকুরের নাম 'রকেট'?
৩. অর্ধেকটা শেয়াল, অর্ধেক কুকুররূপী শরীর ছিল প্রাচীন মিশরের কোন দেবতার?

উত্তর আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার জবাব চাইয়ের উত্তর

১. ভারতে।
২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশের রাজধানীর নাম ওয়াশিংটন (ডি সি)। ডি সি-র অর্থ ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া।
৩. ভুটান।



১ আয়তনে সবচেয়ে ছোট প্রজাতির কুকুর হল 'চিহুয়াহুয়া'। সবচেয়ে বড় প্রজাতির কুকুর কোনটি?

২ কুকুরের জিভ দিয়ে লালা ঝরতে দেখে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (রিফ্লেক্স অ্যাকশন) সংক্রান্ত পরীক্ষাটি করেছিলেন কোন বিখ্যাত রাশিয়ান বিজ্ঞানী?

৩ টেলিভিশনের জনপ্রিয় একটি কমিক্স সিরিয়ালের 'স্কুবি ডু' কোন প্রজাতির কুকুর?

৪ অনেকদিন পর্যন্ত মার্কিন দমকলবাহিনীর ম্যাসকট ছিল এই প্রজাতির কুকুর। তাই এদের বলা হয় 'ফায়ারহাউজ় ডগ'। কোন প্রজাতির কুকুর?

৫ 'জার্মান শেপার্ড' কুকুর আমাদের কাছে 'অ্যালসেশিয়ান' নামে পরিচিত। 'জার্মান ম্যাস্টিফ' প্রজাতির কুকুরকে আমরা কী নামে চিনি?



৬ কোন জাতের কুকুর চুরি করার অপরাধে প্রাচীনকালে চিনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত বলে শোনা যায়?

৭ অস্ট্রেলিয়ার বন্য এক ধরনের কুকুরকে অনেক সময় 'ওয়ারাগল' নামে ডাকা হয়। কোন কুকুর?

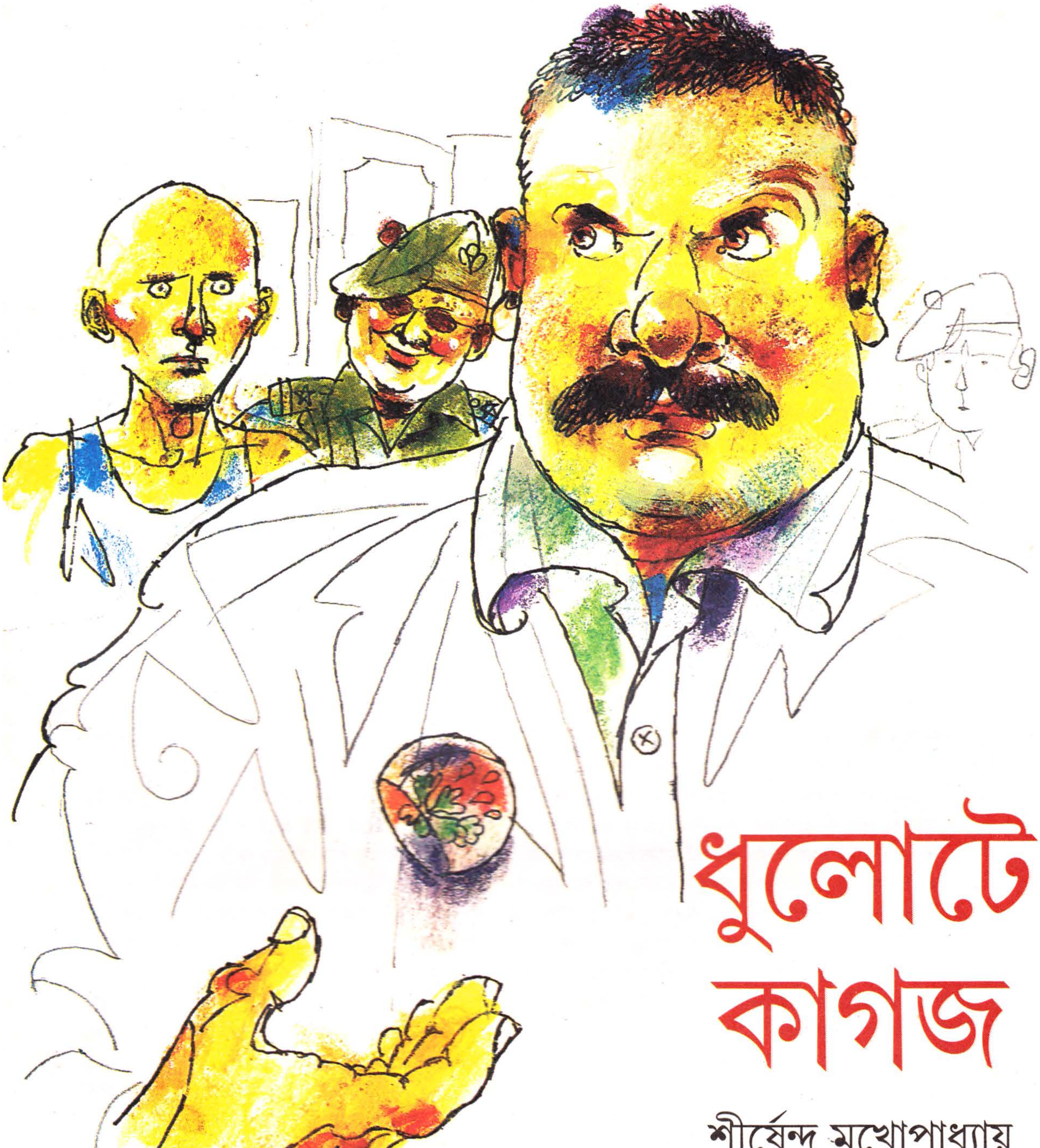
৮ ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের জারি করা নিয়ম অনুযায়ী কোন ধরনের কুকুরের ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রবেশের অধিকার ছিল?

গত সংখ্যার উত্তর

১. মোতেরার সর্দার পটেল স্টেডিয়াম, আমদাবাদ।
২. অ্যান্টিগুয়ার সেন্ট জন্‌স মাঠে।
৩. নিউজ়িল্যান্ডের অকল্যান্ডে।
৪. বাংলাদেশে। ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে।
৫. ইংল্যান্ডের ট্রেন্টব্রিজ মাঠে।
৬. করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে।
৭. ইংল্যান্ডের লিড্‌স মাঠে।
৮. দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের নিউল্যান্ড্‌স স্টেডিয়ামে।

সঠিক উত্তরদাতা

শুভদীপ সেনগুপ্ত, নবম শ্রেণি, হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল; অপরূপ আইচ, রিষড়া বাণীভারতী হাই স্কুল; নম্রতা দাস, পঞ্চম শ্রেণি, দেবীশ্বরী বিদ্যায়তন, কোন্নগর; সায়ন মুখোপাধ্যায়, অষ্টম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির; সায়ন দাস, সপ্তম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; অভিষেক দাস, সপ্তম শ্রেণি, ইলিয়ন মেয়র স্কুল, কলকাতা; অঙ্কিতা শাসমল, পঞ্চম শ্রেণি, সুভাষিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি; মৈনাক কর, চতুর্থ শ্রেণি, শিলবাড়িহাট চিলড্রেন নার্সারি স্কুল; প্রিয়াঙ্কা কর, সপ্তম শ্রেণি, শিলবাড়িহাট উচ্চ বিদ্যালয়; পামেলা নন্দী, সপ্তম শ্রেণি, পূর্ব বারাসাত বিদ্যাপীঠ; রাখি দাস, পঞ্চম শ্রেণি, পঞ্চসায়র বিদ্যানিকেতন, কলকাতা; রাকেশ দাস, যোধপুর পার্ক বয়েজ় হাই স্কুল, কলকাতা; সুব্রত সাহা, অষ্টম শ্রেণি, অরূপ সাহা, পঞ্চম শ্রেণি, মৌমিতা সাহা, ষষ্ঠ শ্রেণি, গৌরব সাহা, নবম শ্রেণি। এরা সকলেই চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী।



ধুলোটে কাগজ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নিরাপদর মা মারা যাওয়ার পর তার আর কেউ রইল না। বড্ড একা পড়ে গেল সে। মা'কে ভালবাসতও খুব। মা ছাড়া কেউ ছিল না কিনা! কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে সারাদিন। বাড়িতে মন টিকতে চায় না মোটে। তার ঠাকুরদার আমলের এই বাড়িখানায় পাঁচ-ছ'টা ঘর। সব পুরনো জিনিসে ঠাসা। পুরনো আমলের বাক্সপ্যাঁটরা, তোরঙ্গ, কৌটোবাউটো, রাজ্যের ন্যাকড়াট্যাকরা, ভাঙা লণ্ঠন থেকে ডালা-কুলো সব ডাঁই হয়ে আছে সারা বাড়িতে। মা যক্ষীর মতো এসব আগলে রাখত। কোন কাজে লাগবে কে জানে! কিন্তু নিরাপদ যেদিকেই তাকায় অমনি মায়ের কথা মনে পড়ে, আর বড্ড হু-হু করে বুক।

গাঁয়ের বন্ধুরা আর পাড়াপ্রতিবেশীরা অবশ্য তাকে নানা

কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখল।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পর গাঁয়ের মহাজন এবং মাতব্বর পশুপতি রায় একদিন গম্ভীরমুখে এসে বললেন, "ওরে নিরাপদ, বাড়িটার বিলিব্যবস্থা কী করলি? তোর মা যতদিন বেঁচে ছিল কিছু বলিনি। অনাথা বিধবা মানুষ, তার দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কী? কিন্তু টাকাগুলো তো আর ফেলে রাখতে পারি না। সুদে-আসলে যে অনেক দাঁড়িয়ে গেছে রে!"

নিরাপদ হাঁ। বলল, "কিসের টাকা?"

পশুপতি রায় একখানা ধুলোটে কাগজ বের করে দেখাল, "এই দ্যাখ, তোর বাপের সই। শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার। বিশ হাজার টাকা হাওলাত নিয়েছিল বাড়ি আমার কাছে বাঁধা রেখে। সুদে-আসলে দেড় লাখ ছাড়িয়ে গেছে।"

বাবাকে নিরাপদর মনেই নেই। সে যখন ছোট ছিল, তখন মারা যায়। বাপের সইসাবুদও তার চেনার কথা নয়। কিন্তু পশুপতি ডাকসাইটে মানুষ। তার দাপটে সবাই তটস্থ। পশুপতি রায়ের সুনাম নেই বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করার সাহস পায় না।

নিরাপদ মিনমিন করে বলল, "তা আমাকে কী করতে হবে?"

পশুপতি রায় ভ্রূ কুঁচকে বলল, "পিতৃঋণ শোধ করা পুত্রের অবশ্য কর্তব্য। তা, তুই যদি বাপের ধার এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা শোধ করে দিতে পারিস তা হলে আর ঝামেলায় পড়তে হয় না।"

নিরাপদ ঢোক গিলে বলে, "টাকা! টাকা কোথায় পাব? আমার তো খাওয়াই জুটছে না।"

"তা হলে তো বাপু বাড়িখানা ছাড়তে হচ্ছে। এই পুরনো ঝুরঝুরে বাড়ির দাম তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা ওঠে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কী আর করা, কিছু টাকা বোকাদণ্ডই যাবে আমার। দু'দিন সময় দিলুম। পরশু দিন সকালে এসে বাড়ির দখল নেব। আর শোন, আমার দু'টো পাইক পাহারায় থাকবে। বাড়ির কোনও জিনিস পাচার করা চলবে না। বাড়ি থেকে তো দাম উঠবে না, পুরনো মাল বেচে যদি আরও কিছু উসুল হয়।

পশুপতি চলে গেল। কিন্তু দুটো যন্ডামার্কা পাইক বাড়ির বারান্দায় লাঠি হাতে বহাল রইল। দু'জনেই ভারী গম্ভীর।

নিরাপদ বুঝে গেল, সে চিপিকলে পড়ে গেছে। পশুপতি রায়ের থাবা থেকে বাড়িটা বাঁচানোর কোনও উপায় নেই। মুচকুন্দপুর গাঁয়ে বা তার আশপাশে এমন কেউ নেই যে পশুপতির সঙ্গে এঁটে উঠবে।

নিরাপদ একটু ভালমানুষ আর-একটু বোকা, আর একটু ভিতুও বটে। তাই সে বসে-বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। বাড়ি ছাড়তে হলে সে যাবেই বা কোথায়, খাবেই বা কী? মা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন পশুপতি কেন উদয় হয়নি কে জানে? আর মা থাকতে তার খাওয়াপরারও অভাব ছিল না। মা কীভাবে চালাত তা অবশ্য সে জানে না। কখনও জিজ্ঞেস করারও দরকার হয়নি।

পাইক দু'জন তার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে আছে দেখে সে ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিল।

পশুপতিকাকা ঘরের জিনিসপত্র সরাতে বারণ করে যাওয়ায় আরও ফাঁপরে পড়ে গেছে সে। ঘরের চাল-ডালে টান পড়েছে। ভেবেছিল দু'-একটা পুরনো বাসন বেচে দিয়ে চাল-ডাল কিনবে, এখন তো তাও হবে না। নিরাপদ এখন করে কী? কুয়ো থেকে জল তুলে একপেট জল খেয়ে সে ভিতরের দিকের দাওয়ায় বসে রইল চুপ করে। সামনে দেওয়াল-ঘেরা ছোট উঠোন। দুটো পেঁপে গাছ। একটা আম আর পেয়ারা গাছ। আমগাছে বসে দুটো কাক সমানে ডাকছে। নিরাপদর মাথায় কোনও মতলব আসছে না। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। খিদে পেয়েছে। তবু উঠে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেওয়ার গরজও নেই তার। মনটা বড্ড খারাপ।

এমন সময় সদর দরজায় প্রবল কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজা খুলেই দু'পা পিছিয়ে এল নিরাপদ। দু'টো মুসকো পাইক রাগে গজরাচ্ছে। প্রথমজন বলল, "তোর এতবড় সাহস যে, তুই পিছন থেকে আমাকে লাথি মেরে পালিয়ে এসেছিস!"

অন্যজন বলল, "বেয়াদব, নচ্ছার, এত তোর বুকের পাটা যে, পিছন থেকে আমার মাথায় গাট্টা মারলি!"

নিরাপদ ভয় পেয়ে তোতলাতে-তোতলাতে বলে, "আ-আমি! কাকুরা কী যা তা বলছেন? আমি মারব আপনাদের? আমি তো পিছনের দাওয়ায় বসে ছিলাম!"

প্রথম পাইকটা খপ করে তার চুলের মুঠি ধরে বলল, "অন্যায় করে ফের মিথ্যে কথা! দেব ঘাড়টা মটকে?"

প্রথম পাইকটা দ্বিতীয় পাইকটাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, "দে না আমার হাতে ছেড়ে, গাট্টা কাকে বলে আমি ছোঁড়াকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

নিরাপদ জীবনে কারও কাছে মারধর খায়নি। সে ভয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কিন্তু তাতে ভবি ভোলার নয়। দ্বিতীয় পাইকটা তার ঘাড় ধরে হেঁটমুন্ডু করে পেল্লায় একটা গাট্টা বসিয়ে দিল। নিরাপদর মাথাটা ঝিনঝিন করে উঠল।

এই সময় তাকে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় পাইকটা প্রথম পাইকটার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "এই বিষ্টু, তুই আমার পিঠে কিল মারলি কেন রে?"

লোকটা অবাক হয়ে বলে, "আমি কিল মারলাম! বলিস কী? আমি তো তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছি! মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাস না!"

"মিথ্যে কথা! কিল মেরে ফের ভালমানুষ সাজা হচ্ছে! বুঝেছি, একটু আগে যখন আমি বারান্দায় বসে গুনগুন করে রামপ্রসাদী গাইতে-গাইতে একটু ঢুলে পড়েছিলাম, তখনই তুই গাট্টা মেরে গিয়ে ভালমানুষের মতো তফাতে বসে পড়েছিলি।"

"দ্যাখ পটা, বেশি বাড় ভাল না। জষ্টিমাসে কর্তাবাবুর বাগানের কাঁঠাল চুরি করে খেয়ে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলি, সেকথা আমি ভুলিনি। হিরু পাইকের নাগরা জুতো হারিয়ে ফেলে আমাকে চোর বলে বদনামও তুই-ই তা হলে রটিয়েছিলি! আজ তোকে ছাড়ছি না।"

"দ্যাখ বিষ্টু, লাই দিলে কুকুরও মাথায় চাপতে চায়। তোর

বহুত বেয়াদপি এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। আজ তোর শেষ দেখে ছাড়ব।”

এই বলতে-বলতে দু'জনের মধ্যে ধুন্ধুমার লড়াই লেগে গেল। নিরাপদ খিদেতেষ্টা ভুলে দুই পাইকের লড়াই দেখতে লাগল। মারামারি করতে-করতে দু'জনে জড়াজড়ি করে গড়াতে-গড়াতে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। হইহই শুনে লোকজন ছুটে এসে ভিড় করে ফেলল। যত লড়াই-ই একসময় শেষ হয়। এটাও হল। আধঘণ্টাটাক বাদে ধুলোমাখা দুটো পেল্লাই চেহারার লোক ছেঁড়া চুল, ফোলা চোখ, নড়া দাঁত আর রক্তমাখা ঠোঁটে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে-টলতে যে যার বাড়ি চলে গেল। নিরাপদর দিকে ফিরেও তাকাল না।

কিন্তু কী নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়াটা লাগল, সেটা নিরাপদ বুঝতেই পারল না। তবে সে মনের আনন্দে রাত্রিবেলা ডাল-ভাত রান্না করে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোল।

পরদিন সকালেই পশুপতি রায় সদলবলে এসে হাজির। চোখ পাকিয়ে হুংকার ছেড়ে বলল, “তুই নাকি আমার পাইকদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিস! এত আস্পদ্দা তোর হয় কী করে?”

নিরাপদর একগাল মাছি। সে হাঁ করে কিছুক্ষণ সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, “কর্তাবাবু, আপনার পাইকদের মারধর করার মতো অবস্থাই আমার নয়। আমি তাদের ভয়ে দরজায় খিল এঁটে ছিলাম।”

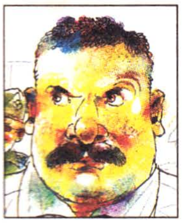
পশুপতি ফের হুংকার দেয়, “মিথ্যে কথা! পাঁচজনে দেখেছে, তুই দুটো পাইককে উস্তমফুস্তম করে মেরেছিস। একজনের একটা চোখই বোধ হয় গেছে। পটার দুটো দাঁত পড়ে গেছে। আমি থানায় এত্তেলা দিয়ে এসেছি, তোকে তারা এসে হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে। সাতটি বছর যাতে জেলের ঘানি টানতে হয় তার ব্যবস্থা করে রাখছি।”

নিরাপদ ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেল। মিনমিন করে তবু বলল, “আজ্ঞে, তারা যে নিজেদের মধ্যেই মারপিট করছিল, নিজের চোখে দেখা।”

“এখন নিজের পিঠ বাঁচাতে গল্প ফাঁদছিস? যাকগে, যা বলার আদালতে দাঁড়িয়ে বলিস। বাঘা উকিলের জেরায় সব কথা বেরিয়ে পড়বে। আজ থেকে চারজন পাইক এ-বাড়িতে মোতায়েন থাকবে। গড়বড় দেখলেই লাঠিপেটা করার হুকুম দিয়ে যাচ্ছি।”

এবার আরও বড় মাপের চারজন পাইক বহাল হল। তাদের চেহারা দৈত্য-দানবের মতো। তারা বড়-বড় সড়কি আর রামদা হাতে নিয়ে সামনের বারান্দায় এঁটে বসল।

নিরাপদ ফের কাঁপতে-কাঁপতে দরজায় খিল তুলে



ধুলোটে কাগজ

ভিতরের বারান্দায় বসে রইল। কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

একটু বাদেই বাইরের দিকে প্রবল হুটোপাটি আর চেঁচামেচির শব্দ পেয়ে চমকে উঠল সে। দৌড়ে গিয়ে জানলায় উঁকি মেরে যা দেখল, তাতে শরীর হিম হয়ে গেল তার। দেখল, একটা কুড়ি-একুশ বছরের রোগাভোগা চেহারার ছেলে চারজন দৈত্য-দানবের মতো পাইককে দমাদম লাঠিপেটা করছে। পাইকরাও লাঠি, সড়কি, দা চালাচ্ছে বটে, কিন্তু ছেলেটার তাতে কিছুই হচ্ছে না। বরং উলটে ছেলেটার লাঠির ঘায়ে পাইকদের কারও মাথা ফাটছে, কারও কনুই ভাঙছে, কেউ হাঁটু মুড়ে বসে পড়ছে, আর সবাই মিলে আর্ত চিৎকার করছে, "বাঁচাও, বাঁচাও, মেরে ফেললে, কেটে ফেললে...!"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লড়াই শেষ। চারটে পাইক চিতপটাং হয়ে পড়ে রইল, সাড়া নেই। ছোকরাটাকে ভারী চেনা-চেনা ঠেকল নিরাপদর, কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সে বলল, "তুমি কে ভাই?"

কিন্তু কোথায় কে? ছোকরার চিহ্নমাত্র নেই, শুধু তার পরিত্যক্ত লাঠিটা পড়ে আছে বারান্দায়। লাঠিটা তুলে নিয়ে নিরাপদ হাঁ করে চেয়ে রইল। হঠাৎ শিউরে উঠে সে বুঝতে পারল, ছোকরাটা হুবহু তারই মতো দেখতে। আয়নায় সে নিজের চেহারাটা যেমন দেখেছে, অবিকল সেই চেহারা। তাই অত চেনা-চেনা ঠেকছিল বটে!

স্তম্ভিত হয়ে সে যখন দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেই সময়ই একটা পুলিশের জিপ এসে বাড়ির সামনে থামল। দারোগাবাবু এবং জনাচারেক সেপাই নেমে এসে থমকে দাঁড়াল। চারজন ভূপতিত পাইক আর তার দিকে পর্যায়ক্রমে চেয়ে দারোগাবাবু বললেন, "ওঃ, তা হলে যা শুনেছি তা মিথ্যে নয়!"

তাড়াতাড়ি লাঠিটা ফেলে দিয়ে নিরাপদ হাতজোড় করে বলল, "আজ্ঞে দারোগাবাবু, কোথা থেকে একটা উটকো ছেলে এসে এই কাকুদের খুব মারধর করে গেছে। আমার কিন্তু কোনও দোষ নেই।"

দারোগাবাবু থমথমে মুখ করে বললেন, "বটে? তা, ছোকরাটা কে?"

"চিনি না।"

"তুমি না চিনলেও আমরা যে তাকে বিলক্ষণ চিনি হে। তার নাম নিরাপদ সরকার, তাই না?"

নিরাপদ কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, এই পাইককাকুদের ধারেকাছেও আমি আসিনি। আমি দরজায় খিল দিয়ে..."

দারোগা হাত তুলে বললেন, "আর বলতে হবে না। এবার আমার সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলের মতো থানায় চলো তো। তোমাকে অবশ্য বিশ্বাস নেই। আমাদের উপরেও হামলা করতে পার। তাই আগেই সাবধান করে দিচ্ছি। বেগড়বাঁই দেখলে কিন্তু গুলি চালিয়ে দেব।"

অগত্যা থানাতেই যেতে হল নিরাপদকে।

থানায় একজন মস্ত গোঁফওয়ালা হোমরাচোমরা গোছের লোক বসে ছিলেন। চোখে ভ্রুকুটি, আর খুব রাশভারী মুখ। দারোগাবাবু তাঁকে দেখেই লম্বা স্যালুট দিয়ে বললেন, "স্যার, আপনি এখানে?"

"হ্যাঁ, আমি। ফোনে বড়কর্তার জরুরি হুকুম পেয়ে আসতে হল। তা, এই ছেলেটা কে? ধরেই বা এনেছেন কেন?"

দারোগাবাবু তখন সবিস্তার নিরাপদর গুণ্ডামির কথা বলে গেলেন। শুনে রাশভারী লোকটা আপাদমস্তক নিরাপদকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বয়স কত?"

ভয়ে নিরাপদর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "আজ্ঞে, কুড়ি-একুশ হবে।"

"বলি, পুলিশে চাকরি করবে?"

নিরাপদ ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে গোলমেলে মাথা নিয়ে চুপ করে রইল। ভুলই শুনে থাকবে। সে আজকাল ভুল শুনছে। ভুল দেখছেও।

রাশভারী লোকটা বলল, "পুলিশে আজকাল ডাকাবুকো লোকের খুব অভাব। আমরা তোমার মতো বাহাদুর ছেলেই চাই। দেরি নয়, আজকেই জয়েন করো। আজই সদরে গিয়ে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সবাই এমন হাঁ করে রইল যে, সুচ পড়লে শোনা যায়।

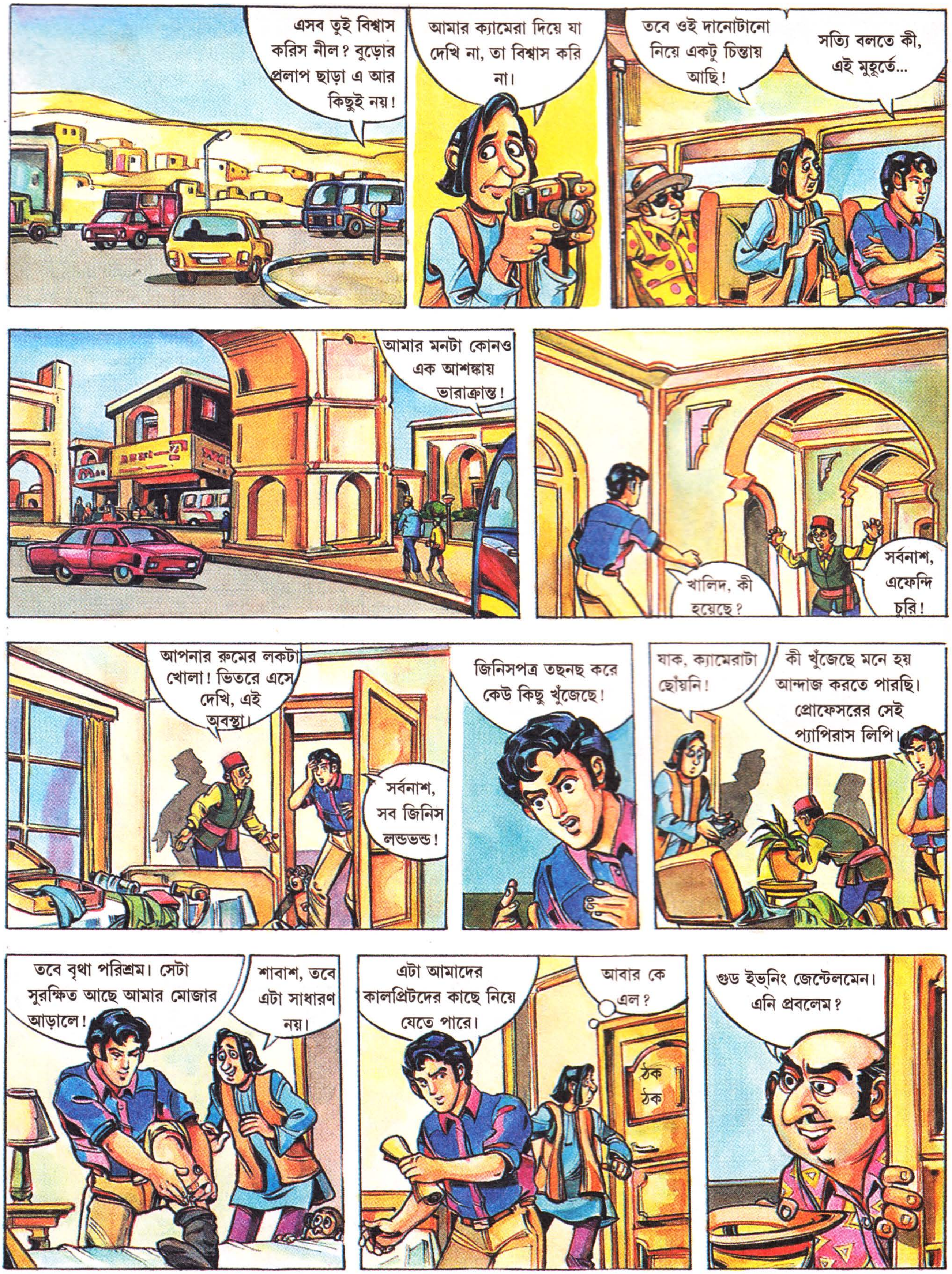
পরদিন সকালেই পশুপতি রায় এসে হাজির। গোঁফ ঝুলে গেছে। চোখে করুণ দৃষ্টি। জোড়হাতে বলল, "বাবা নিরাপদ, এবারের মতো মাপ করে দে বাপ। জালিয়াতির দায়ে যদি জেল খাটাস, তা হলে এই বুড়ো বয়সে কি বাঁচব? মাপ করে দে বাপ। এই তোর বাপের ধারের কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি!"

নিরাপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "লে হালুয়া!"

ছবি: সমীর সরকার

ধারাবাহিক রঙিন কমিক্‌স্‌ মরুভূমির অভিশাপ পঞ্চম কিস্তি এই সংখ্যায় গল্প ও ছবি: কৌশিক কুণ্ডু




এসব তুই বিশ্বাস করিস নীল? বুড়োর প্রলাপ ছাড়া এ আর কিছুই নয়!
আমার ক্যামেরা দিয়ে যা দেখি না, তা বিশ্বাস করি না।
তবে ওই দানোটানো নিয়ে একটু চিন্তায় আছি!
সত্যি বলতে কী, এই মুহূর্তে...
আমার মনটা কোনও এক আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত!
খালিদ, কী হয়েছে?
সর্বনাশ, এফেন্দি চুরি!
আপনার রুমের লকটা খোলা! ভিতরে এসে দেখি, এই অবস্থা!
সর্বনাশ, সব জিনিস লন্ডভন্ড!
জিনিসপত্র তছনছ করে কেউ কিছু খুঁজেছে!
যাক, ক্যামেরাটা ছোঁয়নি!
কী খুঁজেছে মনে হয় আন্দাজ করতে পারছি। প্রোফেসরের সেই প্যাপিরাস লিপি।
তবে বৃথা পরিশ্রম। সেটা সুরক্ষিত আছে আমার মোজার আড়ালে!
শাবাশ, তবে এটা সাধারণ নয়।
এটা আমাদের কালপ্রিটদের কাছে নিয়ে যেতে পারে।
আবার কে এল?
ঠক ঠক
গুড ইভনিং জেন্টেলমেন। এনি প্রবলেম?



আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না!
অধমের নাম জাঁ পিয়ের্দা। পাশের রুমে আমি আছি, এখানে গোলযোগ শুনে...
আরে, আসুন পিয়ের্দা। আপনার কথা জানি। চা খাবেন?
?!
চা নয়, তবে ব্ল্যাক কফি চলতে পারে, ধন্যবাদ।
প্রোফেসরের সাপ্লায়ার। এখানে ভাবিনি!
দুনিয়াভর আমি ল্যাবরেটরিতে অ্যাপারেটাস সাপ্লাই করি। গোমেজকেও। কিন্তু এখানে আটকে গেলাম। গোমেজ যেভাবে সর্পদেবী টা-এর কোপে পড়ে গায়েব হয়ে গেল! ভেরি স্যাড। আবার তোমাদের রুমেও তো শুনছি...
টা মনে হয় এই প্যাপিরাস লিপিটাও খুঁজছেন।
?!
সর্পদেবী টায়ের ব্যাপারটা জানো না বোধ হয়। এখানে সবাই মানে। দূর করো ওটাকে। ওসব অভিশপ্ত!
আলাপ করে ভাল লাগল মিঃ পিয়ের্দা।
ওসব জিনিস থাকে না ভাই। হারিয়ে গেলে আপশোস কোরো না!
এটা ডাঃ গোমেজের আমানত। কিন্তু একটা পুরনো পুঁথির কী শাপ থাকতে পারে?
আরে গোমেজও তাই ভুল করেছিল। কেন ঝামেলায় যাচ্ছ? ফেলে দাও।



JWT.3388.2004A



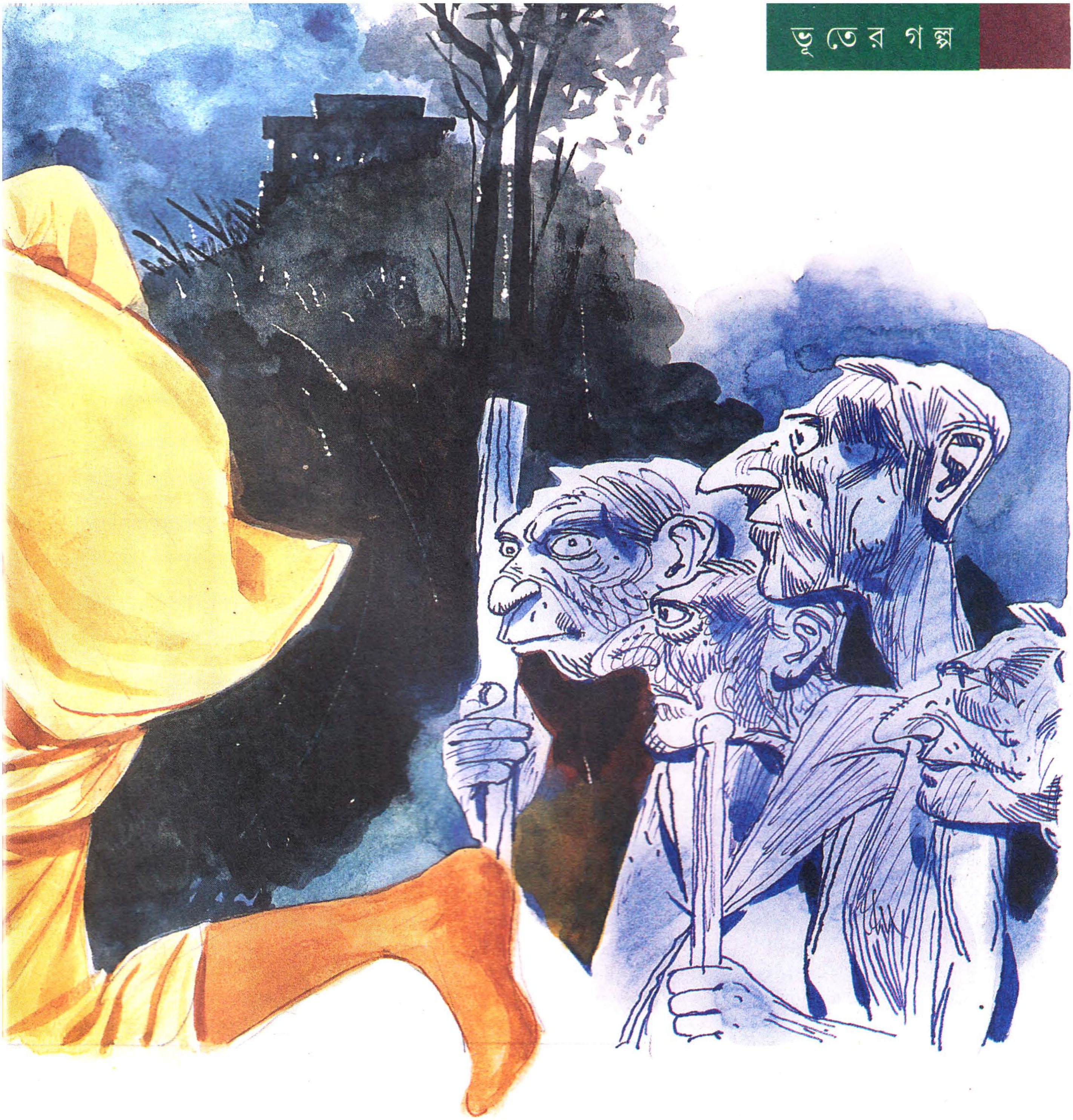
(এর পর আগামী সংখ্যায়)

জোড়া ভূতের কান্না

দুলেন্দ্র ভৌমিক



দখনোর দিকে একটা গ্রাম আছে, তার নাম ভুতুড়িয়া। এরকম নাম কেন তা জানি না। নানা জায়গার নাম এবং তার উৎপত্তি নিয়ে সুকুমার সেন মহাশয়ের একখানা বই আছে। সেই চটি বইটি বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেও ভুতুড়িয়া গ্রামের রহস্য উদ্ধার করতে পারিনি। গ্রামখানার নাম ভুতুড়িয়া কী করে হল তা নিয়ে ভুতুড়িয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে কোনও কৌতূহল নেই। নব্বইয়ের ঘরে পা রেখেছেন এমন জনাদুয়েক লোক বলেন, "একদা এই গ্রামের সদাশয় এবং দানশীল জমিদার ভূতনাথ চৌধুরী নাকি এক অমাবস্যার রাতে নিজের ঘরে খুন হন। কে বা কারা তাঁকে খুন করেছিল এবং কেন খুন করেছিল, তার কোনও হদিশ হয়নি। পুলিশ বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেছিল তদন্তের নামে জমিদারবাড়ির কাজের লোক মায় তাদের দুধওলাকে পর্যন্ত যৎপরোনাস্তি নাস্তানাবুদ করেছিল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ভূতনাথ চৌধুরীর মৃত্যু বা খুনের ঘটনা আজও তেমনই রহস্যে ঢাকা। যদিও এসব কথা গ্রামের শতকরা নব্বইজন মানুষই ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন



না বলে ভুলে ছিলেন বলাই ভাল। ভূতনাথ থেকেই হয়তো ভুতুড়িয়া হয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ভূতনাথ চৌধুরীর রহস্যজনক মৃত্যুটা কিছু লোকের মধ্যে আবার নতুন করে চর্চা হতে শুরু করেছে। প্রথম ঘটনা ঘটে এক শীতের রাতে। গ্রামখানা ঘন কুয়াশায় ঢাকা। আকাশে আলো নেই। কারণ, সেইদিন অমাবস্যা। এই গ্রামের কিছু অংশে বিজলিবাতি আছে বটে, তবে তা না থাকার মতোই। রোজই সন্ধের পর হুশ করে আলো চলে যায়। কখনও মধ্যরাতে আলো আসে, কখনও বা সকালের আগে আসেই না। এই গ্রামের মানুষ এতেই অভ্যস্ত। মানুষ একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে কর্তাব্যক্তিদের দায় বাঁচে। কারণ, মানুষ তখন অভিযোগ করতে ভুলে যায়। তা সেই প্রথম ঘটনার দিন পুব পাড়ার হরিপদ স্কুলের মাঠ থেকে যাত্রা শুনে একা-একা নিজের বাড়িতে ফিরে আসছিল। জমিদারি উঠে গেলেও জমিদারবাড়িটা এখনও আছে। অত বড় বাড়িতে গুটিকয়েক

লোক থাকে। যে ঘরে ভূতনাথবাবু খুন হয়েছিলেন, সেই ঘরটা দোতলায়। গয়ার প্রেতশিলায় গিয়ে পিণ্ডি দেওয়ার পরেও নাকি দোতলার ঘরগুলোতে ভূতের দৌরাত্ম্য কমেনি। ওই বাড়িতে যে কয়েকজন লোক এখনও থাকে, তারা সবাই একতলাতেই থাকে। রাতেরবেলা ভুলেও দোতলায় যায় না। কিন্তু বাইরের লোক যারা ওই বাড়ির সামনে দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করেন, তারা কেউ কখনও ভূতটুত দেখেনি। গ্রামের বহু লোক ভূত বিশ্বাসই করে না। হরিপদও করত না। কিন্তু ওই রাতে, মানে হরিপদ যে রাতে যাত্রা শুনে একা-একা জমিদারবাড়ির সামনে দিয়ে ফিরছিল, সেই রাতেই তার মনে হল, কে যেন তাকে পিছন থেকে ডাকছে, "হরে, এই হরে!"

হরিপদকে খুব চেনা লোকরাই 'হরে-হরে' বলে ডাকে। আজ এত রাতে জমিদারবাড়ির অন্ধকার ফটকের সামনে কে তাকে হরে-হরে বলে ডাকবে! প্রথমবার পিছন ফিরে কাউকে দেখতে না পেয়ে শোনার ভুল মনে করে আবার এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে ডাক এল, "হরে, এই হরে!"

হরিপদ দাঁড়িয়ে পড়ল। আস্তে-আস্তে পিছন ফিরে তাকাল। এমন থকথকে অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হরিপদ সাহসে ভর করে ডাকল, "কে? আমারে কে ডাকে?"

অন্ধকার থেকে উত্তর এল, "বদমাশ, নিজের বাপের গলা চিনতে পারিস না! আমি তোর বাপ!"

হরিপদ চমকাল। তার বাবা তো কবেই মারা গেছেন। এই মধ্যরাতে আবার তার বাবা আসবেন কেমন করে। এবার মনে হল, গলার ভঙ্গিটা তার বাবার মতোই বটে!

হরিপদ বলল, "বাবা, তুমি কি তবে মরোনি।"

হরিপদর বাবা উত্তর দিলেন, "মরেছি বইকী। নিশ্চয়ই মরেছি। কিন্তু আত্মার মুক্তি ঘটেনি বলে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

হরিপদ অবাক গলায় প্রশ্ন করল, "কেন বাবা, আমি তো গয়ায় গিয়ে তোমার পিণ্ডদান করেছি।"

হরিপদর বাবা খেপে গিয়ে বললেন, "ছাই করেছ! একজন জলতোলা বামুনকে দিয়ে ভুলভাল মন্ত্র পড়িয়ে তড়িঘড়ি পিণ্ডদান করেছিস। তার যে ট্রেন ধরার তাড়া ছিল। ওতে কি আত্মার মুক্তি হয়? তাই তো বৈতরণী পেরোবার আগেই যমের একখানা ব্যাকভলিতে আবার গ্রামে ফিরে এলুম। ভাগ্যিস, জমিদারবাবু ছিলেন তাই এই বাড়িতে, বাগানে, গাছে-গাছে আমার মতো কত অতৃপ্ত আত্মা মুক্তি না পেয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

হরিপদর এবার গা ছমছম করতে লাগল। সে বলল, "জমিদারবাবুর আত্মাও কি এই বাড়িতে ঘুরছেন?"

হরিপদর বাবা বললেন, "ঘুরছে কিনা দ্যাখ। ওই যে তিনি।"

হরিপদ বিশাল জমিদারবাড়িটার দিকে তাকাল। অন্ধকারের মধ্যে সাদা রঙের বড় বাড়িটা দিব্যি দেখা যাচ্ছিল। হরিপদ দেখল, দোতলার সানসেটের উপর দাঁড়িয়ে জমিদারবাবু গড়গড়া টানছেন। গড়গড়া টানার শব্দ এবং সুগন্ধি তামাকের গন্ধটা দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যে ছোট্ট একটা হাইফেনের মতো তার মনটা দুলছিল। হঠাৎ জমিদারবাবুর গম্ভীর গলা বলে উঠল, "নিরাপদ, কার সঙ্গে কথা কইছ? ওই লোকটা কে?"

হরিপদর বাবা নিরাপদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, আমার ছেলে হরিপদ।"

জমিদারবাবু বললেন, "তা বেশ! বাবাকে দেখতে এয়েছে বুঝি?"

নিরাপদ এবার অভিমানের গলায় বললেন, "দেখতে এয়েছে না ছাই! আমিই তো ডেকে দেখা দিলুম। এখনকার ছেলেদের মধ্যে পিতৃভক্তির বড়ই অভাব।"

জমিদারবাবু বললেন, "কী করবে হরিপদ! এ হচ্ছে যুগের হাওয়া। আমার দোতলায় রাখালবাবুদের পরিবার রয়েছেন। রাখালবাবু, তাঁর স্ত্রী আর মা। রাখালবাবুর ছেলেই বাবা-মা আর ঠাকুরমাকে ভিটেছাড়া করে উদ্বাস্তু করে দিল।"

নিরাপদর গলায় যেন অপার বিস্ময়। তিনি বললেন, "সেটা কেমন করে ঘটল?"

জমিদারবাবু গড়গড়ায় টান দিয়ে বললেন, "সে এক কাণ্ড। রাখালবাবুর ছেলে প্রোমোটার হয়েছে। জলাজমি বুজিয়ে বড়-বড় ফ্ল্যাটবাড়ি তুলছে। মৃত্যুর পর রাখালবাবু আর তাঁর স্ত্রী মোষডোবা খালের পাশে জলাজমিতে থাকতেন। ওখানেই মা'র সঙ্গে দেখা। তিনটি আত্মা বেশ সুখেই ছিলেন। কিন্তু থাকতে কি পারলেন! ওই জলাজমিতে রাখালবাবুর ছেলের নজর পড়ল। ব্যস, জমি ভরাট করে, তরতর গতিতে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে গেল। ফলে রাখালবাবু মা-বউ নিয়ে এখন উদ্বাস্তু। বাধ্য হয়ে আমার দোতলায় থাকতে দিতে হল। জলার ভূত, এই প্রজাতির ভূত প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে!"

হরিপদর শরীর কাঁপছিল। সে কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছে না তো? নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখল, না সে জেগেই আছে। ভয় তাকে এমনই আড়ষ্ট করে ফেলল যে, সে দৌড়তে গিয়ে পায়ে পা জড়িয়ে রাস্তাতেই পড়ে গেল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল এর কয়েকদিন পর। ঠিক সন্ধের মুখে। মাঠ থেকে গোরু নিয়ে ফিরছিল কানাই-দুধওয়ালা। সে হঠাৎ দেখল, একটা জ্বলন্ত সিগারেট তার দিকে এগিয়ে আসছে। ওটা যে সিগারেট, সেটা প্রথমে বোঝা যায়নি। কাছে আসতে কানাই-দুধওয়ালা দেখল, সিগারেটটা যেন শূন্যে ঝুলছে। কেউ একজন সেটা যে টানছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ফুক-ফুক করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। অথচ সামনে কেউ নেই। কানাই ভয় পেল, তবু বলল, "তুমি কে গা? মুখের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছ অথচ শরীরখানা দেখা যাচ্ছে না?"

এবার ফ্যাঁক-ফ্যাঁক করে একটু হাসি শোনা গেল। পরে বলল, "বড় যে দেখার শখ! বেঁচে থাকতে একবারও দেখতে গিয়েছ?"

কানাই বলল, "তুমি কে বটে গো? যারে দেখা যায় না, তারে দেখতে যাব কেমন করে?"

এবার উত্তর এল, "আমি তোমার শ্বশুর। বিয়ের সময় কুড়ি ভরি সোনার সঙ্গে দশ হাজার টাকা নগদ নিয়ে আমাকে ফতুর করেছ। বেঁচে থাকতে কিছু করতে পারিনি। এবার তার শোধ



জোড়া ভূতের কান্না

তুলব।"

এই পর্যন্ত বলে যেই না কানাইয়ের হাত থেকে গোরুর দড়িটা টান মেরে নিয়ে নিল, অমনি কানাই 'ওরে বাবা রে, বাঁচা রে' বলে ছুটতে-ছুটতে গ্রামের মধ্যিখানে হেলাবটতলায় এসে ক্লাবঘরের দরজায় উপুড় হয়ে পড়ল। নিরাপদ তারপর কানাই, এই দু'জনের ঘটনার পর থেকে ভুতুড়িয়া গ্রামে ভূতের ভয়টা আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সন্ধের পর কেউ আর একা-একা কোথাও যায় না। জমিদারবাড়ির সামনের রাস্তাটা ভুতুড়ে রাস্তা বলে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ায় ওই রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল কমে আসতে লাগল। গ্রামের সবাই ভয়ে কাবু। সন্ধে নামার পর থেকেই যেন আতঙ্ক ছড়াতে থাকে। কিন্তু এভাবে তো বেশিদিন কাটানো যায় না। অতএব পঞ্চায়েতে খবর গেল। পঞ্চায়েত খবর দিল থানায়। থানা খবর পাঠাল এস পি-কে। এস পি থেকে ডি এম আর দমকল হয়ে গ্রামের কাছে দু' মাস পরে যে খবরটি এল, তার সারমর্ম হল, 'ভূত ধরা আমাদের কাজ নয়। নিজেরা সতর্ক থাকুন। সংঘবদ্ধভাবে ভূতেদের মোকাবিলা করুন। আবেদন করলে সরকারি সহযোগিতা পাবেন।'

এইরকম খবরে মুষড়ে পড়ারই কথা। গ্রামের সবাই মুষড়ে পড়লেন। এরই মধ্যে কোদালিয়া গ্রাম থেকে দু'জন ভূত তাড়ানোর ওঝা নিয়ে আসা হল। ওঝা দু'জন এলেন। পেটপুরে সিধু ময়রার দোকান থেকে কচুরি, অমৃতি আর জিবেগজা খেয়ে বললেন, "একটা-দু'টো ভূত হলে চেষ্টা করা যেত। এ যে দেখছি গোটা গ্রামেই ভূত থইথই করছে। ভুতুড়িয়া তো এখন ভূতেদের নিজস্ব কলোনি। ক'টাকে তাড়াব? তাড়িয়ে দিলে এত ভূত যাবেই বা কোথায়? ভূত-পেতনি যাই হোক, মানবিকতার ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে! পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করাটা অমানবিক।"

ওঝা দু'জন সাত টাকা করে চোদ্দ টাকা গাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন। এর ঠিক তিনদিন পর ঘটল আর-এক কাণ্ড। রাতের দিকে তো জমিদারবাড়িতে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। কেউই যেতে চায় না। একবার কথা হয়েছিল, সবাই যদি দল বেঁধে যাই এবং আমাদের সঙ্গে যদি পুলিশ থাকে, তা হলে? কিন্তু থানার দারোগা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, "চোর, ডাকাত, খুনি ধরার ট্রেনিং আমাদের আছে। কিন্তু ভূত ধরার কোনও ট্রেনিং আমাদের দেওয়া হয়নি। অতএব, আমাদের দ্বারা ওসব কাজ হবে না।"

দমকল তো আগেই জানিয়ে দিয়েছে, "ভূত যদি কোথাও আগুন ধরিয়ে দেয়, তা হলে সেই আগুন নেভাতে আমরা যাব। আমাদের কাজ আগুন নেভানো।"

ভুতুড়িয়া গ্রামের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ভুতুড়িয়া সমাচার' তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে সরকার আর প্রশাসনের সমালোচনা করে লিখল, 'এ কেমন সরকার, কেমন প্রশাসন? যে সরকারের ভূত ধরার কোনও পরিকাঠামোই নেই। পলাশির যুদ্ধের পরই এই গ্রাম ভূত-কবলিত হয়। তখন এর নাম হয় ভুতুড়িয়া। ক্রমে-ক্রমে ভূত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে আবার এত ভূত আমদানি হল কোত্থেকে। ভূতেদের এই অবৈধ অনুপ্রবেশ আটকানোর কি কোনও উপায় নেই!'

যখন ভুতুড়িয়া গ্রামে ভূতের উৎপাত নিয়ে এই ধরনের আলোচনা চলছে, তখনই জমিদার বাড়ির একজন কর্মচারী এসে হেলাবটতলার ক্লাবঘরে একটি আশ্চর্যের খবর দিল। হেলাবটতলার ক্লাবঘরে আপাতত ভূত প্রতিরোধ কমিটির অস্থায়ী অফিস করা হয়েছে। সেই প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি গিরিধারী হালদার যখন ক্লাবঘরে ভূতেদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই এক জঙ্গী ভূত সবার দৃষ্টির আড়ালে এসে গিরিধারী হালদারের গালে এমন একটি চড় কষাল যে, তার শব্দ ক্লাবঘরের বাইরে সিধু ময়রার দোকান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গিরিধারীবাবুর সেটাই শেষ ভাষণ। তারপর তিনি দু'খানি কষের দাঁত খুইয়ে বাড়িতেই শয্যা নিয়েছেন। ভূত বিষয়ে কোনও মতামতই দিচ্ছেন না।

হেলাবটতলার ক্লাবঘরের সামনে জমিদারবাড়ির জনৈক কর্মচারীকে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকাল। কেউ-কেউ একটু দূরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, "কী ব্যাপার? নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?"

কর্মচারীটি বলল, "নতুন মানে, তাজ্জব ব্যাপার। দোতলায় ভূতেদের মধ্যে কী ঘটেছে জানি না। কিন্তু দু'টি ভূত বেজায় কাঁদছে। কেঁদেই চলেছে। মানুষ অথবা ভূত যেই হোক, কেউ যদি উপরে কেবল কেঁদে চলে, তা হলে নীচে আমরা থাকি কেমন করে?"

"খুবই খাঁটি কথা। ভূত বলে কি তাদের দুঃখ-কষ্ট নেই। কিন্তু কাঁদছে কেন? ভূতই যে কাঁদছে সেটা কিসে বোঝা গেল?"

ওই কর্মচারী বলল, "তা ছাড়া কে কাঁদবে! দোতলার বারোখানা ঘরে তেনারা ছাড়া আর আছেটা কে?"

মধু বড়াল গ্রামের প্রধান মানুষ। তিনি বললেন, "বারোখানা ঘরে বারোখানা ভূত?"

কর্মচারী বলল, "বারোখানা ঘরে বারোজন নাকি বত্রিশজন তা তো গুনে দেখিনি! তবে সব ঘরেই তেনারা আছেন।"

মধু বড়াল বললেন, "বাংলায় বারো ভুঁইয়ার কথা জানি। এ যে দেখছি ভূতেদের মধ্যে আবার সেই বারো ভুঁইয়া।"

পঞ্চানন সাঁতরা পঞ্চায়েতের সদস্য। তিনি বললেন, "ব্যাপারটা সোজা নয়। কথায় বলে না, সবকিছু বারোভূতে খাবে। অতএব, বারোভূত মানেই খুব বিপজ্জনক ব্যাপার। যাই করবেন, খুব সাবধানে।"

জমিদারবাড়ির কর্মচারীকে বসিয়ে রেখে সবাই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিল, জমিদারবাড়িতে ভূতেদের কান্নাটা শুনতে আমাদের যাওয়া উচিত। যদি ওদের কান্নার উপশম করা যায় তা হলে হয়তো বুঝিয়েসুজিয়ে ওদের গ্রাম ছাড়া করা যাবে। কিন্তু যাবে কে? সবাই প্রস্তাব করল, হরিপদই যাক। কেননা, ওখানে ওর বাবা নিরাপদ আছেন। তিনি ছেলের বড় রকমের কোনও অকল্যাণ করবেন না। বরং রক্ষা করবেন। কানাই-দুধওয়ালার যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। ওখানে কানাইয়ের শ্বশুর আছেন। জামাই-শ্বশুরের সম্পর্ক একেবারেই ভাল না। অতএব, হরিপদই যাক। অন্যরা জমিদারবাড়ির বাইরে



জোড়া ভূতের কান্না

থাকবে। আর কান্না যখন দিনেও শোনা যাচ্ছে, তখন রাতে যাওয়ার দরকার নেই। হরিপদ দিনেই যাবে। অন্যরা পশ্চাতে থাকবে। হরিপদ যে এককথায় রাজি হয়ে গেল, তা নয়। অনেক খোষামোদের পর তাকে রাজি করানো গেল।

একদিন বেলা এগারোটা নাগাদ দশ-বারোজনের একটা ছোট দল জমিদারবাড়ির দিকে রওনা দিল। সেদিন আকাশটা একটু মেঘলা-মেঘলা ছিল। অন্যদিনের মতো ঝকঝকে রোদ নেই। পথ চলতে-চলতে সেই দলের মধ্যে থেকে কে যেন একজন বলে উঠল, "আজকের আবহাওয়া খারাপ। মেঘলা দিনের আর বাদলা দিনের ভূতেরা বদমেজাজি হয়। সব কিছু বুঝেশুনে কথা বলতে হবে। হরিপদকে সেটা বলে দেওয়া দরকার।"

হরিপদ কথাটা শুনল। মুখে কিছু বলল না বটে, কিন্তু ভিতরে গজগজ করতে-করতে বলল, "সবজান্তা সর্বেশ্বর। এ যেন ভূতের মামা!"

জমিদারবাড়ির দু'জন কর্মচারী গেটের সামনেই অপেক্ষা করছিল। সবাই বাড়ির ভিতরে ঢুকল না। হরিপদকে নিয়ে মাত্র তিনজন জমিদারবাড়ির একতলায় এসে শুনল, দোতলায় দু'টি দুঃখী ভূতের কান্না। ভূতেরা কাঁদে কিনা তাই তার জানা ছিল না। জোড়া ভূতের এই করুণ কান্না শুনে হরিপদর হঠাৎ মনে হল, তার বাবা কাঁদছেন না তো? যে-কোনও কারণেই হোক, আজ না হয় বাবা ভূত হয়েছেন, কিন্তু বাবা তো বটে! হরিপদর মন খারাপ হয়ে গেল। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে গিয়ে হরিপদ বিষণ্ণ গলায় ডাকল, "বাবা, বাবা গো? তোমার কী হয়েছে?"

একটু পরে উপর থেকে উত্তর এল, "কে? হরিপদ? আমার হরে! তা কী মনে করে এলি বাবা!"

হরিপদ বলল, "তোমাদের মধ্যে কারা কাঁদছে? কী হয়েছে?"

হরিপদর বাবা নিরাপদ উত্তর দিলেন, "দাঁড়া, আমি নীচে গিয়ে বলছি।"

হরিপদ ছাড়া অন্যরা হরিপদকে বলল, "হরিপদ, বাবাকে নীচে নামতে বারণ কর। যা বলার উপর থেকেই বলুন।"

ভূতেদের মতিগতি সম্বন্ধে হরিপদ মোটেও ওয়াকিবহাল নয়। বাবা বেঁচে থাকতে তাঁর মতিগতিই বুঝতে পারত না। এখন সেই বাবা ভূত হয়ে গিয়ে কেমন মতি হয়েছে সেটা জানার উপায় নেই। তাই হরিপদ বলল, "বাবা, তুমি সিঁড়ির উপর থেকেই বলো। কষ্ট করে নীচে নামার দরকার নেই।"

উপরের ঘরে জোড়া ভূতের কান্নাটা তেমনই চলছিল। ভূতবাবা নিষেধ শুনলেন না। সিঁড়িতে খটাখট শব্দ করে নীচে নেমে এসে বললেন, "আমি এসেছি, দেখা পাচ্ছিস না বলে মনে করিস না আমি আসিনি। এবার বল, দলবল নিয়ে কেন এসেছিস?"

হরিপদ একবার ঢোক গিলে বলল, "বাবা, জন্ম অবধি শুনে আসছি ভূত নাকিসুরে কথা কয়, নাকিসুরে কাঁদে। কিন্তু তোমরা তো তা করছ না।"

হরিপদর ভূতবাবা নিরাপদ বললেন, "ভুল শুনে এসেছিস। তোদের মানুষদের মধ্যেও তো অনেকে নাকিসুরে কথা কয়, নাকিসুরে গান গায়, এমনকী, রবি ঠাকুরের গানও নাকের ন্যাকামি দিয়ে গায়, তার বেলা? আমি মানছি, মানুষের মতো ভূতেদের মধ্যেও কারও-কারও নাসিকা সমস্যা আছে। এটা কোনও দোষের নয়।"

হরিপদ বলল, "উপরে কাঁদে কারা? ওদের কষ্টটা কীসের?"

নিরাপদ জবাব দেওয়ার আগেই গম্ভীর গলায় জমিদারবাবু বললেন, "তোমরা কি কেউ ওর কষ্টটা দূর করতে পারবে? কান্না থামাতে পারবে?"

হরিপদ খুব বিনীতভাবে বলল, "কান্নার কারণ জানা গেলে চেষ্টা করতে পারি।"

জমিদারবাবু এবার বললেন, "ওদের একজন আমার নিষেধ অমান্য করে একা গঞ্জের হাটে বেড়াতে গিয়েছিল। ভূত হয়েই যদি যেত তা হলে অঘটনটা ঘটত না। বাহাদুরি দেখিয়ে গেল মানুষের রূপ ধরে। ব্যস, ওখানে ওকে মানুষে ধরল।"

হরিপদ অবাক গলায় বলল, "কিসে ধরল?"

জমিদারবাবু বললেন, "মানুষে। ভূত যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপে অর্থাৎ ভূত মানুষকে ধরে, এখানে তার উলটোটা ঘটল। মানুষ ভূতকে ধরল। এখনও ধরেই আছে!"

হরিপদ বলল, "তাড়াতে পারছেন না?"

এবার জমিদারবাবুর ভূত নয়, হরিপদর বাবার ভূত বললেন, "কী করে তাড়াব? আমরা কী মানুষ তাড়াবার মন্ত্র জানি! তিব্বতে খবর গেছে। ওখান থেকে দু'জন লোক আসবে। তারা নাকি মানুষের ওঝা। ভূতকে মানুষ ধরলে একমাত্র ওরাই ছাড়াতে পারে। ওদের ভরসাতেই আছি। তোরা তো জানিস না, জমিদারবাবুর ভাগনে জমিদারবাবুকে খুন করে গা ঢাকা দিয়েছিল। সেই জমিদারবাবুই ভূত হয়ে একদিন মোষডোবাখালের ধারে ভাগনেকে খুন করেন। এমনই কপাল, সেই ভাগনের ভূত এখন আশ্রয়ের জন্য জমিদারবাবুর পা ধরে কান্নাকাটি করে। জোড়া ভূতের কান্নার মধ্যে ওই ভাগনের ভূতের কান্নাও আছে। আমরা বাপু আমাদের নিয়ে আছি। তোরা তোদের নিয়ে থাক না। আমাদের টানাটানি কেন? আমাদের নিয়ে এত রঙ্গ-তামশাই বা কেন? ভুতুড়ে ব্যাপার, ভুতুড়ে ভোটার, ভুতুড়ে বেগার, বারোভূতে খাবে, এত ভূত নিয়ে কথা কেন? ভূতের কান্না শুনে ছুটে এলি? তোরা কি মানুষের কান্না শুনতে পাস না? ভূতের ওঝা না খুঁজে দুঃখের ওঝা খোঁজ।"

জমিদারবাবুর ভূত বললেন, "চলে এসো নিরাপদ। এসব কথা কাকে বলছ? আজ শুনবে কাল ভুলে যাবে। চলো, ওদের পাশে গিয়ে বসি। ওদের দুঃখের ভাগ নিই। ভূতের দুঃখ ভূত না বুঝলে কে বুঝবে! চলে এসো।"

সিঁড়িতে শব্দ করে ওঁরা উঠে গেলেন। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে এক সময় হরিপদর মনে হল, সেও যেন ভূত হয়ে যাচ্ছে। সত্যিকারের মানুষ না হতে পারার চেয়ে ভূত হওয়া বোধ হয় খারাপ নয়!

ছবি: অনুপ রায়

যত অন্ধকার তত ভূত

অশোক বসু



মাঠের নাম পাগলডাঙা। মাঠের শেষে জঙ্গল। জঙ্গলের নাম ডাকাতকালীর জঙ্গল। সেখানে বিশাল-বিশাল গাছ, লতাপাতা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে একটু এগোলে দিনের বেলাতেই মনে হয় নিঝুম রাত। চারপাশে থমথম করছে নির্জন, নিস্তব্ধতা। অনেকদিন আগে নাকি এই জঙ্গলে ভয়ংকর সব খুনে ডাকাত থাকত। এখন ডাকাত নেই, তবে জঙ্গলটা আছে। জঙ্গলের মধ্যে কালীমন্দিরটাও আছে। তবে মন্দিরে কোনও বিগ্রহ নেই। মন্দিরকে ঘিরে আছে আগাছার ঝোপঝাড়। মন্দিরটাও ভেঙেচুরে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে।

এক শনিবার দুপুরের শেষে মদনের সঙ্গে ঢুকেছি সেই জঙ্গলে। জঙ্গলে এখন ডাকাতের বদলে ভূত আছে। মদন জাল আর ধামা নিয়ে এসেছে ভূতের বাচ্চা ধরবে বলে। ভূতের বাচ্চাকে নাকি যত্নআত্তি করে মানুষ, মানে আস্ত ভূত করতে পারলে তাকে দিয়ে অনেক অবাক কাণ্ড করিয়ে নেওয়া যায়। এমনকী, সে আমাদের হয়ে অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিয়ে আসবে। অঙ্কে আশি, ভূগোলে পঁচাশি, ইতিহাসে সাতাশি কে আটকায়! এসব অবশ্য মদনের কথা। মদন একটু খ্যাপাটে হলেও আমি ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কের নম্বর সাতাশ থেকে সাতষট্টি করার লোভে মরিয়া হয়ে তার সঙ্গে জঙ্গলে এসেছি।

মদন আমার চেয়ে তিন-চার বছরের বড়। যদিও সে আমার সহপাঠী। তিন ক্লাস উঁচুতে পড়ত। পিছোতে-পিছোতে এখন আমাকে ধরে ফেলেছে। কথা বলার আগে খামোকা একবার নাক টেনে নেয়। কালো, লম্বা, সিড়িঙ্গে চেহারা। মাথায় কদমছাঁট চুল। কাকপক্ষীরা নাকি ওকে দেখে ভুল করে কাকতাড়ুয়া ভেবে তল্লাট ছেড়ে পালায়। খুদে-খুদে চোখ দু'টো

দেখে মনে হয়, সব সময় হাজারও দুষ্টুমি মাথায় ঘুরছে। তার যে-কোনও একটা এখনই করে ফেললে মজা মন্দ হয় না। কিছুটা 'টেনিদা' আর অনেকখানি 'পাগলা দাশু' পাঞ্চ করে তৈরি মজাদার চরিত্র। কখনও চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কিছু একটা করা চাই। তবে সেই কিছু একটা করাটা মাঝে-মাঝে আমার ক্ষেত্রে ঠিক আনন্দের কারণ হয় না, এই যা! কিন্তু কী আর করা যায়! মদনকে ছাড়া জমেও না যে কিছু!

এই তো পরশুদিন সকালে খুব মন দিয়ে ইতিহাস পড়ছিলাম। সামনেই বার্ষিক পরীক্ষা। এইট থেকে নাইনে ওঠার অগ্নিপরীক্ষা যাকে বলে। এদিকে ইতিহাসে আমি বরাবরই ভয়ানক কাঁচা। দশবার মুখস্থ করেও সন, তারিখ, ঘটনা কিছুই মনে থাকে না। বাবর হয়ে যান আকবরের ছেলে, পুরুর কাছে যুদ্ধে আলেকজান্ডার হেরে যান। ইতিহাসের স্যার কান টেনে ধরে বলেন, "আগে ভাবতাম তোর মাথায় গোবর আছে। এখন দেখছি তাও নেই। গোবর থাকলে অন্তত ঘুঁটেটাও হত। গেরস্তের সাশ্রয় হত!"

সেদিন আবার থার্ড পিরিয়ডে ইতিহাস। আবার ইতিহাসে যতটা ভয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয় ইতিহাস স্যারের বিখ্যাত গাট্টাকে। নিমেষের মধ্যে মাথায় নৈনিতালের আলুর ফলন ফলিয়ে দেবেন। তাই প্রাণপণে ইতিহাস মুখস্থ করছিলাম। কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না, পানিপথের যুদ্ধটা স্থলপথে না হয়ে জলপথে হল কেন?

হঠাৎ একটা ছোট্ট ঢিল জানলা দিয়ে ঘরে এসে পড়ল। পড়া থামিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দেখলাম, যা ভেবেছি ঠিক তাই। পড়ার ঘরের পাশে রাস্তার ধারে লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে মদন। যেন মস্ত কোনও জ্যোতির্বিজ্ঞানী খালি চোখে দিনের বেলাই আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যস্ত! এবং এই মুহূর্তে জাগতিক কোনও ব্যাপারের মধ্যে সে নেই। অথচ ঢিল পড়ার মানেটা তো আমি ভালই জানি। এখনই পড়া ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। না এলে পরে দেখা হলে সঙ্গে-সঙ্গে ফাইন। পিসির বয়াম থেকে গুনে-গুনে চারটে তিলের নাড়ু হাতিয়ে আনতে হবে।

আমি বাইরে এলে মদন গম্ভীর মুখে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে নাক টেনে বলল, "গুড বয়ের মতো পড়াশোনা করছিলি দেখলাম। তা কী পড়ছিলি?"

বললাম, "ইতিহাস।"

"ইতিহাস? ভেরি গুড। তোর হবে! আচ্ছা বল তো, চন্দ্রগুপ্ত রাজা হয়ে প্রথমেই কী করেছিলেন?"

যথারীতি প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না। কিন্তু গম্ভীর মুখ করে এমনভাবে মাথা চুলকোতে থাকলাম যেন উত্তরটা আসি-আসি করেও আসছে না।

মদন বলল, "কী রে, ভুলে গেলি?"

বললাম, "ভুলে যাইনি, মনে পড়ছে না। তুই বল তো, কী করেছিলেন?"

মদন বলল, "চন্দ্রগুপ্ত রাজা হয়ে প্রথমেই সিংহাসনে গিয়ে বসেছিলেন।"

বললাম, "রাইট। আমি অবশ্য এখনই বলতাম। উত্তরটা অর্ধেকটা এসে গিয়েছিল, বাকিটা একটু পরেই আসত।"

মদন বলল, "তোর ওই একটু পরে মানে ক'বছর র‍্যা? যা একখানা সলিড মাথা বানিয়েছিস না, কিছুই ঢুকবে না। হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকলে পেরেকই বেঁকে যাবে। ইতিহাসে সতেরো নম্বর কোনওদিনই সাতচল্লিশ হবে না।"

প্রাণঘাতী সত্যি কথা। ব্যাকবেঞ্চার মদন বললেও কথাটা সত্যি। কোনও কথা না বলে করুণ মুখে মদনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার অবস্থা দেখে মদনের বুঝি দয়া হল। বলল, "ঘাবড়াও মত। তুই তো তবু সতেরো, আমি সাতই পেরোতে পারছি না। তাই দেখলাম, পড়াশোনা করে পণ্ডশ্রম করে কী লাভ, যখন অব্যর্থ দাওয়াই হাতের কাছে আছে। ইতিহাসে আশির ঘরে নম্বর পেতে চাস? শুধু ইতিহাস কেন, ভূগোল, অঙ্ক, ইংরেজিতে মন্ডা-মেঠাইয়ের মতো রাশি-রাশি নম্বর পেয়ে তরতর করে পাশ করতে চাস কি না বল?"

"চাই না আবার!" মহা উৎসাহে বললাম, "খুব চাই। নিশ্চয়ই চাই।"

মদন বলল, "তা হলে আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যেতে হবে।"

বললাম, "একটা কেন, একশোটা জায়গায় যেতে পারি। যেখানে যেতে বলবি সেখানেই যাব। যা করতে বলবি তাই করব। এমনকী, ইতিহাসকে ভেংচি কেটেও আসতে পারি।"

নাক টেনে মদন বলল, "গুড। জীবনে উন্নতি করতে গেলে এমনই সাহস থাকা চাই। শোন, আগামী শনিবার অমাবস্যা। সেদিন বিকেলের দিকে আমার সঙ্গে ডাকাতকালীর জঙ্গলে যাবি?"

জঙ্গলের নাম শুনে লাফালাফি মুহূর্তে শেষ। বললাম, "ডাকাতকালীর জঙ্গল! ওটা তো ভয়ংকর জঙ্গল রে! ওখানে ডাকাতরা থাকে! ধরে নিয়ে যদি নরবলি দিয়ে দেয়!"

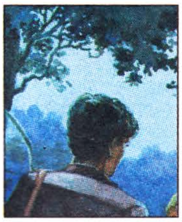
মদন বলল, "এই তোর সাহস? আরে হাঁদারাম, ডাকাতরা এখন জঙ্গলে থাকে না! শহরে মোটরগাড়ি করে ঘুরে বেড়ায়।"

বললাম, "ডাকাত না থাকুক, বাঘ তো আছে। আর বিকেলে তো ওদের লাঞ্চের সময়ও হতে পারে।"

রোগাপটকা আমার দিকে চেয়ে মদন বলল, "বাঘেদের শুধু হাড্ডি চিবিয়ে লাভ কী? ওরা মাংস খেতে ভালবাসে। তোর দিকে তাকাতে ওদের বয়ে গেছে। আর আমার মার্কামারা মূর্তি দেখে উলটে বাঘেরাই ল্যাজ তুলে চম্পট দেবে। শোন হাঁদারাম, এ জঙ্গলে বাঘ থাকে না। ভূতের ভয়ে সব বাঘ ভুটানের দিকে পালিয়েছে।"

বললাম, "ভূত! ভূত মানে?"

"মানেটা ডিকশনারিতে আছে, দেখে নিস। ভূত হল তেনারা। রাতের বেলায় যাঁরা দেখা দেন। ডাকাতকালীর জঙ্গলে দেদার ভূত আছে। গাছে-গাছে, ডালে-ডালে শ'য়ে-শ'য়ে, হাজারে-হাজারে। কন্দকাটা, শাঁকচুন্নি, ব্রহ্মদত্যি, সব রকমের। ওই ভূতের খোঁজেই ডাকাতকালীর জঙ্গলে যাব।



যত অন্ধকার তত ভূত

যে-কোনও একটা ভূতের বাচ্চা জ্যান্ত ধরে আনব।"

গম্ভীর মুখে বললাম, "ছোটকা বলেছে, ভূত বলে কিছু নেই।"

মদন একটু সময় আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন গোলকিপার হয়ে আমি হাফটাইমের আগেই গুনে-গুনে পাঁচ গোল খেয়েছি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাক টেনে বলল, "হয়ে গেছে।"

মদনের ভাবভঙ্গি ভাল ঠেকল না। বললাম, "কী হয়ে গেছে?"

মদন বলল, "বললাম তো হয়ে গেছে। শিবঠাকুরেরও সাধ্যি নেই তোকে বাঁচায়। বিস্যুদবার বারবেলায় প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে অমনই বলে দিলি, ভূত বলে কিছু নেই!"

"বললাম তো! কেন, কী হয়েছে তাতে?"

"কী হয়েছে টের পাবি তেরাত্তির পার করে। ভূতেদের কানে ঠিকই কথাটা পৌঁছে গেছে। পরীক্ষায় যাও-বা সতেরো-আঠারো পেতিস, তাও পাবি না। তিন-চারের উপরে উঠতে পারবি না। খুব কষ্ট হচ্ছে রে তোর জন্য। হাজার হোক, এক ক্লাসের বন্ধু তো!"

এবার সত্যিই একটু ঘাবড়ে গেলাম। ছোটকা বলল, 'ভূত নেই', আর আমি সেটা খাঁটি সত্যি বলে মেনে নিলাম, তাও তো নয়। ছোটকা তো চালাকি করে অনেক কথা বলে, গুলতাপ্পি ঝাড়ে। তা ছাড়া ভূতটুত মোটেই ভাল ব্যাপার নয়। তাদের সম্বন্ধে আগবাড়িয়ে কিছু বলাটা মোটেই ঠিক হয়নি। কী বলতে কী হয়ে যাবে, কে বলতে পারে! মুখে শুকনো হাসি এনে বললাম, "এই মদন, ইয়ার্কি মারছিলাম রে! ভূত আছে। সবাই থাকতে পারে, ভূত থাকবে না কেন! আলবত আছে, একশোবার আছে।"

খুশি হওয়া তো দূরের কথা, মদন চোখ বড়-বড় করে বলল, "কী? কী বললি এক্ষুনি! মজা করছিলি? ভূতদের নিয়ে মজা! জানিস, মজা করার কথা শুনলে ভূতরা মহা খেপচুরিয়াস হয়ে যায়। ঘাড়ে চেপে বসে। আর একবার চেপে বসলে, ঝাড়ফুঁক-ওঝা-গুনিন তো ছার, স্বয়ং টাউন দারোগাও ঘাড় থেকে ভূতকে নামাতে পারবে না।"

ভূতের ঘাড়ে চেপে বসাটা মোটেই খুব সুখকর জিনিস হবে না। অকারণে ঘাড়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বললাম, "ভূতরা ঘাড়ে চেপে বসে কী করে রে মদন?"

মদন নাক টানল, "অনেক কিছুই করে। 'বহুব্রীহি' কাকে বলে বলতে বলবে, 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বানান বলতে বলবে, তেইশের ঘরের নামতা বলতে বলবে। না বললে অ্যাইসা কাতুকুতু দেবে যে, লাইফ হেল হয়ে যাবে।"

ফ্যাকাসে মুখে বললাম, "আ-আর?"

"আরও অনেক কিছু করতে পারে। তেনাদের কারসাজিতে পরীক্ষার খাতায় ভুলভাল লিখে আসবি। জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখে আসবি।"

গুরুতর ব্যাপার। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মদন বলল, "কী রে, হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? জগদীশচন্দ্র কে ছিলেন জানিস তো?"

বললাম, "জানব না কেন, খুব জানি। বসু ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু।"

মদন বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বলল, "এটা অবশ্য বেঠিক বলিসনি। কিন্তু ভূতেদের নিয়ে মজা করার কথাটা তেনারা কীভাবে নেবেন কে জানে!"

চট করে রাস্তার এধারওধার দেখে নিয়ে বললাম, "এখন তো রাস্তায় কেউ নেই। দিনেরবেলা। কথাটা ওঁদের কানে যাবে না!"

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে মদন বলল, "ওরে মূর্খ, দিনেরবেলা রাতেরবেলা নয়। ভগবানের মতো ভূতও সব সময়, সব জায়গায় আছে। শুধু চোখে দেখা যায় না।"

তো-তো করে বললাম, "তা হলে উপায়?"

মদন বলল, "উপায় অবশ্য আছে একটা। আজ থেকে তিনদিন রোজ তিনশোবার করে 'রাবণ-রাবণ' বলে জপ করতে হবে। 'রাম-রাম' করলে ভূতেরা বিরক্ত হয়, কিন্তু রাবণ-রাবণ বললে ভীষণ খুশি হয়। শোন, শনিবার ঘোর অমাবস্যা। ওইদিন আমার সঙ্গে ডাকাতকালীর জঙ্গলে যাবি। এই তো পরশু এক কাপালিকের সঙ্গে দেখা। একেবারে আসল কাপালিক। খুব ভক্তিটক্তি দেখিয়ে পাঁচসিকে প্রণামী দিয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করাতে খুশি হয়ে ভূতদের সুলুকসন্ধান জানিয়ে দিয়েছেন। উনি ওই জঙ্গলে বহুদিন তন্ত্রসাধনা করেছেন কিনা! ভূতদের আটঘাট সব জানেন। উনিই বলে দিলেন, জঙ্গল থেকে একটা ভূতের বাচ্চা ধরে এনে পুষতে পারলে একেবারে কেল্লাফতে! ভূতকে দিয়ে ইচ্ছেমতো সব কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে। স্যারেরা দেখবেন তুই পরীক্ষা দিচ্ছিস, আসলে কিন্তু তুই সেজে ভূত পরীক্ষা দিয়ে আসবে। কেউ ধরতে পারবে না। আর ভূত পোষার খরচাও নেই। খায় শুধু কাদা, আর রাখতে হবে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে। কী রে, রাজি আছিস তো? অবশ্য ভয় পেয়ে ভেবড়ে গেলে তোর গিয়ে কাজ নেই। আমি একাই যাব। আমার আর কী। বন্ধু বলে বিনি পয়সায় তোর উপকার করতে চাইছিলাম।"

মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। পরীক্ষার এত-এত নম্বর একটুর জন্য ফসকে যাবে? একটু সাহস করলেই যখন নম্বরগুলো ডিগবাজি খাইয়ে পনেরোকে একান্ন করে নিতে পারি! বললাম, "ভয় পাব কেন! তুই-ই তো সঙ্গে থাকবি! নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু জঙ্গলটঙ্গলে বিকেলে কেন, দুপুরে গেলেই তো হয়।"

মদন বলল, "না, হয় না। কারণ, যত বেলা গড়াবে, তত ভূত দেখতে পাওয়া যাবে। তেনারা তো অন্ধকারের জিনিস!"

শুকনো মুখে বললাম, "বেশ, বিকেলেই যাব।"

মদন নাক টেনে বলল, "ভেরি গুড। যা, তা হলে বাড়ি গিয়ে পিসির বয়াম থেকে কয়েকটা নাড়ু নিয়ে আয়। তোর ফাইন।"

দোষ করলাম না অথচ ফাইন কেন দিতে হচ্ছে বুঝলাম না। তবু মদনকে কিছু বলতে সাহস হল না। বললেই ডবল ফাইন। তা ছাড়া আমার মাথায় তখন চমচম, দরবেশ, সন্দেশ,



যত অন্ধকার তত ভূত

রাজভোগের মতো পরীক্ষার লোভনীয় নম্বরগুলো ঘোরাফেরা করছে। বললাম, "তুই এখানে অপেক্ষা কর, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

॥ ২ ॥

শনিবার বাড়িতে বন্ধুর বাড়ি অঙ্ক কষতে যাচ্ছি, ফিরতে সন্ধে হবে, বলে মদনের সঙ্গে সোজা চলে গেলাম ডাকাতকালীর জঙ্গলে। মেঘলা বিকেল। এমনিতে দিনের আলো কম, তার উপর জঙ্গলের গাছগাছালির ভিড়ে ঠাসা অন্ধকার। যে উৎসাহ আর সাহস নিয়ে এসেছিলাম, তার সামান্য তখন অবশিষ্ট আছে। তবু এত দূর এসে তো পিছিয়ে আসা যায় না! মদনের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে এগোতে থাকলাম। একমাত্র ভরসা, এই মদনের বিখ্যাত চেহারা দেখে ভূতপ্রেতরা ওকে কিম্ভূত মনে করে না-ও ঘাঁটাতে পারে, আর ঘোগ মনে করে বাঘ ভাগলবা হতে পারে।

ভূতের বাচ্চা ধরবে বলে মদন একটা স্ট্রিংবিহীন ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটে ছেঁড়া মশারি দিয়ে জাল বানিয়েছে। ওই জালেই ধরা পড়বে ভূতের বাচ্চা। বাচ্চা ভূতের জন্য জালটাও নাকি ছোট। সঙ্গে এনেছে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ভূতের বাচ্চা ধরে ওই ব্যাগে ভরে নিয়ে যাবে। একটা ধামাও এনেছে। দরকার পড়লে ভূতের বাচ্চাকে ধামা চাপা দেবে।

মদনের গা ঘেঁষে-ঘেঁষে খুব সন্তর্পণে জঙ্গলের মধ্যে এগোতে-এগোতে বললাম, "ভাল করে কিছু দেখা যাচ্ছে না রে মদন। একটা টর্চ আনলে ভাল হত!"

"টর্চ!" মদন নাক টেনে বলল, "একটা আস্ত বুদ্ধু আছিস রে তুই! টর্চের আলো জ্বালি আর ভূতেরা হাওয়া হয়ে যাক আরকি। কথায় বলে, যত অন্ধকার তত ভূত!"

এমনতরো কথা আগে কখনও শুনিনি। তবু কিছু বললাম না। জঙ্গলের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে গেছি, মদন বিগড়ে গেলে বিপদ। নিঃশব্দে এগোতে থাকলাম। জানি না কপালে কী আছে! আর-একটু এগিয়ে যেতেই একটু দূরে একটা ঝোপের পাশে কালোমতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মদনের একটা হাত আঁকড়ে ধরে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললাম, "ওটা কী রে মদন? ওই যে দাঁড়িয়ে আছে? কী ওটা?"

মদন দাঁড়িয়ে পড়ে ভাল করে নজর করল জিনিসটাকে। তারপর একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেদিকে ছুড়ে বলল, "শেয়াল। ভুঁড়ো শেয়াল।"

জন্তুটা পালাল। কিন্তু পালানোর আগে আমার দিকে তাকিয়ে খামোকা একটা বিচ্ছিরি রকমের ভেংচি কাটল। অন্য সময় হলে একটা শেয়ালের এহেন আচরণে খুব অপমানিত বোধ করতাম। রেগেমেগে কিছু একটা করে বসতাম। কিন্তু একেই অন্ধকার, তার উপর জঙ্গলটা আবার ওদেরই রাজত্ব, অপমান হজমই করে নিতে হল।

প্রাণ হাতে করে ঝোপজঙ্গল বাঁচিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। সময় যত যাচ্ছে, অন্ধকার ততই গাঢ় হচ্ছে। এর পরে কিছুই হয়তো দেখা যাবে না। বাড়ি ফিরতে মুশকিলে পড়ে যাব। বেশি দেরি হলে খোঁজখবর শুরু হয়ে যাবে। মদনের সঙ্গে জঙ্গলে আসার মজা টের পাইয়ে দেবেন বাবা।

কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, তখনই মদন ঠোঁটে আঙুল রেখে সাবধানি গলায় বলল, "স-স-স। কিছু টের পাচ্ছিস? কোনও গন্ধটন্ধ পাচ্ছিস?"

বাতাসে গন্ধ শুঁকেও কিছু পেলাম না। বললাম, "কই না তো!"

মদন বলল, "পাবি না। ভূতভাগ্য না থাকলে পাওয়া যায় না। আমি পাচ্ছি, ভূতের গন্ধ! একটু টকটক, একটু বোটকা-বোটকা। তার মানে আমরা ভূতের এরিয়ায় ঢুকে গেছি। জয় বাবা ভূতনাথ!"

ব্যাপারস্যাপার দেখে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড়। বিস্ফারিত চোখে মদনের দিকে তাকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি নিশ্চিত, তখন আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

আর ঘটনাটা ঘটল তার পরেই। কিছু একটা দেখে মদন 'ওই তো, ওই তো' বলে সোজা সামনের ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। ঢুকে কী করল কে জানে! একটা হুটোপাটি শব্দ পেলাম শুধু। একটু পরেই মদন ঝোপ থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এসে সোৎসাহে বলল, "ধরেছি, ধরেছি। চল, চল পালাই। দৌড়ো, দৌড়ো।"

আমি দেখলাম মদনের হাতের ব্যাগের মধ্যে কিছু নড়াচড়া করছে। নিশ্চয়ই ভূতের বাচ্চা ধরেছে মদন। কিন্তু তখন আর দাঁড়াবার উপায় নেই। কে জানে কোন দিক থেকে বিপদ আসে! ভূতের জ্যান্ত বাচ্চা বলে কথা! দু'জনে কোনও দিকে না তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে-দৌড়তে কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাকাতকালীর জঙ্গল, পাগলডাঙার মাঠ পার হয়ে গেলাম।

॥ ৩ ॥

সারারাত উত্তেজনায় ঘুমোতে পারলাম না। পরের দিন সকাল হতেই দৌড়লাম মদনের বাড়ি। স্বচক্ষে ভূতের বাচ্চা দেখব! দিনেরবেলা, চারদিকে লোকজন, জ্বলজ্বল করছে সূর্য। ভয়ডরের বালাই নেই তখন। কিন্তু মদনের বাড়ি এসে যা শুনলাম, তাতে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। জখম মদনকে নিয়ে ওর বাবা সকালেই চলে গেছেন হাসপাতালে। মদনের মা যা বললেন তা এই, "গতকাল মদন কোথা থেকে একটা হনুমানের বাচ্চা ধরে এনেছিল। কোথা থেকে কীভাবে যেন বাচ্চাটার মা, একটা পেল্লাই সাইজের হনুমান রাতে বাড়িতে ঢুকে রীতিমতো হামলা চালিয়ে মদনকে বিরাশি সিক্কা চড় কষিয়ে চোখে-মুখে আঁচড় দিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে গেছে।"

শুনে, সেখানেই আমি ধপাস করে বসে পড়লাম। তার মানে, এখন বাড়ি গিয়ে সতেরোকে সাতচল্লিশ করার জন্য ঘণ্টার পর-ঘণ্টা ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা মুখস্থ করতে হবে। সামনেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা!

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল



কপালের কাটা দাগটা

ইন্দ্রাণী লস্কর

না আমি, না আমাদের বাড়ির লোক— আমরা কেউ কখনও ভূত দেখিনি। অথচ বাড়িতে কখনও যদি ভূত-প্রসঙ্গ ওঠে, আমরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সবাই কেমন আনমনা হয়ে যাই। তখন আমরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলি না যদিও, আমরা প্রত্যেকেই জানি, আমরা কী ভাবছি।

ঊর্মিলাদি ছিল আমাদের মামার বাড়ির কাজের লোক। কিন্তু একথা আমরা জেনেছি যথেষ্ট বড় হওয়ার পর। আমার মা-মাসিমাদের চেয়ে বয়সে বেশ খানিকটা বড় ছিল। এমনকী আমাদের বড়মামার চেয়েও। মায়ের মা'কে 'পিসি' বলে ডাকত। সেই সুবাদেই মায়েদের দিদি। আমরা সব ছোটরাও তাকে 'ঊর্মিলাদি' বলে ডাকতাম। কষ্টিপাথরের মতো কালো, গোলগাল চেহারা। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা ঊর্মিলাদি, গরমের ছুটিতে আমরা সবাই যখন মামারবাড়ি যেতাম, আমাদের সব ক'টাকে কাছে বসিয়ে বাগানের আম ছেঁচে খাওয়াত। বড় হয়ে কত জায়গায় কতবার আম-ছেঁচো খেয়েছি, কিন্তু ওইরকম টক-ঝাল-মিষ্টি স্বাদের আম-ছেঁচো আর কখনও খাইনি।

ঊর্মিলাদি এসেছিল আমাদের দিদুর বাপের বাড়ির দেশ থেকে। কোনও এক বছর গাঁয়ে নাকি মড়ক হয়েছিল। সেই মড়কে স্বামী আর মেয়েকে হারিয়ে তিন বছরের একটা পুঁয়েপাওয়া বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দিদুর কাছে এসে পড়েছিল।

দিদু তাকে শুধু থাকতেই দেননি, তাকে বাড়ির একজন করে নিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় দেখেছি, মামার বাড়ির আর সব কাজের লোকের উপর ঊর্মিলাদির কী চোটপাট। মা-মাসি-মামাদেরও ছেড়ে কথা বলত না। শুধু বড়মামাকে দেখেছি ঊর্মিলাদিকে ধমকে কথা বলতে।

ঊর্মিলাদির ছেলে আমাদের চেয়ে একটু বড়ই ছিল। আমার বড়মামার ছেলে জ্যোতিদার বয়সি। এ বাড়িতে আসার পরই জ্যোতিদার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল তার। ওইটুকু রোগাভোগা, প্যাকাটির মতো শরীরটায় যেখানে পেরেছে ঊর্মিলাদি তাগা, তাবিজ, রাতচরা পাখির হাড় পরিয়ে রেখেছিল। কোনওটা নাকি নজর লাগার মাদুলি, কোনওটা আবার মন্দ বাতাসের তাবিজ। গলা থেকে কালো করে বাঁধা একটা বড় রুপোর চাকতি লকলক করে ঝুলত। তাতে 'রামনাম' লেখা ছিল।

অন্য কাজের মেয়েরা দিদুকে আড়ালে একচোখো বলত। বাপের বাড়ির লোক বলে নাকি ঊর্মিলাদিকে স্পেশ্যাল খাতির! দিদুর কানে কথাটা উঠতে তিনি হেসেছিলেন, "নিশ্চয়ই আমি ঊর্মিলাকে স্পেশ্যাল খাতির করি, তবে তা আমার বাপের বাড়ির লোক বলে নয়, ওর স্বভাবচরিত্রের জন্য। বাকিগুলো তো সব ছিঁচকে চোর। যা হাতের কাছে পাবে, নেওয়ার জন্য ছোঁকছোঁক। আর ঊর্মিলা? এই যে এত ফুলফুলুরি, ফেলাছড়ানো খাবারদাবার, কেউ বলতে পারবে নিজের ছেলেকে কখনও লুকিয়ে কিছু খাইয়েছে?"

ঊর্মিলাদি ছেলেকে ডাকত 'পচা' বলে। নাম শুনে আমরা হাসাহাসি করতাম, "পচা আবার কারও নাম হয় নাকি? লোকে শুনে হাসে!"

আমাদের কথা শুনে ঊর্মিলাদি আমাদের কষে ধমক দিত, "হাসুক। শত্তুরে য্যাত হাসবে, আমার পচার পেরমাই বাড়বে।"

দিদুর কাছে শুনেছিলাম, কোনও ছেলের নাম পচা হলে যম নাকি ফিরেও দ্যাখে না।

আমাদের যখন ছ'-সাত বছর বয়স, পচার তখন কত হবে? নয়-দশ। কিন্তু দেখতে লাগত পাঁচ বছরের ছেলের মতো। কাঠি-কাঠি হাত-পা, তায় আবার সর্বাঙ্গে তাগা-তাবিজ। কিন্তু দেখতে বাচ্চা হলে কী হবে, দুষ্টুমিতে ছিল আমাদের গুরুঠাকুর। ওই বয়সেই তরতর করে তালগাছ বেয়ে মাথায় চড়ে কাঁচা তালের কাঁদি কেটে মাটিতে ফেলত। গাছ থেকে নেমে নিজের হাতে তাল কেটে আমাদের যে কত কচি শাঁস খাইয়েছে! দিদু ওকে গাঁয়ের ইউ পি ইশকুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বড়মামার ছেলে জ্যোতিদার সঙ্গে ন্যাকড়ার বইদপ্তর বগলে নিয়ে ইশকুলে যেত। তাতে কী রাগ বড়মামার! দিদুর মুখের উপর কিছু বলতে পারবেন না, বোনেদের কাছে গজরাত, "মায়ের কী আক্কেল দ্যাখ সদু, কাজের লোকের ছেলের জন্যে কাঁড়ি-কাঁড়ি পয়সা খরচা? তা ছাড়া এই যে জ্যোতির সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে, এসব কী কারবার? মান যায় না আমাদের?"

ছেলে ইশকুলে যাচ্ছে দেখে ভারী খুশি ঊর্মিলাদি, "গরিবের ছেলে, উ কি আর জজ ম্যাজেস্টার হবে? পিসির দয়ায় যদি পেটে দু' কলম বিদ্যে ঢোকে, বেধবার বাপমরা ছেলে দুটো খুদ-কুঁড়ো খুঁটে খেতে পারবে।" পচা কিন্তু ইউ পি ইশকুলের গণ্ডি পার হতে পারেনি।

পারবেই বা কী করে? নামমাত্র ইশকুলে যাওয়া। তাও মা আর দিদুর ভয়ে। পড়াশোনার সময় কোথায় ছিল তার? সারাদিন গুলতি হাতে মাঠেঘাটে ঘুরছে কিংবা বনজঙ্গল ঢুঁড়ে কোনওদিন ধামা-ধামা ঘি-করলা, কোনওদিন খামআলু তুলে আনছে। তা ছাড়া জ্যোতিদার জন্যে ডান্ডাগুলি বানানো, তির-ধনুক তৈরি করা। পাখমারা বলে এক ধরনের বেদে তখন গাঁয়েগঞ্জে খুব দেখা যেত। তাদের কাজই ছিল পাখিধরা। তা সে যে-কোনও পাখিই হোক। তাদের সঙ্গে ভাব করে কত রকম ফাঁদ তৈরি করতে শিখেছিল ওইটুকু বয়সে। প্রায়ই হাঁড়ি-ফাঁদ পেতে ডাহুক কী বনমোরগ ধরে আনত, আঠাকাঠি পেতে ধরত ঘুঘু, পায়রা, তিতির। বড়মামার কড়া মানা ছিল, নিজের ছেলে যেন পচার সঙ্গে না মেশে। রীত-স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে। যদিও আমরা ভাইবোনেরা পচাকে মুখে কোনও খারাপ গালাগাল পর্যন্ত বলতে কখনও শুনিনি। বরং পচা ছিল আমাদের হিরো।

জ্যোতিদাকে কম মার খেতে হয়নি পচার সঙ্গে মেশার জন্য। বড়মামা যেন তক্কেতক্কে থাকতেন, কখন দু'জনকে হাতেনাতে ধরেন। ধরলেই দিদুকে দেখিয়ে জ্যোতিদাকে বেদম ঠ্যাঙাতেন, বলতেন, "মামাবাড়ি পাঠিয়ে দোব তোকে। একটা ছেলে! এরা চায় না ছেলে আমার মানুষ হোক। যার-তার সঙ্গে মিশে-মিশে একটা ডাকাত হবে।"

তখনকার যুগে যেসব ছোটদের কিছু হবে না বলে বড়রা মনে করতেন, তাদের ধরেই নেওয়া হত, তারা ডাকাত হবে। বাড়িতে বা ইশকুলে যতটা সম্ভব দু'জন দু'জনকে এড়িয়ে গেলেও, তখনকার পাড়াগাঁয়ে দু' বন্ধুতে একপ্রাণ হয়ে গল্প করার মতো লুকনো জায়গা ঢের ছিল। বড়মামা ওত পেতে থেকেও ধরতে পারতেন না। আর জ্যোতিদা সব পরীক্ষাতেই ফার্স্ট হত বলে ওকে কিছু বলার বা পচাকে নিয়ে খোঁটা দেওয়ার মুখ থাকত না বড়মামার।

সেবার কার বিয়ে না মুখেভাত মনে নেই, মামাবাড়ি গিয়ে শুনি, পচা ঊর্মিলাদির হাতে খুন হতে-হতে বেঁচে গিয়েছে। কপালজোড়া ব্যান্ডেজ নিয়ে পচা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। ইশকুলের রেজাল্ট বেরোলে দেখা গেল, জ্যোতিদা বরাবরের মতো ফার্স্ট হয়েছে। আর পচা নাকি পরীক্ষাই দেয়নি। পরীক্ষা ক'দিন খেয়েদেয়ে তালপুকুরের আমবনে ঢুকে গেনিবুড়ির ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছটার খোঁদলে সারা দুপুরটা দিব্যি ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। খবরটা জানাজানি হতেই, ঊর্মিলাদি দা দিয়ে কী যেন কাটছিল, হাতের কাছে পচাকে পেয়েই বোঁ করে ছুড়ে মেরেছে। লাগবি তো লাগ ডান দিকের কপালে! কী ভাগ্যি, চোখটা বেঁচে গেছে! জ্যোতিদা বলেছিল, "মরেই যেত পচা, নেহাত ফেলুডাক্তার সেদিন বামুনপাড়ার কলে এসেছিলেন। প্যাটপ্যাট করে পাঁচ-পাঁচটা সেলাই আর এই অ্যাত্ত বড় সিরিঞ্জে ঠুসে-ঠুসে ইঞ্জেকশন। সে কী পাঁঠাকাটা রক্ত রে টুনি, দেখলে ভিরমি



কপালের কাটা দাগটা

যেতিস!”

ঊর্মিলাদি কেঁদেকেটে বাড়ি মাথায় করেছিল। না, পচা মরে যেতে পারে সেই ভয়ে নয়, “পেটের শত্তুর, মর মর! বেধবা মা নোকের ঘরে গতর খাটিয়ে পেটের মাড়ি জোগাড় কচ্চে, মায়ের দুখ্যুটা বুজলনি, এমন আপদ!”

বড়মামা শুনিয়েছিলেন, “খুব হয়েছে! আর-একটু হলেই তো হাতে দড়ি পড়ত! ছেলে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে! বুকে যার ভয়ডর নেই, মিলিয়ে নিও আমার কথা! সে ছেলে ডাকাত হবে। এরকম বদসঙ্গে পড়ে বাড়ির আর সব ক'টাই না বিগড়ে যায়!”

দিদু খুব বকেছিলেন ঊর্মিলাদিকে, “মারিস না বাপু অমন করে! পাঁচটা নয়, দশটা নয়, একটা! তাকে আর হারাসনি। বিদ্যে কি সবার হয়? তার জন্য আগের জন্মের পুন্যি লাগে।”

ঊর্মিলাদি উত্তর দিয়েছিল, “আমি কি সারা জেবনটাই লোকের ঘরে খাটব! আজ তুমি আচ, আমার কুনও অভাব নাই, তুমি য্যাখুন না থাকবে?”

দিদু বলেছিলেন, “সেসব আমি ভেবে রেখেছি। কত্তা যে আমার নামে দশ বিঘে জমি লিখে দিয়ে গেছে, তার থেকে তোকে আমি দু' বিঘে দিয়ে যাব। মায়েপোয়ে খেতে-পরতে পাবি। আর তোরও তো এ সংসারে মাইনে বলে কিছু পাওনা আছে। সব জমিয়ে রাখছি, থোক দিয়ে যাব।”

জ্যোতিদাদা কাছে ছিল। দিদুকে অভয় দিয়েছিল জ্যোতিদাদা, “তুমি কিছু ভেবো না ঠাকুন। ঊর্মিলাদি আর পচাকে আমি দেখব।”

ঊর্মিলাদি নাকি ওইটুকু ছেলের কথা শুনে হেসে-কেঁদে অস্থির।

এমনিতে এককথার মানুষ দিদু তাঁর কথা রাখেননি। রাখতে পারেননি। তখনকার পাড়াগাঁয়ে স্ট্রোক কথাটা তেমন চালু ছিল না, লোকে বলত সন্ন্যাস রোগ। দিদুরও হয়েছিল। মাথায় রক্ত উঠে ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন দিদু। আর জ্ঞান ফেরেনি। নতুনপাড়া থেকে ফেলুডাক্তার এসে বলেছিলেন,“সেরিব্রাল।” যে-কোনও সময় মরে যেতে পারে জেনেও লোকে যে কেন লোককে কথা দেয়!

মাথার ঘা শুকিয়েছিল দিন পনেরোর মধ্যে। কপালের ডান দিকে দাগটা থেকে গিয়েছিল পচার। ঊর্মিলাদি মাঝে-মাঝে বলত পচাকে, “দাগটা থাকলে মানুষ হবি।”

কিন্তু মানুষ হওয়া আর কই হয়ে উঠল পচার? দিদুর কাজকর্ম চুকতেই বড়মামা ঊর্মিলাদিকে সকলের সামনে ডেকে বলেছিলেন, “আমি একলা রোজগেরে মানুষ। এত ছোট-ছোট ভাই। আমি ওসব উটকো লোক পুষতে পারব না। তোমরা এবার নিজেরটা দেখে নাও।”

কিছুদিন হল বড়মামা প্রাইমারি ইশকুলে চাকরি পেয়েছেন। দিদিমার অবর্তমানে তিনিই ফ্যামিলির হেড। মেজোমামা, ছোটমামা তখন কলেজে-ইশকুলে। চাকরি পাওয়ার পর বড়মামা বাহিরগঞ্জ টাউন থেকে ভারিক্কি কালো ফ্রেমের চশমা পরে, এমনিতে গম্ভীর, আরও গম্ভীর সেজেছেন। বরাবরই বড়মামা রাগী মানুষ। তায় ভাইদের চেয়ে বয়সে অনেকখানি বড়। ভাইরা কেউ দাদার মুখের উপর কথা বলতেন না। বড়মামার কথা শুনে ককিয়ে উঠেছিল ঊর্মিলাদি, “আমার যাবার কুন চুলো আচে তোরাই বলে দে। পিসি বলেছিল, আমাকে বাস করার জন্যে ভিটে দেবে।”

জ্যোতিদা ফস করে বলে উঠেছিল, “আর চাষ করার জমি? ঠাকুন, জানো বাবা, ঊর্মিলাদিকে চাষের জমিও দেবেন বলেছিলেন। আমি নিজের কানে শুনেছি।”

বড়মামা ছেলের চুল ধরে গালে দু' থাপ্পড় মেরেছিলেন, “তোর কানে কামড়ে সাক্ষী রেখে মা বলেছিলেন? মা বলেছিলেন ভিটে দেবেন, আর আমি জানলাম না? কী ঊর্মিলাদি, জোতেকে বশ করে সাক্ষী দেওয়াচ্ছ? ভগবান এসে বললেও আমি মানব না, মায়ের ইচ্ছের যদি কিছু কাগজপত্তর থাকে দেখাও, এক্ষুনি ঘাড় কাত করে দিয়ে দিচ্ছি। না থাকে ফোটো।”

মার খেয়েও জ্যোতিদার লজ্জা হয়নি। ফের বলেছিল, “টাকুন বলেছিল ঠাকুনের কাছে ঊর্মিলাদির মাইনের টাকা জমা আছে। থোক দেবে।”

বড়মামা আর গায়ে হাত তোলেননি, হো হো করে হেসেছিলেন, “শুনলে তোমরা, জোতে কেমন মিথ্যুক হয়েছে? হবেই যে আগেই বলেছিলাম। কাজের লোকের ছেলের সঙ্গে মিশে-মিশে কী হয়েছে দ্যাখো! আমার মরা মায়ের নামেও মিথ্যে কথা বলতে ছাড়ে না।” বড়মামা এক রকম দুর-দুর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ঊর্মিলাদি আর পচাকে।

কিন্তু মামাদের পাড়ার লোকেরা শুধু ছি-ছি'ই করেনি, এজমালি চাঁদপুকুরের পাড়ে ছিটেবেড়ার ঘর করে ওদের বসতে দিয়েছিল। কেউ খড়, কেউ বাঁশ, কেউ চাল-মুড়ি, যে যেমন পেরেছে দিয়ে সাহায্য করেছে। এমনকী বড়মামি যে তাঁর স্বামীর ভয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই জুজু, জ্যোতিদার হাত দিয়ে লুকিয়ে টাকাপয়সা, চাল, নুন মাঝে-মাঝে পাঠিয়ে দিতেন। জ্যোতিদাই বলত আমাদের। জ্যোতিদা আরও বলত, “আমার বাবা না রাগী! পচাকে দু' চোখে দেখতে পারেন না। আমি পচাকে বলেছি, বড় হই, তোদের আমি ঠিক ভিটে-জমি দিয়ে দোব।”

পচা জগৎ গাঙ্গুলির বাড়িতে গোরু-বাগালি করতে ঢুকেছিল, আর ঊর্মিলাদি লোকের বাড়ি-বাড়ি মুড়ি ভেজে, ঢেঁকিতে চাল ছেঁটে সংসার চালাত।

প্রাইমারি ইশকুলে বৃত্তি পেয়েছিল জ্যোতিদা। নতুন পাড়ার ইশকুলের মাস্টারমশাইরা বাড়িতে এসে বড়মামাকে ধরেছিলেন, ছেলে যেন তাঁদের ইশকুলেই ভর্তি হয়। দিনকাল তখন এরকমই ছিল। পাড়াগাঁয়ের হাই স্কুলে ছাত্র ছিল কম, আর বৃত্তি পাওয়া ছেলেরা বাহিরগঞ্জের বড় ইশকুলে পড়তে যেত। গাঁ থেকে সেও প্রায় দশ ক্রোশ রাস্তার ধাক্কা। বড়মামা যা কৃপণ, হয়তো ঘরের খেয়ে ম্যাট্রিক পাশ হবে তাই নতুন পাড়াতেই ভর্তি করতেন! কিন্তু জ্যোতিদা ধরা পড়ে গেল।

তখন পাড়াগাঁয়ে ফোটো তোলার অত চল হয়নি। রঘুবাটিতে শিবরাত্রির মেলা দেখতে গিয়েছিল ওরা দু'জনে। জ্যোতিদা আর পচা। মেলাতেই ফোটোর দোকানে দু'জনে একসঙ্গে ফোটো তুলিয়েছিল। গাঁয়ের কারওর চোখে পড়ে থাকবে, সে এসে বড়মামাকে লাগিয়ে দেয়। সিদ্ধান্ত নিতে তিলমাত্র আর দেরি করেননি বড়মামা। বাহিরগঞ্জের হস্টেলে রেখে এসেছিলেন ছেলেকে। পরের বছর ইশকুলের মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে কী ফুটেছিল। ধনুষ্টঙ্কারে সকলের চোখের সামনে ধনুকের মতো যন্ত্রণায় বেঁকেচুরে জ্যোতিদা মরে গেল। বড়মামি মেলায় তোলা ফোটোটিকে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। অবশ্যই বড়মামা শুধু জ্যোতিদার ফোটোটাই বাঁধিয়েছিলেন। পচা কেটে বাদ। ফলে জ্যোতিদার একটা হাত ফোটোতে ছিল না। সেটা ছিল পচার কাঁধে। জ্যোতিদা মরার পর ছ' মাসও হয়নি পচা পালিয়েছিল। আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। খোঁজ যখন পাওয়া গেল তখন উর্মিলাদি মরমর। কোত্থেকে একদিন হঠাৎ উদয় হয়েছিল পচা।

দিদু চলে যাওয়ার পর থেকেই মামাবাড়ির সঙ্গে আমাদের সকলের টানটাই কেমন আগলা হয়ে আসছিল দিনদিন। বড়মামা আমাদের খোঁজখবর রাখতেন না। মাও কেমন আর যাওয়ার গা করতেন না। তা ছাড়া বাবার ছিল বদলির চাকরি। রেলের ডাক্তার। আজ পাকুড় তো কাল চলো তল্পিতল্পা বেঁধে কৃষ্ণনগর। আমরাও বড় হয়েছি, কলেজ-ইশকুলে পড়ি। কিন্তু মামাবাড়ির জন্য আমাদের সকলেরই কখনও-কখনও মন খারাপ করত। বিশেষ করে কাঁচা আমের দিনের দুপুরগুলোয়। আমরা ভাইবোনেরা মিলে বাজার থেকে কাঁচা আম এনে কতবার ছেঁচে খেয়েছি। যা যা মশলা দিত উর্মিলাদি, সব মিশিয়ে দেখেছি। জিভে লেগে থাকা উর্মিলাদির হাতের কাঁচা-আম ছেঁচার সেই স্বাদ আমরা আনতে পারিনি। বড়মামার উপর রাগ হত খুব। কী মানুষ রে বাবা! নিজের মায়ের পেটের বোনদেরও দেখতে ইচ্ছে করে না? আমরা না হয় পর। অথচ মায়ের মুখেই শুনেছি, বোনদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন বড়মামা। মানুষরা বড় হলেই কেন যে এমন বদলে যান!

মেজোমামা, ছোটমামা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার পর, ফের আমাদের খোঁজখবর নেওয়া-দেওয়া শুরু হল। দু'জনের একজন মাঝে-মাঝে চলেও আসতেন আমাদের কাছে। মা'কে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেদ করতেন। মা যেতে চাইতেন না, "দেখছিস তো ছেলেমেয়েদের কলেজ আছে, ইশকুল আছে। ভাল ঠাকুরও নেই। আমি চলে গেলে ওদের কে রেঁধেবেড়ে খাওয়ায় বল দিকিনি! তোদের বিয়ের সময় ঠিক যাব। সবাই মিলে যাব।"

কোন মামার হাত দিয়ে মনে নেই, মা একবার উর্মিলাদির জন্য কত যেন টাকা পাঠিয়েছিলেন। উর্মিলাদি সারা গাঁয়ে কথাটা আনন্দে ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়িয়েছিল। ফলে বড়মামা মায়ের উপর খুব চটে গিয়ে মা'কে লিখেছিলেন, "তুই বড়লোক হতে পারিস, কিন্তু বাড়ির পুরনো কাজের লোককে টাকা পাঠিয়ে গ্রামের সকলের সামনে আমাকে ছোট না করলেই তোর চলছিল না?"

মা বলেছিলেন, "কী শয়তান রে বড়দা, ভগবান এত বড় শাস্তি দিলেন, তবু চোখ খুলল না!"

তারপরেই একদিন ছোটমামার চিঠি আসে, "পারলে, দিদি, সবাইকে নিয়ে একবার ঘুরে যাও। উর্মিলাদি আর বাঁচবে না। বেশ কিছুদিন ধরে তোমাদের সকলকে খুব দেখতে চাইছে। বড়দার কাছে উঠতে হবে না, আমি আর মেজদা বড়দার সঙ্গে ভিন্ন হয়ে গেছি। সবচেয়ে ভাল খবর, পচা ফিরে এসেছে।"

বাবা মা'কে আসার জন্য জোর করেছিলেন, "যাও না, মানুষটা তোমাদের সংসারে সারা জীবনটা দিয়ে গেল। দ্যাখো না, শেষের সময়টা যদি কিছু করতে পার।"

মা বলেছিলেন, "তা হলে সবাই যাই চলো। তুমি ডাক্তার। কাছে থাকলে সুবিধেই হবে।"

বাবার চাকরির বড় চাপ। যেতে পারেননি। আমরাই গিয়েছিলাম। মামাবাড়িতে পা দিয়েই আমরা সকলেই দৌড়েছিলাম চাঁদপুকুরের পাড়ে। উর্মিলাদির ছিটেবেড়ার আগড় দেওয়া ঘরে। উর্মিলাদি আমাদের চিনতে পারেনি।

বিছানায় বসে যে ঢ্যাঙাপানা ছেলেটি চামচে করে উর্মিলাদিকে কী যেন খাওয়াচ্ছিল, সে-ই নাকি পচা। আমাদের দেখে হাসল পচা। আমাকে আর বোনকে বলেছিল, "কদ্দিন পরে দ্যাকা লয়? টুনি, বিনু আমাকে চিনতে পারচু?" বড়মামি নাকি পচাকে জড়িয়ে খুব কেঁদেছিলেন। জ্যোতিদা বেঁচে থাকলে এত বড়টিই তো হত এতদিনে!

মা বলেছিলেন, "কী পাষাণ প্রাণ রে তোর, পচা? মায়ের জন্য প্রাণ কাঁদেনি তোর?"

পচা জবাব দেয়নি, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। "সেই যদি এলি, দু' বছর আগে এলেই পারতিস! অন্তত একটা পোস্টকার্ড লিখেও যদি জানাতিস বেঁচে আছিস, উর্মিলাদি এত কষ্ট পেত না। তুই এসেছিস বুঝতে পেরেছে উর্মিলাদি?"

পচা এমনভাবে ঘাড় নাড়ে যার মানে হ্যাঁ-না দুটোই হয়।

দিন পনেরো আগে এই জষ্টিমাসের দুপুরে গাঁয়ে-গাঁয়ে ভিক্ষে করতে গিয়ে নাকে-মুখে রোদের ঝাপটা লেগে অজ্ঞান হয়ে মাঠপুকুরে পড়ে ছিল উর্মিলাদি। আর ভগবানের কী খেলা! সেদিনই পচা বাড়ি ফিরছে। এখন মামাদের গাঁ পর্যন্ত বাস যায়। বাসস্ট্যান্ডে নেমে শর্টকাট হবে বলে মাঠের আল ধরে বাড়ি আসছিল পচা। পথে মাঠপুকুরে বটগাছটার তলায় দ্যাখে, তার মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। পাঁজাকোলা করে বাড়ি এনে ডাক্তার-বদ্যি, এই পনেরোটা দিন কী সেবাটাই না করেছে মায়ের! মাঝে-মাঝে একটুআধটু জ্ঞান ফেরে উর্মিলাদির। ফ্যালফ্যাল করে সকলের মুখের দিকে তাকায়, তারপর আবার অজ্ঞান! বাবা যদি সঙ্গে আসতেন! বুড়ো ফেলুডাক্তারের উপর ভরসা হয় না আমাদের।

মামাদের মুখেই শুনলাম, পচা নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে অন্ধ্র চলে গিয়েছিল। সেখানেই এতদিন চিনির কলে কাজ করেছে। অনেকবার ঠিক করেছে পুজোয় আসবে, কিন্তু প্রত্যেকবারই এক-একটা উটকো ঝামেলা। এবার এসেছে



কপালের কাটা দাগটা

জোর করে, মা'কে নিয়ে যাবে বলে। ছোটমামা বলেন, "এতদিনের মা'কে অবহেলা ছেলেটা পনেরো দিনেই পুষিয়ে দিয়েছে, বুঝলি! এক মিনিটের জন্য মায়ের কাছছাড়া হয়নি। আমরা বলেছিলাম আমাদের বাড়িতে খেতে। রাজি হয়নি। নিজেই নাকি দু'মুঠো ফুটিয়ে নেয়! কী যে খায় কে জানে! বাজারটাজারও তো যায় না দেখি। মায়ের কাছেই সেঁটে আছে। আর মা'কে কী ভালবাসা!"

আমাদের সঙ্গেও খুব একটা কথা বলত না পচা। আমরা ঘরে গেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসত শুধু। আমরা কথা বললে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাদের চুপ করতে বলত। ঊর্মিলাদি জেগে যাবে! বিনুর একটু বেশি-জানা স্বভাব, বলেছিল, "তুমি কী খাও পচাদা?"

পচা হেসে গলা নামিয়ে বলেছিল, "হাওয়া!"

"পরশুদিন স্বপ্ন দেকনু কে যেন আমাকে ঠেলা মেরে বলচে, 'পচা ওট। বাড়ি যা।' "

ঊর্মিলাদি মারা যাচ্ছে।

"যাই, মা'কে ঘুম থেকে জাগাই। কী রকম ভেড়কে যাবে মা বলো দিকিনি।"

মেজোমামা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বাড়িতে এসে খবর দিয়েছিলেন। আমরা সকলেই হুড়মুড় করে পুকুরপাড়ে ছুটে যাই।

ঊর্মিলাদির ঘরের আগল হাট করে খোলা। ভিতরে ঢুকতেই মা'কে পচা বলে, "ও বড়দি, মা ক্যানে কতা বলচে নে বলো না?" পচার গলায় রামনাম লেখা তাবিজটা জামার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। "ও ছোটমামু, মা'কে ঠেলছি, জাগচে নে ক্যানে? ও মা, ওটো না, মা!"



আমরা হেসেছিলাম।

আমাদের পৌঁছবার দু' দিন পরেই ঊর্মিলাদি মারা গিয়েছিল। রাতেই মরেছিল, কী ভোরে, আমরা জানি না। রাতে পচা একলাই থাকত মা'কে নিয়ে। খুব ভোরে সদর দরজায় হাঁকডাক শুনে দরজা খুলে মেজোমামা জিজ্ঞেস করেন, "কে?"

একগাল হাসে আগন্তুক, "ই কী গো মামা, আমাকে চিনতে পারলেনি, আমি পচা গো। অন্ধ থেকে আসছি।"

মেজোমামার বুকটা কেঁপে উঠেছিল, "তুমি...তুই...পচা...।"

ছোটমামা পচার মাথায় হাত রাখেন।

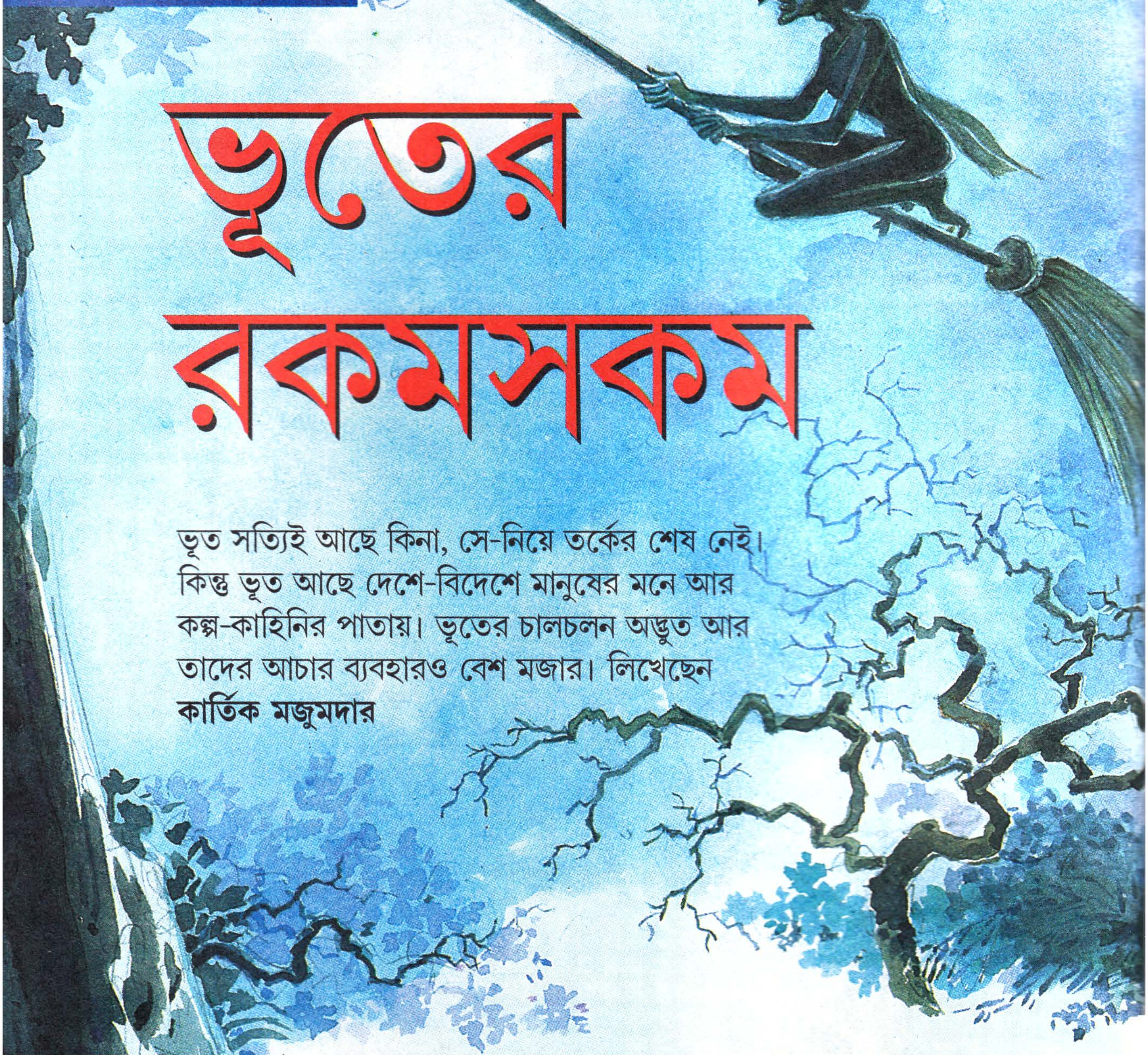
পচা কেঁদে উঠে ঊর্মিলাদির মরা বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিনু ফিসফিস করে বলে, "দ্যাখ দিদি, সেই কাটা দাগটা! যে পচা ক'দিন ধরে সেবা করছিল তার কপালে তো দাগটা ছিল না!"

মেজোমামা বলেন, "তাবিজটা? তাবিজটাও ছিল না তো!"

এর পরই বড়মামা পাগল হয়ে যান। ভূত শুনলে আজও আমরা কেমন আনমনা হয়ে যাই!

ছবি: অনুপ রায়



ভূতের রকমসকম

ভূত সত্যিই আছে কিনা, সে-নিয়ে তর্কের শেষ নেই। কিন্তু ভূত আছে দেশে-বিদেশে মানুষের মনে আর কল্প-কাহিনির পাতায়। ভূতের চালচলন অদ্ভুত আর তাদের আচার ব্যবহারও বেশ মজার। লিখেছেন
কার্তিক মজুমদার

মানুষ যতদিন থাকবে ভূতও থাকবে ততদিন । আজকের দিনের টিভি, পাতাল রেল, সেল ফোন যখন মিউজিয়ামের জিনিস হয়ে যাবে, তখনও কিন্তু ভূত থাকবে। আসলে ভূত যে আছে আমাদের মনের মধ্যে! আমরাই ভূতকে সৃষ্টি করেছি মনের ইচ্ছে থেকে।

মানুষ মরে যাওয়ার পর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এই কঠিন সত্য মানুষের মন কিছুতেই মেনে নিতে চায় না। তাই আমরা একটা বিশ্বাস তৈরি করি, মানুষ মৃত্যুর পরে সূক্ষ্মদেহে বেঁচে থাকে আর মাঝে-মাঝে দেখাও দিয়ে যায়। আমাদের বিশ্বাস, যারা দুষ্টচরিত্র, ঘোরতর পাপী, তারাই নাকি মরবার পর ভূত হয়ে দাপাদাপি করে। অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে কেউ অকালে মারা গেলে সে ভূত হয় বলে অনেকে মনে করে। অন্যদিকে খুন, গাড়িচাপা, আত্মহত্যা ইত্যাদি অপঘাতে মরলে মানুষ নাকি অবশ্যই ভূত হয়, এমনও অনেকের বিশ্বাস। ভূত আর প্রেত একই। অনেকের ধারণা, ভূত আমাদের ক্ষতি করে আর প্রেত আমাদের উপকার করে।

মানুষ আর ভূতের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে। মানুষ গৃহী, অন্নপায়ী, আর ভূত নিরালম্ব, বায়ুভুক। মানুষের ছায়া পড়লেও ভূতের ছায়া পড়ে না। মানুষের অদৃশ্য হওয়া অসম্ভব, ভূতের কাছে অদৃশ্য হওয়া জলভাত। ভূত নিশাচর, কদাচিৎ তাকে দিনেরবেলা দেখা যায়। মানুষ দরজা খুলে এ-ঘর থেকে অন্য ঘরে যায়। ভূতকে সে পরিশ্রম করতে হয় না। দেওয়ালের মধ্য দিয়ে সে অনায়াসে অন্য ঘরে পৌঁছে যায়। ভূত লোহা, আগুন, আয়না, আলো, হলুদ পোড়ার গন্ধ সহ্য করতে পারে না, ভয় পেয়ে যায়। বিদেশি ভূত লোহার ক্রস, রসুনের গন্ধ, মন্ত্র ও পবিত্র জল সহ্য করতে পারে না, তারা ভয়ে পালায়।তার মানে ভূত শুধু ভয় দেখায়



না, ভয়ও পায়। ভূত জঙ্গলে থাকতে পছন্দ করে বেশি।

বিদেশের এক বিদুষী মহিলা একবার বলেছিলেন, "ভূত আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু ভূতের ভয় আমার আছে।"

অন্য একজন বলেছিলেন, "ভূত আমিও বিশ্বাস করি না, কিন্তু সেটা আমার ভুলও হতে পারে।"

অনেক লোক যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে যে, ভূত বলে কিছু নেই। আবার ভূত যে আছে, এ অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে অনেক লোকের মধ্যে।

পরশুরামের গল্পের মহাত্মা মহেশ মিত্তির বলেছিলেন, "প্রত্যক্ষ প্রমাণে কিছুই নেই, কেবল আছে অমুক ব্যক্তি কী বলেছেন আর কী দেখেছেন। ভূত যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে দ্যাখা না বাপু।"

আবার সেই মহেশ মিত্তিরই বিগত হওয়ার পর শ্মশানযাত্রায় নিজের খাটিয়ার পর উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "আছে, আছে, সব আছে।"

সব সময় যে মানুষ মনের ভুলে বা চোখের ভুলে ভূত দ্যাখে, তা নয়। আবার ভূত যে আছে তারও কোনও উপযুক্ত প্রমাণ কোনও বিজ্ঞানী দিতে পারেননি আজ পর্যন্ত। কেউ-কেউ ভূত দ্যাখে, কেউ-কেউ দেখতে পায় না কেন? এ রহস্যের কিনারা হয়নি।

নানা কারণে ভূতের চেয়ে ভুল দেখাটাই আমাদের বেশি হয়। অধিকাংশ ভূতই আমরা নিজের মন থেকে গড়ে তুলে তাকে দেখে ভয় পাই। তুচ্ছ একটা কলাগাছের পাতা জ্যোৎস্না রাতে হাওয়ায় হেলেদুলে হৃৎকম্প তুলে দিতে পারে। আমারই ছায়া রাস্তায় আমার পিছু-পিছু ধাওয়া করে মাঝরাতে আমাকে ভয় দেখাতে পারে। তবে কিছু লোক আছে যারা শান্ত মনে সাদা চোখে ভূতকে দেখতে পায় বা তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে।

ভূত কি সত্যি আছে, সেই নিয়ে

তর্কের শেষ নেই। তবে ভূত নিয়ে যেমন আমাদের দেশে আছে অনেক কল্প-কাহিনি, তেমনই বিদেশেও ছড়িয়ে আছে বিস্তর ভূত-কথা। এক-এক রকম ভূতের আচার-ব্যবহারও নাকি হয় আবার এক-এক রকম।

পুরুষ-ভূত

ব্রহ্মদৈত্য: পুরুষ-ভূতের মধ্যে এই ভূত সবচেয়ে সম্মানিত। কোনও অবিবাহিত ব্রাহ্মণ যদি অপঘাতে মারা যায়, তবে মৃত্যুর পর সে ব্রহ্মদৈত্য হয়। ব্রহ্মদৈত্য খুব শুদ্ধাচারী ভূত। অন্য ভূতের মতো যা-তা খেয়ে বেড়ায় না। শুদ্ধ জিনিস ছাড়া অন্য কিছু মুখে তোলেই না। খুব অন্যায় না করলে সাধারণত কারও ঘাড়েও চড়ে না। অন্য ভূতের মতো এরা মানুষকে ভয়ও দেখায় না। এই ভূত সাদা কাপড় পরে, বুকে ধবধবে সাদা পৈতে। পায়ে থাকে কাঠের খড়ম। কোনও পোড়ো বাড়ি বা ঠাকুরঘরের ছাদে যখন তারা রাত্রে পায়চারি করে, বন্ধ ঘর থেকে কোষাকুষির শব্দ ভেসে আসে। যাঁরা ব্রহ্মদৈত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাঁদের মতে, ধোঁয়ার মতো ব্রহ্মদৈত্যের ধড় আর কুয়াশার মতো তার জটা। অবশ্য এঁরা কেউ নিজের চোখে ব্রহ্মদৈত্যকে দেখেনি। মাঝে-মাঝে ব্রহ্মদৈত্যকে নাকি রাতে দেখা যায়। এক বাড়ির ছাদে একটা পা, আর-একটা বাড়ির ছাদে আর-এক পা রেখে বিশাল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।



ব্রহ্মদৈত্য থাকে নাকি বেল গাছে বা অশ্বত্থ গাছে অথবা বকুল গাছে। স্বভাবে এরা শান্ত ও পরোপকারী। কিন্তু এরা যে গাছে থাকে, সেই গাছের তলা কেউ অপবিত্র করলে এই ভূত ভীষণ রেগে যায় এবং অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেয়। এমনকী ঘাড় মটকাতেও কসুর করে না। গ্রামে অনেক মানুষ এখনও পারতপক্ষে অশ্বত্থ বা বেল গাছে উঠতে চায় না।

ব্রহ্মদৈত্য হরিনাম শুনতে পারে না। কাউকে যদি ব্রহ্মদৈত্য ধরে, তখন হরিনাম করলে সে সঙ্গে-সঙ্গে চলে যায়।

যখ: সংস্কৃত শব্দ যক্ষের একটি অর্থ হল ধনাধিপতি। বঙ্গদেশে যক্ষ জন্মায় না! যখ করা হয়। যখের কাজ হল ধনরত্ন রক্ষা করা। কিংবদন্তি, আমাদের দেশের যেসব কৃপণ ধনী ধন রক্ষা করতে চাইতেন, তাঁরা এক বিশেষ উপায় গ্রহণ করতেন। প্রথমে কয়েকটা তামার কলসিতে সোনার মোহর ভরা হত। তারপর একটি ব্রাহ্মণের ছোট ছেলেকে ভুলিয়েভালিয়ে নানারকম লোভ দেখিয়ে সকলের অজ্ঞাতে নিয়ে আসা হত। তখন তাকে পরানো হত লাল রঙের চেলি, গলায় ফুলের মালা, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা দিয়ে দু'-হাতে সোনার বালা পরিয়ে খুব আদর করে ওই তামার কলসি সমেত একটা গোপন ঘরে নিয়ে আসা হত। তাকে বলা হত, এইসব টাকাপয়সা সোনার মোহর সব তোমার। শুধু আমার বংশের কেউ এসে চাইলে তাকে দেবে, আর কাউকে নয়। যাকে বলা সে বেচারি দিশেহারা হয়ে প্রথমে কিছু বুঝতে পারত না, তারপর বন্ধ দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে, কান্নাকাটি করে খেতে না পেয়ে এক সময়ে মরে যেত। মৃত্যুর পর যখ হয়ে ওই সঞ্চিত ধন রক্ষা করত। রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পটি এই যখের কাহিনি।

যখেরা থাকে পুরনো বাড়ির ভাঙা সুড়ঙ্গ অথবা পুরনো ইঁদারা কিংবা পুরনো দিঘির জলে।

'যখের ধন' বলে যে কথাটি চালু আছে, সেই ধনের সন্ধান পেলেও কেউ তাতে হাত দিতে সাহস পায় না। যখের ঘরে গিয়ে ধনরত্ন লাভের আশায় একজন মেঝের পাথরে একটি মাত্র শাবলের ঘা দিলেই গোঁ-গোঁ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে যায়। তিন দিন তার কাঁপুনি থাকে, সাত দিন তার মুখে রা থাকে না।

এ ছাড়া আরও অনেক বিপদ আছে। ঘড়ার মোহরগুলো সাপ হয়ে নাকি থাকে, আর তাতে হাত দিলেই মৃত্যু।

কন্দকাটা: 'কবন্ধ' শব্দ থেকেই বাংলায় কন্দকাটা কথাটি এসেছে। কবন্ধ বা কন্দকাটার মাথা নেই। শুধু ধড়। যেসব লোকের মাথা কেটে ফেলা হয়, তারাই নাকি এই ভূত হয়। মুন্ডু নেই বলে এরা লম্বা দু'টো হাত সোজা করে হাতড়াতে-হাতড়াতে চলে। অনেক সময় মাটিতে গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে। তবে দু'টো লম্বা হাত বাড়ানো থাকে। দু'টো হাতের মধ্যে কেউ এসে পড়লে তার ওইখানেই শেষ। সব ভূতের মধ্যে কন্দকাটা সবচেয়ে ভয়ংকর দেখতে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনায় আছে, "সেই

আলো-আঁধারে পুরনো শিবমন্দিরটার দরজার সামনে দিয়ে একটা কন্দকাটা দুই হাত মেলে শিকার খুঁজে-খুঁজে চলেছে। সব ভূতের মধ্যে ভীষণ ছিল এই কন্দকাটা, যার পেটটা থেকে-থেকে অন্ধকারে হাঁ করে আর ঢোক গেলে, যার চোখ নেই অথচ মস্ত কাঁকড়ার দাড়ার মতো হাত দু'টো যা পরিষ্কার দেখতে পায় শিকার।" কন্দকাটা যেমন বজ্জাত তেমনই নিষ্ঠুর।

গ্রামের জলাভূমিতে, ঝোপেঝাড়ে বা গর্তে এরা থাকে। কোনও-কোনও অঞ্চলে কন্দকাটা 'গলাকাটা মঙ্গলা' নামেও পরিচিত। মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলে কন্দকাটাকে বলে 'আট'। এরা কোথাও-কোথাও পুকুরে থাকে। সেই পুকুরে মাছ ধরতে গেলে পিঠেপুলি দিয়ে এদের পুজো করে তবে জলে নামতে হয়। ভক্তির ঠেলায় আট তখন লোকের মুখে-মুখে হয়ে যায় 'আটেশ্বর'। আট মানে হল উঁচু জমি বা দেবতার স্থান। আট যাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়, মাঝরাতে গিয়ে তাদের নাম ধরে ডাকে। ওই ডাককে বলে 'কোয়াট'। কোয়াট শুনে কেউ সাড়া দিলে দু'-একদিনের মধ্যে দুরারোগ্য অসুখে সে নাকি মারা যায়।

জটাধারী: গ্রামে যেসব পুরনো পুকুর থাকে, সেরকম পুকুরের গভীর জলের তলায় জটাধারীর বাস। এই ভূত এক অপদেবতা। তাই একে ভূতের দলেই ফেলা হয়। পুকুরে স্নান করার সময় বা সাঁতার কাটার সময় যদি কোনও ছেলেছোকরা কোনও কারণে বিরক্ত করে, তবে সে এর জটায় পা জড়িয়ে ডুবে মরে। যদিও এরা মারাত্মক ভূত, তবু মন-মেজাজ ভাল থাকলে পরোপকারও করে। পুজোর বাসন-কোসন এরই কৃপায় জলের উপরে ভেসে ওঠে। পুজো হয়ে গেলে তা সময়মতো ফেরত না দিলে কিন্তু বিপত্তি। আগেকার দিনে পুকুর প্রতিষ্ঠা করার সময় 'জাট' অর্থাৎ যষ্টি বা কাঠের খুঁটি পোঁতা হত। হয়তো ওই জাট থেকেই জটাধারী নামটি এসেছে। অথবা পুকুরের শ্যাওলা বা জলজ লতায় পা জড়িয়ে যায় আর তাকে জটা বলে কল্পনা করে জটাধারী নামের সৃষ্টি হয়েছে।

একানড়ে: একানড়েকে আজকের দিনে প্রতিবন্ধী ভূত বলা যেতে পারে। এদের একটি মাত্র পা, তাই এরা একঠেঙো ভূত। মাটিতে যখন এরা ঘোরাফেরা করে না, তখন কোনও তালগাছে বসে বিশ্রাম করে। একানড়ে কথার অর্থ হল একটি নড়ি বা লাঠি যার হাতে থাকে। এই একঠেঙো ভূত যখন তালগাছ থেকে হঠাৎ নেমে একটা লাঠিতে ভর করে ল্যাগব্যাগ করে চলে, তখন তা ভয়ের জিনিসই হয়ে দাঁড়ায়।

বানাওয়ালা ভূত বা ভুলো: এটিও একটি বেশ অপকারী ভূত। এদের কাজ হল মানুষের দিক ভুলিয়ে দেওয়া। যে রাস্তা কোনও মানুষের খুবই পরিচিত, সে রাস্তায় তার রোজ আসা-যাওয়া, হঠাৎ একদিন সেই রাস্তায়সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। ঝড়-বৃষ্টি-কুয়াশা নয়, পরিষ্কার রাস্তা জ্যোৎস্নায় ছয়লাপ, তবু সে যেখানে যাবে সেখানে যেতে পারছে না। ঘুরেফিরে একই জায়গায় ফিরে আসছে। পাঁচ মিনিটের পথ পার হতে ভুলোর পাল্লায় পড়ে দেড় ঘণ্টার বেশি সময় লাগছে। আতঙ্কে ঘেমে নেয়ে উঠেছে তখন। এই ভুলো ভূত মানুষকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে কোনও জলা জায়গায় বা বনে-জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। ভুলো ভূতের পাল্লায় পড়লে মানুষ আতঙ্কে পাগলের মতো হয়ে যায়।

পেঁচো: এই ভূত ছোটখাটো এক অপদেবতা। হাঁ করা ও দাঁত বের করা পেঁচোর নাম 'চোয়ালে পেঁচো'। পেঁচোর নজর থাকে নাকি বাচ্চাদের উপর। তবে ছ'বছরের বেশি বয়সের ছেলেমেয়েদের আর পেঁচোয় পায় না। কোনও বাচ্চাকে পেঁচোয় পেলে সে পড়ে গিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। পাগলের মতো নিজের চুল ছেঁড়ে। ভয়ের ঠেলায় অনেকে একে দেবতা বলে ভক্তিও করে।

ক্ষেত্রপাল: এই অপদেবতা বা ভূত থাকে প্রাধানত পানের বরজে। তাই পানের বরজে খুব পবিত্র হয়ে ঢুকতে হয়। নয়তো ক্ষেত্রপালের রোষে পড়তে হয়। এই ভূতের অন্য নাম 'কেলে দানা' বা 'কালিয়া দানা'। সংস্কৃত 'দানব' শব্দ হয়েছে 'দানা' যার অর্থ ভূত।

ঝাঁপড়ি: মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলের এক রকমের ভূতকে বলে ঝাঁপড়ি। টোকা মাথায় দিয়ে মাদার গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে এরা বসে থাকতে ভালবাসে। এদের কাজ হল গাছের নীচ দিয়ে যেসব মানুষ যাবে তাদের মাথায় মলমূত্র ত্যাগ করা।

তাল-বেতাল: এরা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের অনুচর ছিল। বেতাল হল বেঁটে ভূত। বেতাল একটা শব আশ্রয় করে শিরীষ গাছের ডালে মাথা নিচু করে ঝোলে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠে তারপরেই খিল-খিল করে হেসে মহারাজ বিক্রমাদিত্যেকে ভয় দেখিয়েছিল। বেতাল যেমন বেঁটে, তাল হল তেমনই তাল গাছের মতো লম্বা ভূত। মহারাজ অসীম সাহস ও ক্ষমতায় 'তাল-বেতাল-সিদ্ধ' হয়েছিলেন। এই দুটি ভূত শেষ পর্যন্ত বিক্রমাদিত্যের কেনা কাজের লোকের মতো হয়ে গিয়েছিল। হুকুম দিলেই তারা তা তামিল করত।

নাড়াবুনে: গভীর নলবনে অপদেবতা বা ভূত থাকে এ বিশ্বাস আমাদের অনেক দিনের। গ্রামের লোক নাড়াবুনের কথা ভেবে চট করে নলবনে যেতে চায় না।

পোড়ো বা পাঠো: এরা সুন্দরবন অঞ্চলের ভূত, সাংঘাতিক ভয়েরও। সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ বিশ্বাস করে, যেসব মানুষ বাঘ বা কুমিরের পেটে যায়, তারা পোড়ো বা পাঠো ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বোবা: সাধারণত মানুষ চিত হয়ে শুলে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দ্যাখে। অনেক সময় কেউ-কেউ বিকৃত স্বরে গোঙাতে থাকে। সহজে তাকে জাগানোও যায় না। আশপাশের সবাই বুঝতে পারে, তাকে বোবায় ধরেছে। বোবা হল একটি অশরীরী অপকারী ভূত, ঘুমের মধ্যে তারা মানুষের উপর ভর করে।

জিন: আরব্য উপন্যাসের পথ বেয়ে কয়েকটি ওদেশি ভূত এদেশে চলে এসেছে। তার মধ্যে একটি হল এই জিন। আসলে সে ছিল দৈত্যের মতো। এদেশে আমরা তাকে ভূত করে নিয়েছি। জিন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ভূত। এদের নাম উচ্চারণ করলেই মুহূর্তে এসে হাজির হয়। তাই লোকে এদের 'হাওয়া-বাতাস' বলে।

আফ্রিত: এরা আরবি ভূত, এ-দেশে এসে ঠাঁই নিয়েছে।যদি কোনও লোক খুন হয় তা হলে তার আত্মা, যেখানে রক্ত পড়েছে, সেখানে আফ্রিত হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য সে জায়গায় একটা লোহার পেরেক পুঁতলে তাকে ঠেকানো যেতে পারে।

খবিস: খবিস ভূতরা ময়লা আবর্জনার মধ্যে থাকতে ভালবাসে। এদের স্বভাব হিংস্র।

নীলকুঠির ভূত: এরা হল অত্যাচারী নীলকর সাহেবের ভূত। যশোহর ও নদিয়া জেলার নানা জায়গায় এখনও পুরনো ভাঙা নীলকুঠি দেখা

যায়। রাত্রে কুঠিবাড়ির ছাদে মাঝে-মাঝে ওই নীলকর সাহেবদের ভূতের হল্লা নাকি শুনতে পায় গ্রামবাসীরা। কখনও-কখনও তাদের হেঁড়ে গলায় গাওয়া গানও ভেসে আসে মাঝ রাতে।

হল্লাবাজ ভূত: হঠাৎ কারও বাড়িতে উপদ্রব করতে শুরু করে এরা। সেই বাড়ির দরজা-জানলা খুলে যায় নিজে-নিজে, আবার বন্ধও হয়ে যাবে। ঘরের টেবিল উলটে পড়ে যায় হঠাৎ। বাসনপত্র ঝনঝন করে মাটিতে পড়ে



চুরমার হয়ে যায়। কারা যেন ইটপাটকেল ছুড়ে মারতে আরম্ভ করে ঘরের মধ্যে। বাড়ির বাসিন্দাদের চুলের মুঠি ধরে অদৃশ্য কেউ টানতে শুরু করে। একে বলা হয় ভূতের উপদ্রব। বিদেশে এর নাম 'পল্টারগাইস্ট', যার অর্থ 'হল্লাবাজ ভূত'। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, উঠতি বয়সের কোনও ছেলেমেয়েকে কেন্দ্র করেই এরা উপদ্রব করে। এদের সরিয়ে দিলেই উপদ্রব বন্ধ হয়ে যায়।

মেয়ে-ভূত

ভূত নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা বলেন, পুরুষ ভূতের চেয়ে মেয়ে ভূতেরা সংখ্যায় অনেক কম। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক রকম মেয়ে-ভূতের কথা ছড়িয়ে আছে নানা কল্প-কাহিনিতে। পুরুষ ভূতের চেয়ে তাদের রকমসকমও কম মজাদার নয়!

পেতনি: মৃত মহিলার আত্মাকেই পেতনি বলা হয়। সাধারণত এরা সাদা কাপড় পড়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক জীবন্ত স্ত্রীলোকের মতো। পেতনি নানা শ্রেণির হয়। যেমন—

মেছো-পেতনি: পুকুরে বা ডোবায় এরা মাছ ধরে-ধরে খায়। এত মাছ খায় যে, এদের গায়ে আঁশটে গন্ধ লেগে থাকে। হাট থেকে মাছ কিনে সন্ধ্যার পরে যদি কেউ বাড়ি ফেরে তবে এরা তার পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরবে আর নাকিসুরে মাছ চাইবে।

গেছো-পেতনি: এরা শ্যাওড়া গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে মাঝে-মাঝে দোল খায়।। গাছের ডাল যদি অকারণে দুলে ওঠে, তা হলে এটা ওদের জন্যেই। বিহারে এদের বলে 'কিচিন'।

কানিপিশাচী: কানি হল ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো। মাঝরাতে পুকুরঘাটে এদের ওই কাপড় কাচতে দেখা যায়।

দিশা: এই পেতনিরা পথিককে রাতে পথ ভুলিয়ে নিয়ে যায়। পথিকের দিশেহারা অবস্থা থেকেই এই নামটি এসেছে। ওঝারা বলে, এই অবস্থায় পড়লে নাকি উলটো করে কাপড় পরতে হয়। তা হলেই রক্ষা পাওয়া যায়।

নিশা: যে পেতনি রাতে ডাক দিয়ে মানুষকে ঘরের বাইরে এনে বিপদে ফেলে, তার নাম নিশা। এই ডাক নিশির ডাক নামেও পরিচিত। এরা মাঝরাতে বারোটার পর ডাকে কিন্তু তিন বারের বেশি এরা ডাকতে পারে না।

উল্কা: এই পেতনিরা জলার ধারে থাকে, আর মুখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বের করে। এদের 'উল্কামুখী'ও বলা হয়।

পোঁটাচুন্নি: যে পেতনির নাক দিয়ে সর্দি ঝরে, আর মাছের নাড়িভুড়ি খুব প্রিয়, সেই পেতনির নাম 'পোঁটাচুন্নি'।

কুনি: এই পেতনি গৃহস্থর বাড়ির ঘরের কোণে ময়লা, ঝুল, মাকড়সার জালের মধ্যে থাকতে ভালবাসে। কুনির বোনের নাম বুনি।

বুনি: গৃহস্থবাড়ির কাছে বাঁশবন বা আগাছার বনে যেখানে ছেঁড়া কাপড়, ভাঙা কুলো, ভাঙা ধুচুনি পড়ে থাকে, বুনি সেখানে থাকে।

শাঁখচুন্নি: হাতে শাঁখাপরা সধবা স্ত্রীলোকের অকালমৃত্যু হলে সে শাঁখচুন্নি হয়। শিশুরা শুকিয়ে গেলে বা অনবরত কাঁদলে ধরে নেওয়া হয়, তাকে শাঁখচুন্নি পেয়েছে। মাঝ রাতে কেউ যদি গ্রামের মাঠে যায়, আর সেসময় যদি শাঁখচুন্নির নজরে পড়ে, তা হলে সে দিনদুয়েক পরেই মারা যায়।

আলেয়া: আগুনে পুড়ে মারা যায় যে স্ত্রীলোক, সেই হয় আলেয়া-ভূত। গ্রামের মাঠে দূরে কোনও জায়গায় আলেয়ার আলো জ্বলতে দেখা যায়। পথিক পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য সেদিকে ছুটে যায়, তারপর পথ ভুলে আলেয়া-ভূতের খপ্পরে পড়ে। তারপর মেরে ফেলে ওই পথিককে। সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে আলেয়া-ভূতকে সবাই ভয় পায়।

ডাইনি: মা চণ্ডীর সহচরী ডাকিনী, নানা তুকতাক বিদ্যা জানে। পরবর্তীকালে এক জাতের পেতনি হয়ে ডাইনিরূপে দেখা দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা কোনও বৃদ্ধার ছদ্মবেশ ধরে থাকে। শক্ত দাঁত, মাথায় একমাথা শণের মতো চুল, একটু কুঁজো আর শুকনো কাঠির মতো এদের চেহারা।

জুজুবুড়ি: এরা মেয়ে-ভূত। 'বৃদ্ধা পিশাচী' বলা চলে এদের। এদের নাম শুনলেই বাচ্চারা ভীষণ ভয় পায়।

জলকাওরি: পূর্ববঙ্গে জলকাওরি নামে এক জাতের মেয়ে-ভূত আছে। সম্ভবত 'জলকুমারী' শব্দ থেকে কথাটি এসেছে। এরা জলে থাকে।

মানুষ জলে ডুবে নিখোঁজ হয়ে গেলে বলা হয় যে, জলকাওরি তাকে টেনে নিয়েছে।

পরি: এই মেয়ে-ভূতটি আরব্য উপন্যাসের পথ বেয়ে এসেছে। এরা দেখতে দারুণ সুন্দরী। প্রজাপতির মতো এদের দুটো ডানা। শিশুদের সঙ্গে খেলা করতে এরা দারুণ ভালবাসে।

অন্য ভূত

গো-ভূত: শুধু মানুষ কেন, অন্য প্রাণীর ভূতও আমাদের দেশে অনেক আছে। বাড়ির পোষা গোরুর অকালমৃত্যু হলে সে গো-ভূত হয়। এরা কারও অনিষ্ট করে না।

মানুষ বাঘা: মারা যাওয়ার পর কিছু খারাপ লোকের আত্মা বাঘের রূপ ধরে মানুষের উপর হামলা করে। অনেকের মতে, এরা আসলে জিন।

ভুতুড়ে গাছ: বহুকাল আগে গ্রামের শেষ সীমানায় কোনও বটগাছ থাকলে অপরাধীদের সেই গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিতেন ফৌজদার। এক সময় মানুষ ভয় করতে শুরু করল ওই ফাঁসি-গাছকে। সন্ধের পর গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাছের ডাল থেকে বিকট আর্তনাদ শোনা যেত। সেই ভয়ংকর আর্তনাদে অনেকে মূর্ছা যেত।কখনও দেখা যেত একটা মৃত মানুষ গাছ থেকে ধুপ করে মাটিতে পড়ল। গ্রামে রাতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পথের উপর হেলে পড়া কোনও বাঁশ থাকলে তা ডিঙোতে নেই। ডিঙোলেই বাঁশগাছের ভূত ঘাড়ে চাপে।

বিদেশি ভূত

ভ্যাম্পায়ার: যে মৃত মানুষ রাতে সমাধি থেকে জেগে উঠে অন্য লোকের রক্ত নিঃসাড়ে চুষে খায়, তাকেই বলে ভ্যাম্পায়ার। ভ্যাম্পায়ার নামে একরকম বাদুড়ের নামেই এই পিশাচের নামকরণ। সমাধি থেকে জেগে উঠে বাদুড়ের রূপ ধরে ঘুমন্ত মানুষের রক্ত শুষে খায় এই ভয়ংকর পিশাচ। এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় রসুনের মালা ও লোহার ক্রশ ঘরে ঝুলিয়ে রাখা। ভ্যাম্পায়ার নিয়ে ব্রাম স্টোকার লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ড্রাকুলা'।

ওয়ারউলভ্স: ওয়ারউলফ বা মানুষ-নেকড়ের কথা শুনলে ওদেশের লোক আঁতকে ওঠে। দিনেরবেলা এরা সাধারণ মানুষের মতোই থাকে। রাত হলেই রূপান্তরিত হয়ে যায় নেকড়ে বাঘে। নেকড়ের মতোই গর্জন করে আর মাংস খাওয়ার লোভে ঘুরে বেড়ায়। রাত শেষ হয়ে গেলে আবার মানুষের চেহারায় ফিরে আসে।



গবলিন: এ হল এক অনিষ্টকারী ভূত। অত্যন্ত কদাকার চেহারা। তবে, ফরাসি দেশের গবলিন উৎপাত করে কিন্তু কারও ক্ষতি করে না।

জোম্বি: সমাধির মধ্যে থাকা মৃত মানুষ যখন মন্ত্রবলে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তখন তাকে বলে জোম্বি। এরা যন্ত্রের মতো চলাফেরা করে। আফ্রিকার গুনিনরা মন্ত্রের সাহায্যে এইভাবে মৃত মানুষকে জীবন্ত করে তোলে। তারপর তাদের দিয়ে কাজ করায়। জোম্বিরা থপথপ করে হাঁটে। দৃষ্টি থাকে মাটির দিকে। সোজা তাকাতে পারে না।

উইচ: আমাদের দেশের ডাইনিদের মতো বিদেশে আছে উইচ। তাদের চেহারাও আমাদের দেশের ডাইনিদের মতোই হাড় বের করা শুঁটকো। এরা শয়তানের চেলা হয়ে মানুষের সর্বনাশ করে বেড়ায়। ইচ্ছে করলেই ঝড়-বিদ্যুতের সৃষ্টি করে জাহাজ ডোবাতে পারে, শিলাবৃষ্টি করে চাষের ক্ষতি করতে পারে। ঝাঁটার উপর বসে আকাশে উড়ে চলে এই ডাইনিরা। সঙ্গী থাকে বিড়াল, ব্যাঙ বা কুকুর। কুকুর বা বিড়ালের রূপও ধরতে পারে এই ডাইনিরা। রাত্রে, ঝাঁটায় চেপে এরা উড়ে গিয়ে

নির্জন জায়গায় অন্য ডাইনিদের সঙ্গে মিলিত হয়।

ভূতের ওঝা

ভূতের উৎপাত চলতে থাকলে নাকি ডাকতে হয় ভূতের ওঝাকে। আটঘাট বেঁধে খুব সতর্ক হয়ে এদের কাজে নামতে হয়। ওঝা মন্ত্র পড়ে, সর্ষে গায়ে ছিটিয়ে, হিংয়ের ধোঁয়া দিয়ে হলুদপোড়া শুঁকিয়ে, ঝাঁটা দিয়ে মেরে বা মন্ত্রপড়া মাটির সরা দিয়ে পিটিয়ে ভূতকে কাহিল করে ফেলে। তখন ওঝার হুকুমমতো রোগীর উপর ভর করা প্রেত হয় ছেঁড়া জুতো, না হয় তো জলভরা কলসি বা ঝাঁটা মুখে দিয়ে দৌড়ে যায়। কিছুদূর গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে বোঝা যায় ভূত ছেড়ে চলে গেছে।

সাহেবদের ভূতের ওঝাকে বলা হয় এক্সজরশিস্ট। বাইবেলেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। শয়তান বা মৃত মানুষের দুষ্ট আত্মাকে তাড়ানোর জন্য নানারকম আচার-অনুষ্ঠান করা হয়। দরকার হয় পবিত্র জল, তেল, নুন ইত্যাদি জিনিসের। ১৯৭২ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার এক ক্যাথলিক দম্পতির উপর ভূতের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য রেভারেন্ড কার্ল প্যাটজেল্ট প্রায় দু'মাস ধরে ১৪ রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ভূত তাড়িয়েছিলেন।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল



আঁকশির মতো হাত

অমিতাভ পাল

ভজহরিবাবু কিছুদিন হল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার ছিলেন।

তাই দুপুরবেলা ঘুমের অভ্যেস নেই, আবার হাতে কাজও নেই। কী আর করেন? ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বই পড়ছিলেন। 'ভূতের বাপের বিয়ে' বইটা তিনি কিনেছিলেন ট্রেনের এক হকারের কাছ থেকে। ট্রেনের হকারের কাছে এমন-এমন সব বই পাওয়া যায়, যা কিনা কোনও বইয়ের দোকানে পাওয়া যায় না। তাই সুযোগ পেলেই দু'-একখানা কিনে ফেলেন। বইগুলো বেশ সস্তাদরেও পাওয়া যায়। এত সস্তায় বাজারে এক আঁটি পুঁইশাকও পাওয়া যায় না।

বেশ তারিয়ে-তারিয়ে পড়েন ভজহরিবাবু। দু' পাতা পড়েন, একটু সময় চোখ বুজে বসে-বসে ভাবেন, তারপর আবার পড়েন। পড়া এবং চোখ বুজে বসে থাকার ফাঁকে একটু ঝিমুনি মতন এসেছিল, বুঝতেই পারেননি তিনি। ভজহরিবাবুর মাথাজোড়া টাক। সেই টাকে কেউ যেন ঢাকের কাঠি দিয়ে চাটি মারল। চমকে উঠলেন তিনি, "কে মারল?"

কে আবার মারবে? ঘরে তো অন্য কেউ নেই। চারপাশটা ভাল করে দেখলেন। নিজেকে নিজেই বোঝালেন, তবে হয়তো মনের ভুল। ফের তিনি পড়তে শুরু করলেন, ফের চোখ বুজে ভাবতে শুরু করলেন। আবার কোন ফাঁকে তাঁর ঝিমুনি ধরে গেল। আবার চাটি। টাকের উপরে ঢাকের কাঠি! এবারে বেশ জোরে। চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, "কে, কে?"

হাতটা আপনা থেকেই টাকে চলে গেল। না, টাকে তো কিছু নেই। টাক পরিষ্কার। পালিশ করা মেঝের মতো মসৃণ। রেগেমেগে ডাক পাড়লেন তিনি, "ভুতো?"

ডাক শুনেই বুঝতে পারল ভুতো, বাবু বেশ চটেছেন। কাঁপতে-কাঁপতে এসে হাজির হল সে। ভজহরিবাবু বললেন, "আমার টাকে কে চাটি মারল?"

ভয়ে-ভয়ে ভুতো বলল, "আজ্ঞে, আমি তো মারিনি।"

আরও চটে গেলেন তিনি, "আমি কি বলেছি, তুই মেরেছিস? আমি জানতে চাই, কে মেরেছে?"

ভুতো বলল, "ফুটবল পিলিয়ার ঘুমের মধ্যেও ফুটবলে কিক মারে, কিরিকেট পিলিয়ার ব্যাট চালায়। ইয়ে, আপনিও...।"

"আমি কী, শুনি?"

"পোস্টাপিসের পিওন ছিলেন তো!"

"পিওন নয়, পোস্টমাস্টার!"

"সারাজীবন চিঠির উপরে ঝপাঝপ ইস্ট্যাম মারতেন তো!"

"তাই এখন বসে-বসে নিজের টাকে নিজেই চাটি মারছি!"



হাত কচলে ভুতো বলল, "আজ্ঞে, ঠিক তাই!"

ভজহরিবাবু রেগে উঠলেন, "এই তোর বুদ্ধি! তুই তো ভুতো নোস, তুই একটা ভূত!"

ভুতোর আঁতে ঘা লাগল, "কী বললেন বাবু, আমি ভূত?"

ভজহরিবাবু বললেন, "তুই ভূত ছাড়া আর কী? তোর চেহারাটা ভূতের মতো। তোর গায়ের রং ভূতের মতো মিশকালো। নামেও তুই ভুতো।"

ভুতো বলল, "আমার বাপ-মা আমার নাম রেখেছিলেন, ভূতনাথ। তার থেকে করলেন, ভুতো। এখন আবার বলছেন, ভূত।"

"তোর কাণ্ডকারখানাও ভূতের মতো।"

"কীরকম?"

"একদিন সকালে দেখলাম, সব্‌জির খেতে দাঁড়িয়ে তুই কাঁচা শাকসব্‌জি পটাপট তুলছিস আর ভূতের মতো কচকচ করে চিবিয়ে খাচ্ছিস।"

"মুলো, গাজর, বিট, শালগম তো অনেকেই কাঁচা খায়। আমিও খাই।"

"আর-একদিন রাতে দেখলাম, ছাতের উপরে অন্ধকারে তুই একা-একা ভূতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিস। তোর পা দু'টো উপরে, মাথা নীচের দিকে।"

"শরীর ঠিক রাখার জন্য আমি রোজ সন্ধেবেলা খোলা ছাতে ব্যায়াম করি। পা উপরের দিকে, মাথা নীচের দিকে করে আসন করি। শীর্ষাসনের নাম শোনেননি আপনি?"

"তা অবশ্য শুনেছি।"

অভিমানে ভুতোর গলা বুজে এল, "আসলে কী জানেন বাবু, আমার গায়ের রং কালো। চেহারাটা ঢ্যাঙা সিড়িঙ্গেপানা, আর নামেও ভুতো বলে আপনি আমাকে অচ্ছেদ্দা করেন। আপনি একা মানুষ। আমি ছেড়ে গেলে কে আপনাকে রেঁধেবেড়ে দেবে, ঘরদুয়ার ঝাঁটপাট দেবে, দেখাশুনো করবে, ভেবে আমি এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছিলাম। আজ আবার ভূত বলে আমাকে অপমান করলেন। আমার পেস্টিজ একেবারে পাংচার করে দিলেন। আর নয়। এই রইল আপনার হেঁশেলের চাবি, বাজারের ফর্দ। আমি চললাম।"

'ভূতের বাপের বিয়ে' বইটা পড়ছিলেন ভজহরিবাবু। পড়া মাথায় উঠল। কাতরভাবে বললেন তিনি, "ভুতো, বাবা ভূতনাথ, আমাকে ফেলে কোথায় চললি? তুই চলে গেলে আমি যে একা-একা একেবারে আতান্তরে পড়ে যাব।"

ভুতো ফিরল না। যেতে-যেতেও শুনিয়ে গেল, "মানুষকে ভূত বলে যারা অচ্ছেদ্দা করে, তাদের তো আতান্তরে পড়াই উচিত!"

সত্যিই দারুণ আতান্তরে পড়ে গেলেন ভজহরিবাবু। বিয়ে তো করেননি, সংসারে অন্য কোনও লোকজনও নেই। দীর্ঘদিন ভুতোর উপরে নির্ভরশীল ছিলেন। এখন একেবারে একা। কে রান্নাবান্না করে, কেই-বা ঘরদুয়োর সাফসুরত করে? রান্না করতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেন, চা বানাতে গিয়ে চিনি দিতে ভুলে যান। ঘরে ঠিকমতো ঝাঁটপাট পড়ে না। দিনে-দিনে বাড়ির অবস্থা হয়ে উঠল হতশ্রী। এলোমেলো আর আগোছালো। ভজহরিবাবু মনে-মনে নিজেকে ধিক্কার দেন, না, আর কোনওদিন মানুষকে ভূত বলে অচ্ছেদ্দা করবেন না।

অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, একজন কাজের লোক না হলে আর চলছে না। চেনাজানা সকলকে বললেন, একজন কাজের লোক খুঁজে দিতে। পাড়াপড়শিদের ধরে-ধরে বললেন, একজন কাজের লোক জোগাড় করে দিতে। চেনাজানারা বললেন, "দেখছি।"

পাড়াপড়শিরা বললেন, "খুঁজছি।"

দেশে বিশ্বস্ত আর নির্ভরযোগ্য কাজের লোকের যে এত আকাল, আগে বুঝতে পারেননি। ভুতো চলে যাওয়ার পর



আঁকশির মতো হাত

মর্মে-মর্মে বুঝলেন। অগত্যা নিরুপায় হয়ে ভজহরিবাবু 'কাজের লোক চাই' বলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন।

বিজ্ঞাপন দেখে একদিন একটি লোক এল। বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা। তার হাতের গুলি, পায়ের পেশি আর বুকের পাটা দেখে ভজহরিবাবু নিজেই ভয় পেয়ে গেলেন। এ লোক তো ঠিক কাজের লোকের মতো নয়। একা মানুষ পেয়ে বাড়িতে ঢুকতে চাইছে। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে তাঁর সব কিছু কেড়েকুড়ে নিয়ে কেটে পড়বে। ভজহরিবাবু তাকে বিদায় করে দিলেন।

আর-একদিন এল এক ফিটফাট ফুলবাবু। তার কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি। কোঁচাকুঁচি সামলে এ লোক কাজ করবে কী করে? দেখেই বুঝতে পারলেন, এ লোক তাঁর কাজ করবে কী! এ লোকের কাজই না তাঁকে করে দিতে হয়! ভজহরিবাবু মানে-মানে তাকেও বিদায় করলেন।

বিজ্ঞাপনটা তা হলে অনেকের নজরে পড়েছে। কাজের খোঁজে আর-একদিন আর-একজন লোক এল। লোকটি লম্বা নয়, বেঁটেও নয়। ফরসা নয়, কালোও নয়। ফিটফাট ফুলবাবুটি নয়, আবার রাস্তার ভিখিরি-মার্কাও নয়। হাঁটুর উপরে খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া। দেখেশুনে লোকটিকে মোটামুটি পছন্দ হল ভজহরিবাবুর।

লোকটি নিজে থেকেই বলল, "কাজের ব্যাপারে চিন্তা করবেননি বাবু। সব কাজে একেবারে ফাস্টোকেলাস। শুধু একটু পানের নেশা আছে। তাও দিনের বেলা নয়, শুধু রেতের বেলা।"

ঘাড় নেড়ে ভজহরিবাবু বললেন, "পানের নেশা, তাতে আর কী! তা, খাও না বাপু যত খুশি। মাঝেমধ্যে দু'-এক খিলি আমাকেও দিও।"

লোকটি বিনয়ের সঙ্গে হাত কচলে বলল, "ও পান নয়, বাবু, এ হল..."

ভজহরিবাবুর চোখ কপালে উঠল। এর পর ভজহরিবাবু আর কী বলবেন? শুধু বললেন, "বেরোও।"

যেতে-যেতে লোকটি বলল, "কাজটি ভাল করলেননি বাবু। আমার মতো কাজের লোক হাজার খুঁজলেও দু'টি পাবেননি।"

এর পরেও অনেকে এসেছিল কাজের খোঁজে। অনেক খুঁজেও ভজহরিবাবু ভুতোর মতো কাজের লোক পেলেন না একজনও।

দুপুরবেলা নিজের হাতে দু'টি ভাত ফোটালেন। তাতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। গরম ভাতে একটু মাখন ছড়িয়ে কোনওরকমে গলাধঃকরণ করলেন। তারপর বুকের উপরে 'ভূতের মায়ের স্বয়ংবরা' বইটি নিয়ে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন। পড়তে-পড়তে হয়তো তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল। চ্যাটাং করে টাকে পড়ল চাটি। তড়াক করে সোজা হয়ে বসলেন ভজহরিবাবু, "কে, কে রে?"

ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকটা ভাল করে দেখলেন। না, কেউ তো কোথাও নেই। ভজহরিবাবু কি একটু ভয় পেলেন?

"যা ভাগ, ভাগ। আমার বাবুকে তোরা বিরক্ত করিস কেন রে?" কথাটা বলতে-বলতেই লোকটি ঘরে এসে ঢুকল।

ভজহরিবাবু এবারে সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন, "কে, কে রে তুই?"

"আমাকে চিনতে পারলেন না বাবু? আমি যে আপনার...।"

লোকটিকে চিনতে পেরে ভজহরিবাবু একেবারে আহ্লাদে আটখানা হলেন। বললেন, "এতদিনে বাবুকে তোর মনে পড়ল রে ভুতো, ইয়ে ভূতনাথ?"

ঢের শিক্ষা হয়েছে ভজহরিবাবুর। আর ভুতোকে ভুতো নয়, ভূতনাথ বলেই ডাকবেন তিনি।

ভুতো বলল, "মনে কি আর পড়েনি? খুব পড়ত। ফিরে আসতেও ইচ্ছে হত! কিন্তু একটু বাধোবাধো ঠেকত।"

"কেন, বাধোবাধো কেন?"

"বিজ্ঞাপনটা আমারও চোখে পড়েছিল। ওই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যদি আরও দু'-একটি কথা জুড়ে দিতেন, তো তখনই এসে পড়তাম।"

"কী কথা বল দিকিনি?"

"ভুতোর মতো লম্বা, সিড়িঙ্গে, মিশকালো লোক হলেও চলবে।"

"ঠিক বলেছিস রে ভূতনাথ, খুব ভুল হয়ে গেছে।"

কথায়-কথায় অনেকটা সময় গেল। ভজহরিবাবু জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। জানলার বাইরে একটা জামরুল গাছ। গাছে থোকা-থোকা জামরুল পেকে আছে। বাইরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ভজহরিবাবু বললেন, "গাছে কত জামরুল, অথচ একটা জামরুলও আমার খাওয়া হয়ে ওঠেনি। তুই তো ছিলি না। কে আমাকে পেড়ে খাওয়াবে!"

ভুতো উৎসাহের সঙ্গে বলল, "খাবেন বাবু? পেড়ে দেব?"

ভজহরিবাবু বললেন, "ভর সন্ধেবেলা! আজ আর গাছে উঠে কাজ নেই। কাল সকালে বরং পেড়ে দিস!"

ভুতো বলল, "গাছে উঠতে যাব কেন? জানলার ভিতর দিয়েই তো দিব্যি পেড়ে আনতে পারি।"

জানলা থেকে গাছের দূরত্ব অন্তত পাঁচ গজ তো হবেই। লম্বা আঁকশির মতো হাত বাড়িয়ে গাছের মগডাল থেকে একথোকা জামরুল পেড়ে আনল ভুতো।

চমকে উঠলেন ভজহরিবাবু, "ভূতনাথ, তুই...?"

ভুতো বলল, "চিরকাল আমাকে ভুতো বলে ডেকেছেন, এখন আবার ভূতনাথ কেন? মানুষকে ভুতো বললে অচ্ছেদ্দা করা হয়, কিন্তু...।"

ভজহরিবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "তোকে ভূতনাথ বললে তোর প্রেস্টিজ পাংচার হয়, তাই না রে?"

হাত কচলাতে-কচলাতে সলজ্জ হেসে ভুতো বলল, "হেঁ-হেঁ-হেঁ, ঠিক বঁলেছেঁন বাঁবু!"

ছবি: সুব্রত চৌধুরী



ক্যাম্পাস

বৈষ্ণবচক মহেশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়

পূর্ব মেদিনীপুর

পড়াশোনার বাইরে কী কী হচ্ছে তোমাদের স্কুলে

ছোটদের আনন্দমেলার এই বিভাগে কলকাতা ও অন্যান্য জেলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পাঠাতে পার স্কুলের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বিষয়ক নানা খবর। একটি স্কুল থেকে অন্তত চারটি খবর আমাদের হাতে আসা চাই। সঙ্গে থাকা চাই রঙিন ফোটো। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'আনন্দমেলা ক্যাম্পাস বিভাগ' কথাটি।

আমাদের স্কুল

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের কাছে ছায়াসুনিবিড় পরিবেশে আমাদের স্কুলটি অবস্থিত। ১৯৬৪ সালে তৈরি হয় বৈষ্ণবচক মহেশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়। এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। এখন স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২,৩০০।

বেলা ১০টা ৪০ মিনিটে সমবেত প্রার্থনাসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় আমাদের স্কুল। এর পর রয়েছে মহাপুরুষদের বাণী পাঠ, শপথবাণী পাঠের অনুষ্ঠান। ছুটির আগে নিয়ম করে জাতীয়সঙ্গীত গাওয়া হয়।

আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিটি বেশ সমৃদ্ধ।



এখানে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাসহ অনেক দুষ্প্রাপ্য বই রয়েছে। স্কুলের খেলার মাঠটিও বিশাল। আমাদের স্কুলের কম্পিউটার ক্লাসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এ ছাড়াও স্কুলে সারাবছর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ, স্বাধীনতা দিবস, শিক্ষক দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রভৃতি।

খেলাধুলোতেও আমরা পিছিয়ে নেই। ফুটবল, ক্রিকেট, খো-খো, সব ধরনের খেলাই আমরা খেলি। প্রতি বছরই আমরা 'শিক্ষামূলক ভ্রমণে' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে বেড়াতে যাই। গত বছর আমরা গিয়েছিলাম অযোধ্যা পাহাড়। খুব আনন্দ হয়েছিল সেবার!

ভাষা দিবসে আমাদের শ্রদ্ধা

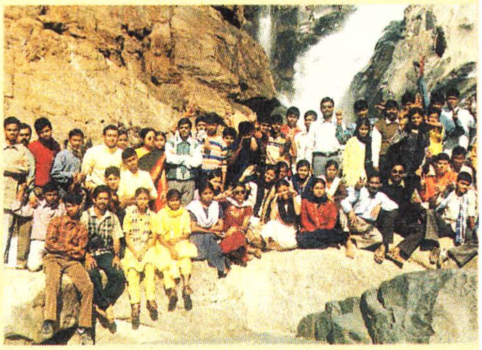
রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে এক বিশেষ দিন। বাংলা ভাষার জন্য শহিদ হয়েছিলেন সালাম, বরকত, জব্বার। এই দিনটিতে আমরা সবাই তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই। শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাংলা ভাষার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। এই দিনটিতে গল্পে-কথায়-কবিতায়-গানে বাঙালি হিসেবে আমাদের পরিচয়টি যেন আরও উজ্জ্বলভাবে খুঁজে পাই।

রাখিবন্ধন উৎসব

রাখিবন্ধনের দিন কবিতাপাঠ, গান, নাটক, সব মিলিয়ে এক আনন্দের উৎসবে জমজমাট হয়ে ওঠে আমাদের স্কুল। শিক্ষক-শিক্ষিকারা রাখিবন্ধনের তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের বুঝিয়ে দেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা বাঙালির ঘরে সব ভাইবোনদের এক হওয়ার আহ্বান জানাই।

দশটি ঝরনার দেশে

আমরা স্কুল থেকে বেড়াতে গিয়েছিলাম ঝাড়খণ্ডের দশম ফলসে। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশটি এত ভাল লেগেছিল যে, আজও আমাদের স্মৃতিতে অমলিন হয়ে রয়েছে।

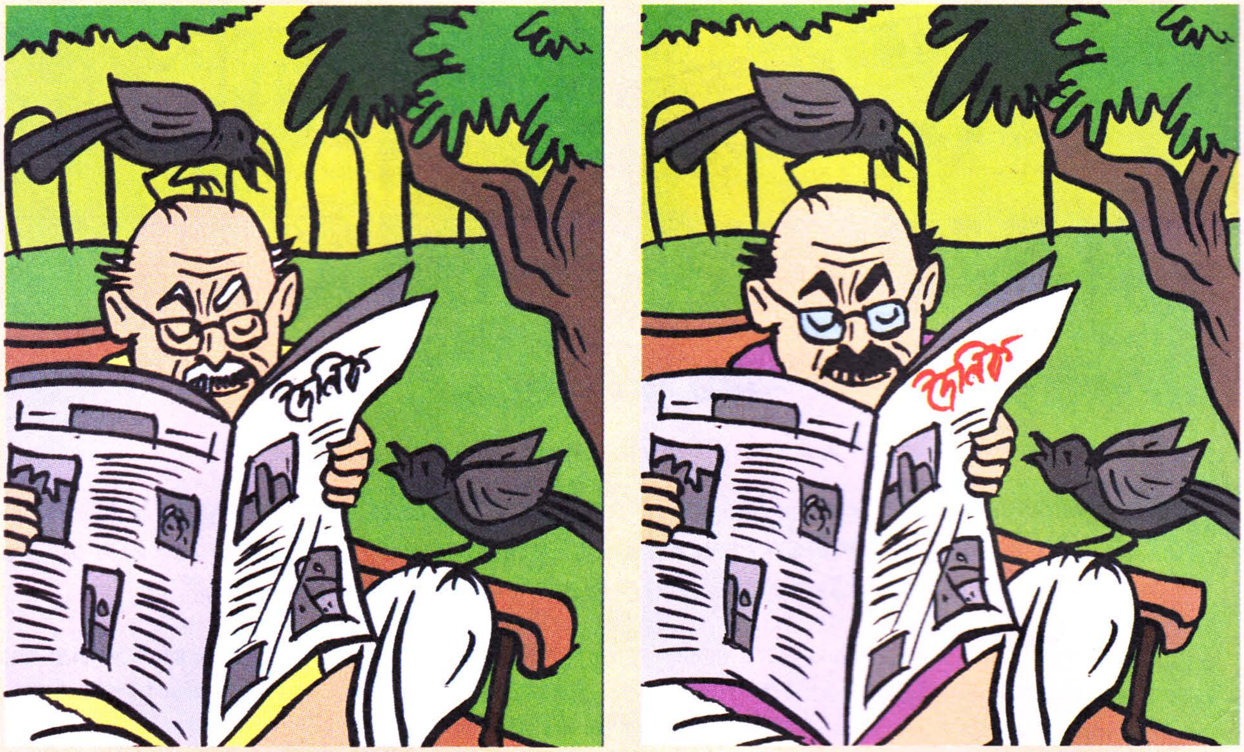


পাহাড়-ঘেরা জায়গায় দশটি জলের ধারা নেমে এসেছে প্রায় দেড়শো ফুট গভীর খাদের মধ্যে। জলের মধ্যে সূর্যের আলোয় তৈরি হয়েছে রামধনুর সাতটি রং, এই দৃশ্য এখনও ভুলতে পারিনি। এতকাল যা বইয়ে পড়ে এসেছি, তা চোখের সামনে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছি। পরে সুযোগ এলে আবার যেতে চাই।

অর্ঘ্য মাদ্রাজি, দেবনাথ সামন্ত, পীতাম্বর পাঁজা

এরা সবাই একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো



উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

হা স ছি দ্যা খো

অশোক রায়ের বাড়ির পাশে নতুন বাড়ি করেছেন অমলেশ চাকলাদার। সেই বাড়ির নীচে ছোটখাটো একটা মুদির দোকানও করেছেন তিনি। অশোকবাবু এখন মাসকাবারি বাজার এই দোকান থেকেই করেন। বেশ কয়েকদিন নগদে কেনার পর ধারে কেনাকাটা করতে শুরু করলেন তিনি। বেশ কিছু টাকা বাকি পড়ে যাওয়ার পর একদিন অমলেশ চাকলাদারকে বললেন অশোকবাবু, "আজ সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে আসুন। পুরো টাকাটা মিটিয়ে দেব।"
"একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না?" অমলেশবাবু প্রশ্ন করলেন অশোক রায়কে।
"না, না। কী কথা বলুন তো?"
"শুনেছি, কোনও পাওনাদার আপনার বাড়িতে এলেই তার সঙ্গে আপনি নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করেন?"
"না, না, এ একেবারেই মিথ্যে কথা। এসব কাজে আমার পোষা কুকুরটাকেই লেলিয়ে দিই আমি," হেসে বললেন অশোকবাবু।

অনেকদিন ধরে কানের সমস্যায় ভুগছিলেন বিপুল মল্লিক। একেবারেই শুনতে পাচ্ছিলেন না কানে। ডাক্তারবাবু বললেন যে, কানে একটা ছোট্ট অপারেশন করে দিলেই তিনি পরিষ্কার শুনতে পাবেন সব। রাজি হলেন বিপুল মল্লিক। যথাসময়ে হয়েও গেল অপারেশন। ডাক্তারবাবু বিপুল মল্লিককে বললেন, "খুব ভালভাবে হয়েছে আপনার কানের অপারেশন। এবার আর শুনতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।"



"আমাকে কি কিছু বললেন ডাক্তারবাবু?" বিপুল মল্লিকের প্রশ্ন।

হরিপদ গাঙ্গুলি নামী মাছশিকারি। তাঁর বাড়ি থেকে একটু দূরেই রয়েছে বিশাল এক পুকুর। সেখানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাছ ধরেন তিনি। ছুটির দিনে নাওয়া-খাওয়া ভুলে ওখানেই কাটিয়ে দেন সারাটা দিন। ইদানীং মাছ ধরতে গেলেই পাশের পাড়ার গোপেনবাবু সারাক্ষণ তাঁর পাশে বসে মাছধরা দেখেন। আর প্রতি মুহূর্তে কোনও না কোনও মন্তব্য করেন। যতক্ষণ না ছিপ গুটিয়ে বাড়ি ফিরছেন তিনি ততক্ষণ নড়েন না গোপেনবাবু। একদিন আর থাকতে না পেরে হরিপদবাবু বললেন, "আচ্ছা, সারাদিন ধরে অন্যের মাছধরা না দেখে আপনি নিজেই তো মাছ ধরতে পারেন।"
"সেটা ঠিকই বলেছেন। তবে সারাদিন ধরে মাছধরা? আমার অত ধৈর্য নেই বাপু।"

ওলট পালট



ছবি: দেবাশিস দেব

খবরের কাগজের কলামে উত্তেজনাপূর্ণ খবরকে যা বলা যেতে পারে

পাশে আছে চারটি শব্দ। প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো। অক্ষরগুলো ঠিকমতো সাজালেই পাওয়া যাবে সঠিক শব্দটি। এবারে পাশের গোলচিহ্নের ভিতরের অক্ষরগুলো উলটেপালটে সাজালেই পাওয়া যাবে উপরের কার্টুন ছবির সংকেতের সমাধান।

জপাগকালা

তুলয়মালা

আণমরলকা

লববাজমত

উত্তর আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

কবিতা পাঠে পাঠক যা পায়

জী ব না ন ন্দ

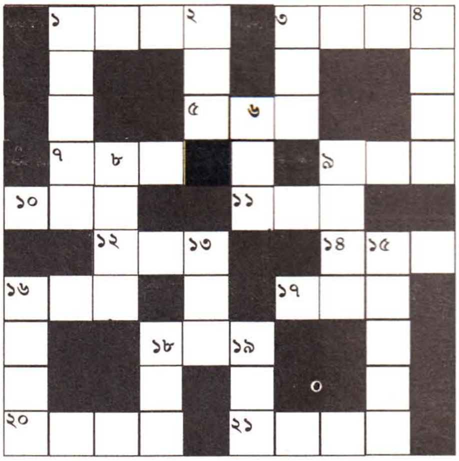
গত সংখ্যার সঠিক শব্দ:
পরমানন্দ, নানারকম, জীমূতবাহন, মানবসমাজ

ঘোষক

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো-র উত্তর

(১) লোকটির গোঁফের রং পালটে গেছে। (২) মাথায় বসে থাকা কাকটির একটি পা নেই। (৩) চশমার কাচের রং আলাদা। (৪) 'দৈনিক' লেখাটির রং পালটে গেছে। (৫) গাছের গুঁড়িটি ছোট। (৬) লোকটির জামার রং আলাদা। (৭) খবরের কাগজের একটি পাতা কম। (৮) বেঞ্চির হাতলের ডিজ়াইন আলাদা।

শব্দসন্ধান



সংকেত: পাশাপাশি

(১) জোগাড়, ব্যবস্থা, উদ্যোগ। (৩) চুপিচুপি কথা। (৫) বস্ত্র, পরনের কাপড়। (৭) বর্ষাকালে আকাশ এমনই থাকে। (৯) '— ভেঙে কাটছে সেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।' (১০) ইটের তৈরি পাকা বাড়ি। (১১) রন্ধন, রান্না। (১২) ব্যাপার, যা ঘটে। (১৪) দুর্বল, রোগা, নিস্তেজ। (১৬) বিপরীত। (১৭) লজ্জা, সংকোচ। (১৮) লাল রঙের এই তরল জিনিস মেয়েরা প্রসাধনী হিসেবে পায়ের পাতার চারদিকে লাগায়। (২০) সদ্য উঠেছে এমন। (২১) বন্দিশালা, শ্রীকৃষ্ণের এখানেই জন্ম।

উপর-নীচ

(১) আমার প্রিয় মাসিক পত্রিকা। (২) ইংরেজদের আগে মুসলমান রাজত্বে এঁরাই দীর্ঘদিন পরম সুখে রাজ্যশাসন করেছেন। (৩) বাগান, বন। (৫) যার অক্ষরজ্ঞান নেই, অর্থাৎ লেখাপড়া শেখেনি। (৬) বাতাস, হাওয়া। (৮) মেঘের আড়ম্বর বা সমারোহ। (৯) একসঙ্গে অনেক জিনিস কিনে খুচরো বেচে যে দোকানদার। (১৩) জব্দ, হয়রান, শ্রান্ত। (১৫) একটি মিষ্টি আমের নাম। (১৬) টাকা রোজগার। (১৮) চোট, ঘা, প্রহার। (১৯) রাতের আকাশে এরা ঝিকমিক করে।

দেবসেনাপতি

গত সংখ্যার সমাধান

সি	কে	না	ই	ডু		রা	ম	লা	ল
ঙ্গা			ম		ক		হি		
র	বি		রা	ই	ট		ন্দ		কি
	নো		ন		আ	গ	র	ক	র
ম	দ	ন		ই	উ				মা
হা				ন	ট		সি	ড	নি
রা	মি	জ	রা	জা		আ		ব	
জ		য়		মা	লি	ক		ল	ক
		সী		ম		ম			ভা
উ	ল	মা	র		ব	ল	বি	ন্দ	র



ইংল্যান্ডের নরফক-এর 'রেনহ্যাম হল'

ভুতুড়ে বাড়ি বিদেশেও

পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই খোঁজ মিলবে অদ্ভুত সব ভুতুড়ে বাড়ির। তবে ইংল্যান্ড আর আমেরিকাতেই বোধ হয় ভুতুড়ে বাড়ির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সত্যিই কি ভূতের উপদ্রব হয় ওইসব বাড়িতে? নাকি সবটাই মানুষের কল্পনা? বিদেশের ভুতুড়ে বাড়ির কথা লিখেছেন জয় সেনগুপ্ত

সেটা ছিল ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চ। নিউ ইয়র্কের হাইডসভিল-এ সেদিন রাতে ঘটেছিল অদ্ভুত এক ঘটনা। ওই বাড়িতে থাকতেন জন ফক্স তাঁর স্ত্রী আর তাঁদের দুই মেয়ে মার্গারেট ও কেটি। মার্গারেটের বয়স ১৫ আর কেটির ১১। বাড়িটা কেনার সময়ই জন আর মার্গারেট শুনেছিলেন যে, বাড়িটায় ভূতের উপদ্রব আছে। ব্যাপারটায় গুরুত্ব দেননি জন। বাড়িতে ঢোকার পর বেশ ভালই দিন কাটছিল ফক্স পরিবারের। জনের মতে 'ভুতুড়ে বাড়ি' ব্যাপারটা গুজব ছাড়া আর কিছুই নয়। ভূতের তো কোনও 'গন্ধ'ই নেই। কিন্তু ঠিক তিন মাস পরেই ওই বাড়িতে ঘটতে লাগল ভৌতিক সব ঘটনা। রাতে নানারকম আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। এমন অদ্ভুত সেই আওয়াজ যে, কেটি ভয়ে পাশের ঘরে না শুয়ে রাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুমোতে আরম্ভ করল। প্রতিদিন রাত হলেই দরজায়, জানলায় আর টেবিলে ঠকঠক আওয়াজ। শেষে ৩১ মার্চের ওই রাতে ভৌতিক আওয়াজের উত্তর দিল কেটি। অন্ধকার ঘরে কেটি বলল, "মিঃ স্প্লিটফুট, আমি যা করব তুমিও তাই করো।" বলে কেটি শূন্যে হাততালি দিল বেশ কয়েকবার। সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল ঠিক ওইরকম হাততালির আওয়াজ। যেন প্রতিধ্বনি হল। এবার এগিয়ে এল মার্গারেট। বলল, "না, ওরকম নয়। আমি যেরকম করব, তুমিও ঠিক সেরকমই করবে মিঃ স্প্লিটফুট। গোনো, এক, দুই, তিন, চার।" মার্গারেট ঠিক চারবার হাততালি দিল। উত্তরও পাওয়া গেল। অদৃশ্য মিঃ স্প্লিটফুট বারবার আওয়াজ করে এর প্রত্যুত্তর দিলেন। মিসেস ফক্স এবার ওই অদৃশ্য শক্তিকে বললেন তাঁর দু'মেয়ের বয়স জানাতে। তৎক্ষণাৎ আওয়াজ করে মিঃ স্প্লিটফুট জানালেন মার্গারেট আর কেটির সঠিক বয়স। যার যত বয়স ঠিক তত আওয়াজ করলেন তিনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ,



বোরলি রেক্টরির ভূতের বাড়ি

তারপর আবার শুরু হল আওয়াজ। পরপর তিনবার। এই আওয়াজ জানাল মিসেস ফক্সের সবচেয়ে ছোট মেয়ের বয়স, যে মাত্র তিন বছর বয়সে মারা গিয়েছিল।

মিসেস ফক্স এবার প্রশ্ন করলেন, "আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিচ্ছেন যিনি, তিনি কি কোনও মানুষ?"

কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। মিসেস ফক্স আবার প্রশ্ন করলেন, "আপনি যদি প্রেতাত্মা হন তা হলে দু'বার আওয়াজ করুন।"

বলামাত্র পরপর ঠিক দুটো আওয়াজ হল।

এইভাবেই নাকি চলত প্রেতাত্মার সঙ্গে মানুষের 'কথোপকথন'। ফক্স পরিবার পরে জানতে পারলেন যে, তাঁরা ওই বাড়িতে আসার বছরখানেক আগে ওখানে খুন হয়েছিলেন এক ব্যক্তি। তাঁর প্রেতাত্মাই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই বাড়িতে। এর ঠিক ৫০ বছর পর ওই বাড়ির মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছিল একজন মানুষের কঙ্কাল। বলা যেতে পারে আধুনিক প্রেতচর্চা বা ভূতের সঙ্গে মানুষের সরাসরি যোগাযোগের জন্ম হাইডসভিলের এই বাড়িটি থেকেই।

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ভুতুড়ে বাড়ির নাম বোরলি রেক্টরি। এই বাড়িতে প্রচুর অশরীরী আত্মা বাস করত। ভূতবিশেষজ্ঞ হ্যারি প্রাইস এই বাড়িতে থেকে গবেষণা চালিয়েছেন ভূত নিয়ে। ওই বাড়িতে নাকি ছিল একজন মুণ্ডহীন মানুষের ভূত, একটা ঘোড়ার গাড়ি আর কয়েকটা ঘোড়া, ওই বাড়ির নির্মাতা রেভারেন্ড হেনরি বুল এবং একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী। বলা হয়, ওই সন্ন্যাসিনীকে নাকি জীবন্ত গেঁথে দেওয়া হয়েছিল বাড়ির দেওয়ালের মধ্যে।

হ্যারি খুব সম্ভবত বিশ শতকের প্রথম দিকের ভূত-অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে সবচেয়ে নামী এবং ভূত খুঁজে বেড়ানোর কলাকৌশলের ব্যাপারেও সবচেয়ে নিখুঁত। সে-সময়কার সবচেয়ে আধুনিক টেকনোলজির সাহায্যে হ্যারি ভূত খুঁজে বেড়াতেন।

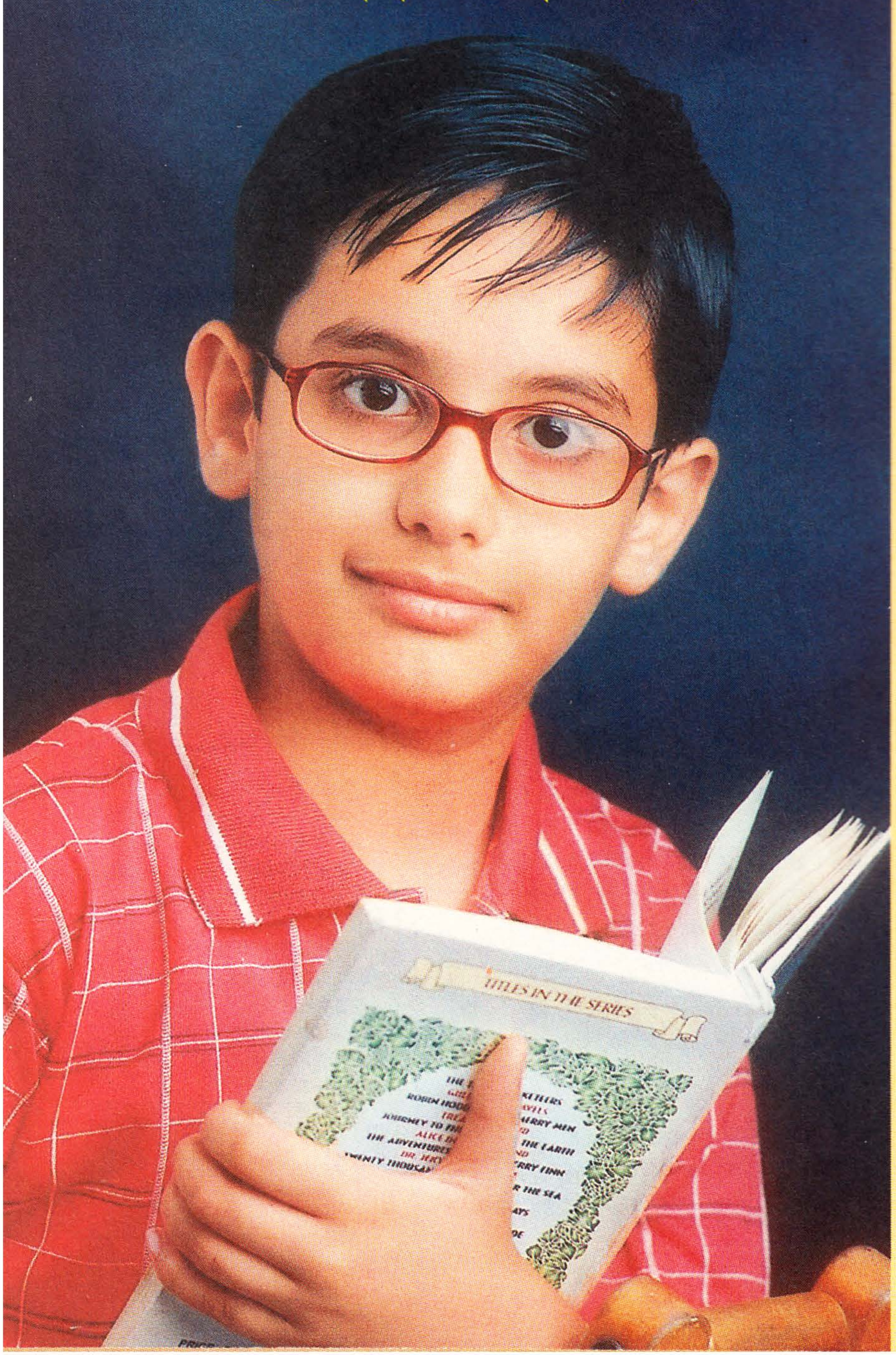
বোরলি রেক্টরি ভুতুড়ে বাড়িতে ভূতেরা কী ধরনের উপদ্রব করত? রেভারেন্ড জি এরিক স্মিথ এবং তাঁর স্ত্রী যখন ভাড়া থাকতেন ওই বাড়িতে তখন তাঁরা দেখতে পেতেন, ঘরের আসবাবপত্র নাকি নিজে-নিজেই নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, কখনও-কখনও অদৃশ্য কারও পায়ের আওয়াজ, সেইসঙ্গে কোনও মহিলার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। হ্যারি তিনদিন রইলেন ওই বাড়িতে। পুঙ্খানুপুঙ্খ স্টাডি করলেন ওই ভুতুড়ে ব্যাপারস্যাপারগুলো। মাঝে-মাঝে ছায়ার মতো একটা অবয়বও তিনি লক্ষ করলেন। তাঁর মতে ওই ছায়ামূর্তি খুব সম্ভবত মৃত ওই সন্ন্যাসিনীর। মৃত রেভারেন্ড মিঃ বুলের সঙ্গেও তাঁর নাকি একটা যোগাযোগ হয়েছিল।

এক বছর পর হ্যারি আবার ওই বাড়িতে ভূতের সন্ধান চালান। স্মিথ-দম্পতি অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন ওই বাড়ি ছেড়ে। নতুন ভাড়াটে হিসেবে এসেছিলেন রেভারেন্ড লিওনেল ফয়েস্টার আর তাঁর স্ত্রী। ফয়েস্টার আসামাত্র শুরু হল ভূতের উপদ্রব। হয়তো লোকজন বসে রয়েছে ঘরের ভিতর। বাইরে থেকে কে যেন দরজা লক করে দিল। গৃহস্থালির জিনিসপত্র অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল, জানলার কাচ ভাঙা শুরু হল, আসবাবপত্র লাফাতে আরম্ভ করল, বাতাসে অদ্ভুত একটা গন্ধ ভেসে বেড়াতে লাগল, সেইসঙ্গে অদ্ভুত সব আওয়াজ হতে লাগল। মিসেস ফয়েস্টারকে একদিন রাতে বিছানা থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল ভূত। আরও সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। এর পর কি আর থাকা যায় ওই বাড়িতে? ফয়েস্টার-দম্পতি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন। হ্যারি তখন লিজ় নিয়ে নিলেন ওই বাড়িটি। অশরীরী আত্মা খুঁজে বেড়াতে গিয়ে বাড়িটিকে পরিণত করে ফেললেন একটি ল্যাবরেটরিতে। ৪৮ জন ভলান্টিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়ির আনাচেকানাচে ভূত খুঁজে বেড়াতে লাগলেন তিনি। তাঁর যাবতীয় গবেষণার ফসল 'দ্য মোস্ট হন্টেড হাউস ইন ইংল্যান্ড'। ১৯৪০ সালে বইটি প্রকাশিত হয়।

ইংল্যান্ডের নরফক-এর 'রেনহ্যাম হল' ভুতুড়ে বাড়ি হিসেবে বিখ্যাত। 'ব্রাউন লেডি'-র প্রেতাত্মা নাকি ঘুরে বেড়াত সেখানে। ১৯৩৬ সালে এই অশরীরী আত্মার 'ছবিও' ক্যামেরাবন্দি করা হয়। আজ পর্যন্ত যত ভূতের ছবি তোলা হয়েছে তার মধ্যে এটিই নাকি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। ১৮৩৫ সালের ক্রিসমাসের সময়। ছুটি কাটাতে রেনহ্যাম হলে গিয়েছিলেন কর্নেল লফটিস। একদিন একটু বেশি রাতে তিনি ঢুকতে যাবেন নিজের ঘরে, হঠাৎ দেখলেন, অপরিচিত একজন মহিলার মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে। থতমত হয়ে গেলেন তিনি। যেই ভাল করে দেখতে যাবেন মূর্তিটাকে, বেমালুম তাঁর সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা। পরের সপ্তাহে কর্নেল আবার দেখলেন ওই মহিলাকে। বাদামি রঙের পোশাক পরা ওই মহিলা নাকি আসলে প্রেতাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভূতবিশ্বাসীরা বলেন, মানুষের মৃত্যুর পরই নাকি শেষ হয়ে যায় না সবকিছু। মৃত মানুষের আত্মা ঘুরে বেড়ায়। তারা আমাদের পাশে-পাশেই থাকে। বিজ্ঞান কিন্তু ভূত মানে না। তবে ভূত থাকুক আর না থাকুক, আমাদের দেশের মতো বিদেশেও আছে গা ছমছম করা সব ভুতুড়ে বাড়ি।

সায়েন্স অলিম্পিয়াডে সেরা শৌভনিক



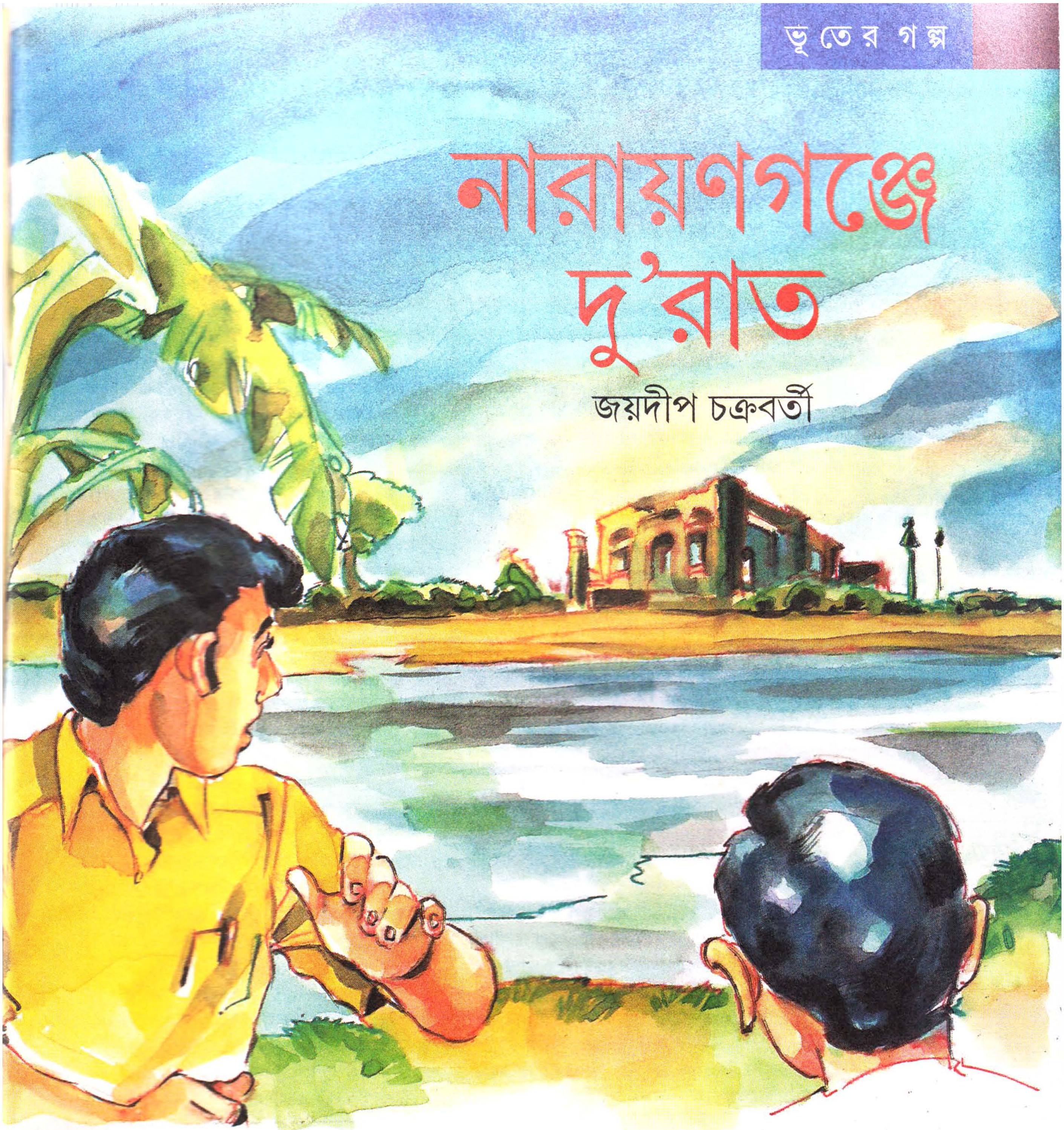
প্রত্যেক বছর ভারতের 'সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশন' স্কুলে-স্কুলে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এবারে প্রায় দু'লক্ষ প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম হয়েছে ক্লাস ফোরের শৌভনিক। লিখেছেন বেদদ্যুতি চক্রবর্তী

মাত্র ১০ বছর বয়স শৌভনিকের। ক্লাস থ্রি থেকে ফোরে উঠেছে। ওর জন্য অপেক্ষা করছে সোনার মেডেল, সার্টিফিকেট, ঝকঝকে একটা কম্পিউটার আর ১০ হাজার টাকা। তার কারণ, সপ্তম ন্যাশনাল সায়েন্স অলিম্পিয়াড (২০০৪-২০০৫)- এ ক্লাস ফোর বিভাগে প্রথম হয়েছে শৌভনিক চক্রবর্তী। গত বছর ক্লাস থ্রি বিভাগে ওর স্থান ছিল তৃতীয়। এবারে চ্যাম্পিয়ন।

প্রত্যেক বছর ভারতের 'সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশন' স্কুলে-স্কুলে আয়োজন করে এই প্রতিযোগিতার। এবার ছিল প্রায় দু'লক্ষ ছাত্রছাত্রী। বিজ্ঞানের নানা বিষয় থেকে আসা প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিতে তারা হাজির ছিল পরীক্ষার হলে। ক্লাস থ্রি থেকে টুয়েল্ভ পর্যন্ত আলাদা-আলাদা পরীক্ষা। ইচ্ছে করলেই যে কেউ এই পরীক্ষায় বসতে পারে। তার আগে পরীক্ষার্থীর স্কুলকে ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশন, ৪০৬ তাজ অ্যাপার্টমেন্ট, রিং রোড, নয়াদিল্লি-১১০ ০২৯ ঠিকানায় চিঠি লিখে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। তারপর ফাউন্ডেশন থেকেই দরকারি কাগজপত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হবে নমুনা প্রশ্নপত্র। বাবা হায়দরাবাদে চাকরি করেন। শৌভনিকও বাবা-মায়ের সঙ্গে হায়দরাবাদেই থাকে। স্কুলের ছুটি হয়ে গেলেই বাড়িতে এসে রকমারি বই নিয়ে বসে পড়ে। 'হ্যারি পটার' কিংবা 'ফেমাস ফাইভ' অ্যাডভেঞ্চার সিরিজের বই পেলে তো কথাই নেই। প্রতিদিন দুপুরে একটানা বেশ কিছুক্ষণ মনের মতো বই না পড়লে তার ভাল লাগে না। নতুন বই না পেলে পুরনো বইগুলোকেই বারবার পড়ে ও। বাড়িতে কাঠের ব্যাট আর প্লাস্টিকের বল দিয়ে বাবার সঙ্গে বৈঠকখানাতেই মাঝেমধ্যে শুরু হয়ে যায় ওয়ান ডে ক্রিকেট। বড় হয়ে কী হবে প্রশ্ন করতে তৎক্ষণাৎ উত্তর, "অ্যাস্ট্রোনমার।"

নারায়ণগঞ্জে দু'রাত

জয়দীপ চক্রবর্তী



ক'দিন আগে থেকেই প্ল্যান-প্রোগ্রাম চলছিল যে, দু'-চারদিনের ছুটিছাটা ম্যানেজ করে যদি কাছেপিঠে কোথাও ঘুরে আসা যায়। বাবাই একটু জঙ্গলপ্রিয়। ওর ইচ্ছে ছিল ডুয়ার্সের দিকে কোথাও একটা যদি বনবাংলো-টাংলো বুক করা যায়, তা হলে ক'টা দিন নিরিবিলিতে গল্পগুজব করে আর নদী-জঙ্গল দেখে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আমি আবার একটু পাহাড়ঘেঁষা। কাজেই বাবাইয়ের জঙ্গলের ব্যাপারটা মাথায় রেখেই আর-একটু এগিয়ে বললাম, "তার চেয়ে চল বরং লাভা-লোলেগাঁও ঘুরে আসি। ওখানে জঙ্গলও পাবি আবার পাহাড়ের ভিউগুলোও মিস হবে না। আমার প্রস্তাবে বাবাইয়ের খুব একটা আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাধ সাধল কৌশিক। ডুয়ার্স, লাভা দুটো প্রস্তাবই খারিজ করে দিয়ে ও বলল, "অত দূরে হবে না।"

আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, "হবে না কেন?"

বাবাই বলল, "শর্ট টাইমে রিজার্ভেশনের ঝামেলার ব্যাপারটা ভাবিস যদি, তা হলে বলছি, অসুবিধে নেই কোনও।

আগের দিন তৎকাল টিকিট কিনে নেব। একটু খরচ বেশি হবে, এই যা!"

আমিও বললাম, "ট্রেন না হলে রকেটবাসও তো আছে।"

কৌশিক বলল, "হবে না।"

অসহিষ্ণু হয়ে আমি বললাম, "তখন থেকে তো হবে না, হবে না করছিস। কেন হবে না, সেই কারণটা তো বলবি।"

"আসলে ওসব জায়গায় যেতে হলে অন্তত সাত-আট দিন হাতে রাখতে হয়। আমার যা অবস্থা এখন, তাতে অফিস অতদিন টানা ছুটি কিছুতেই দেবে না," মাথা ঝাঁকিয়ে বলে কৌশিক।

"তা হলে?" আমি ওর দিকে তাকিয়ে বলি।

"অন্য জায়গার কথা ভাবতে হবে। আর-একটু কাছাকাছি," কৌশিক বলে।

"কাছাকাছি মানে তো সেই শান্তিনিকেতন কিংবা মুকুটমণিপুর," বাবাই বিরক্ত গলায় বলে।

"তা কেন, কেওনঝড় চল," আমি বলি, বাবাইকে সামাল দিতে।

"চল বললেই তো আর যাওয়া যায় না, বিস্তর ঝামেলা এখন ওদিকে। অযথা রিস্ক নেওয়ার কোনও মানে হয় না," একটু উদাসীন গলায় বলে কৌশিক।

"তা হলে তুই-ই একটা জায়গা সাজেস্ট কর," বাবাই রেগেমেগে বলে।

"বলছিস?" সোজা হয়ে বসে কৌশিক।

"বলছি," বাবাই খাপ্পা।

"তা হলে চল, দিন তিনেকের জন্য নারায়ণগঞ্জ ঘুরে আসি!" এমনভাবে নারায়ণগঞ্জ কথাটা বলল কৌশিক, যেন প্যারিস উচ্চারণ করছে।

"নারায়ণগঞ্জ, সেটা আবার কোথায়?" আমি আর বাবাই দু'জনেই জিজ্ঞেস করে উঠি অবাক হয়ে।

"নারায়ণগঞ্জ একটা ভারী মিষ্টি গ্রামের নাম। একেবারে নিরিবিলি। লোকজনের বাস খুব বেশি নেই। মেলা গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল আছে চারপাশে। একটা ছোট্ট নদীও আছে আঁকাবাঁকা সাপের মতো। আর সেই নদীর ধারেই আছে একটা মস্ত পুরনো বাড়ি। প্রায় ফাঁকা," যেন রূপকথার কোনও এক গল্প শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলে যেতে লাগল কৌশিক।

বাবাই বলল, "এত তুই জানলি কী করে? তুই কি আগে কখনও গেছিস ওখানে?"

"না।"

"তা হলে?"

"সুপ্রিয়র কাছে শুনেছি।"

"সুপ্রিয়টা আবার কে?"

"আমার কলিগ।"

"সে-ই বা জানল কী করে?"

"বাড়িটা ওদেরই। ওর ঠাকুরদা বানিয়েছিলেন সেকালে। এখন পড়ে আছে। শুধু এক বুড়ো কেয়ারটেকার আছে দেখাশোনার জন্য। আর আছেন সুপ্রিয়র এক জ্যাঠামশাই, নাম অবনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।"

"উনি অত বড় বাড়িতে একা থাকেন?" একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করি আমি।

"হ্যাঁ," উত্তর দেয় কৌশিক।

"ওঁর পরিবার?"

"নেই।"

"নেই মানে? উনি কি বিয়ে-থা করেননি?"

"করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের সাত বছরের মাথায় ওঁর স্ত্রী আর চার বছরের মেয়ে কীভাবে যেন মারা যায়!"

"কীভাবে মানে?"

"জানি না। আসলে কেউই জানে না। এটা একটা রহস্য। এ-রহস্যের আজও কোনও কিনারা হয়নি। অবনীবাবু নিজেও বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন।"

"তারপর?"

"কোনও সমাধান খুঁজে না পেয়ে স্ত্রী আর মেয়ের স্মৃতি আগলে ওই বাড়িতেই থেকে গেছেন তিনি। ওখান থেকে কেউ সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি তাঁকে। তাঁর বিশ্বাস, তিনি তাঁর মেয়ে, বউকে নিয়েই থাকেন ওই বাড়িতে। এখনও!"

বলিস কী রে, এ যে রীতিমতো ভুতুড়ে কাণ্ড," আমি একটু ভয়ে-ভয়েই বলি।

"বলতে পারিস," কৌশিক নিরুদ্বিগ্ন গলাতেই উত্তর দেয়।

"তুই কি এইসব আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করে ফেলেছিস নাকি যে, সত্যিই বাড়িটায় ওইসব ব্যাপারস্যাপার আছে?" বাবাই তাচ্ছিল্যের সুরে জিজ্ঞেস করে কৌশিককে।

"আমি বিশ্বাস করি কি না করি সেটা তো কোনও প্রশ্ন না, অবনীবাবু যে ব্যাপারটা বিশ্বাস করেন সে কথাটা তোদের শুনিয়ে রাখলাম শুধু!" ঠান্ডা গলায় বলে কৌশিক।

"কেন শোনালি?" সন্দিগ্ধ গলায় বাবাই জিজ্ঞেস করে.

"এসব শুনেটুনেও তোরা যদি যেতে চাস, আমি তো আর জোর করে তোদের নিয়ে যেতে পারি না।"

"তুই ভাবলি কী করে যে আমরা ভয় পাব?" চোখ পাকিয়ে বলে বাবাই।

"পেতেও তো পারিস," হাসে কৌশিক।

"কভি নেহি।"

"ওখানে যাওয়া তা হলে পাক্কা?"

"আলবাত।"

"কথা বলি তা হলে সুপ্রিয়র সঙ্গে?"

"একশোবার।"

আমার কোনও মতামত না নিয়েই কৌশিককে কথা দিয়ে দিল সবাই।

আমি আর কী করব? অগত্যা গন্তব্য নারায়ণগঞ্জ।

॥২॥

সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কৌশিকটা বিটকেল আর ডানপিটে। নানারকম দস্যিপনায় বরাবর সিদ্ধহস্ত ও। আর বাবাইটাও যেন কয়েনের উলটো পিঠ। পৃথিবীতে যে আদৌ



নারায়ণগঞ্জে দু'রাত

ভয় পাওয়ার মতো কোনও বিষয় আছে, ওকে দেখলে কিছুতেই তা বোঝার উপায় নেই। এমনিতে চেহারাটাও ওর বড়সড়। শক্তিও গায়ে প্রচুর। তবে এই অজুহাতে যে-কোনও ভয়ভীতির কথাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার ওর যে বিশ্রী স্বভাব, সেটা আমি আবার কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। ছেলেবেলা থেকেই চেহারায় রোগাভোগা আমি। ভয়ভীতিও আমার হাড়মজ্জায়। ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মতো মনের জোরও আমার ছিল না কোনওদিন। অতএব নারায়ণগঞ্জের ওই বিচ্ছিরি ভুতুড়ে বাড়িতে অ্যাডভেঞ্চার করতে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না আমার। বেশি ধানাইপানাই না করে কৌশিক আর বাবাইকে বলেওছিলাম আমি কথাটা। কিন্তু আমার আপত্তি ধোপে টেকেনি। দু'জনেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে আমার কথা। উলটে খানিক ঠাট্টা-তামাশা আর উপহাস জুটেছে আমার কপালে, আমার এই অহেতুক ভিতু স্বভাবের জন্য। আমি কথা বাড়াইনি আর। যারা অবুঝ, তাদের বোঝানো শিবের বাবারও অসাধ্য।

অবশ্য, নারায়ণগঞ্জে এসে পৌঁছনোর পর ওদের উপর আর একটুও রাগ, অভিমান নেই আমার। গ্রামটা সত্যিই যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো সুন্দর। আর যে বাড়িটায় এসে উঠেছি আমরা, সেটা তো প্রায় ছোটখাটো রাজপ্রাসাদ একটা। যদিও সেই বাড়ির জলুস ফিকে হয়ে গেছে এখন। পলস্তারা খসে পড়েছে দেওয়ালের, ছাদের গায়ে-গায়ে আটকে আছে লম্বা-লম্বা ঝুল। তবুও এ-বাড়িতে ঢুকলে বোঝা যায় যে, আগে কেমন জমকালো ছিল বাড়িটা। কেয়ারটেকার হরিপ্রসাদ যে ঘরটাতে থাকতে দিল আমাদের, সাফসুতরো করে বিছানা পেতে, সে ঘরটি পেল্লায় বড়। ঘরটি একেবারে পুব দিকে, সিঁড়ির ঠিক ডান পাশে। পুবের দেওয়ালে লোহার গরাদে দেওয়া মস্ত জানলা। জানলার ওপাশে নদী। আপনমনে তিরতির করে বয়ে চলেছে তার জল। নারায়ণগঞ্জে বিজলিবাতির বন্দোবস্ত নেই বলে আমরা একটু নাক সিঁটকেছিলাম। ভেবেছিলাম, এই গরমে পাখার হাওয়া ছাড়া থাকব কীভাবে? কিন্তু দরজা খুলে আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে হরিদা যেই দক্ষিণের জানলা দুটো খুলে দিল, সঙ্গে-সঙ্গে এত হাওয়া একসঙ্গে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে এল যে, আমাদের আর বৈদ্যুতিক পাখার কথা মনেই পড়ল না।

অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা হল আমাদের দুপুরের খাওয়াদাওয়া এবং বিশ্রামের পর, একেবারে বিকেলবেলা। ওঁর ঘরটি দোতলায়। আমাদের ঘরের ঠিক মাথার উপর। উনি নিজের ঘর থেকে বাইরে বেরোন না। শারীরিক সামর্থ্যও নেই তাঁর। হরিদাই তাঁর দেখভাল করে সমস্তদিন। তারপর সন্ধে হতে না-হতেই ভবানীবাবুকে খাইয়েদাইয়ে নীচে নেমে আসে তার নিজের ঘরে।

আজও অবনীবাবুকে খাইয়েদাইয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়েই নীচে নেমে এল হরিদা। বলল, "আপনারা গপ্পটপ্প করুন খানিক। আমি ততক্ষণ খাবারদাবারের ব্যবস্থা করি।"

তেলের লণ্ঠন জ্বলছে ঘরে। আবছা আলোয় থমথম করছে ঘর। জানলার বাইরে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। জোনাকি উড়ছে। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা।

কৌশিক বাবাইয়ের কাঁধে চাপড় মারল, "কীরে, তোর বনবাংলোর চেয়ে কিছু খারাপ হল? সত্যি করে বল দিকিনি।"

"ফ্যানটাস্টিক।" হাসে বাবাই। তারপর বলে, "সত্যি, এই পরিবেশে যেন একটা ভূতটুত না থাকলে মানায় না!"

বাবাইয়ের কথা শেষ হতে না-হতেই জানলার ওপার থেকে ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা করে বিশ্রী একটা আওয়াজ করে উঠল কে যেন!

ছ্যাঁত করে উঠল আমার বুকের ভিতরটা। চমকে উঠে লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমি।

কৌশিক খপ করে একটা হাত ধরে ফেলল আমার। হেসে বলল, "ভয় পেয়ে গেলি জিতু?"

"আওয়াজটা কী বল তো?" কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করি আমি।

"ভূত নয়, ওটা নেহাতই একটা পাখি খোকাবাবু," বাবাই ব্যঙ্গ করে বলে আমায়।

"পাখি?" সন্দেহের সুরে বলি আমি।

"হ্যাঁ, প্যাঁচা।" আমাকে আশ্বস্ত করে বাবাই।

"প্যাঁচার ডাকেই যদি ভিরমি খাস তা হলে সত্যি-সত্যিই ভুতুড়ে কিছু ঘটলে তো অক্কা যাবি রে জিতু," বলে হেসে বিছানার উপর একেবারে গড়িয়ে পড়ে কৌশিক।

নিজের উপর খুব রাগ হয় আমার। সত্যিই আমি বড় অল্পে ভয় পেয়ে যাই। কৌশিক, বাবাইরা ঠিকই বলে বোধ হয় যে, আমার হার্টে নিশ্চিত কোনও গলতি রয়ে গেছে জন্ম থেকেই।

॥৩॥

কী একটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। রাতে শুতে যাওয়ার সময় তেলের লণ্ঠনটা নিভিয়ে শুয়েছিলাম আমরা। চোখ মেলতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আলোটা জ্বলছে। এত রাতে আলো জ্বালল কে? ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। আর কী আশ্চর্য, উঠে বসে দেখলাম, বাবাই আর কৌশিক স্থাণুর মতো বসে আছে ওদের বিছানায়। লণ্ঠনের আবছা আলোয় কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওদের। রাত কত দেখার জন্য মাথার বালিশের পাশ থেকে আমার হাতঘড়িটা বের করলাম। রেডিয়াম লাগানো হাতঘড়ি জানাল তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। আমি হতভম্বের মতো জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?" কৌশিক, বাবাই দু'জনেই যেন আমার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল আমাকে। আমি ওদের কাছে গিয়ে বসতেই চাপা গলায় বাবাই বলল, "কান খাড়া কর। চেষ্টা করে দ্যাখ একটা শব্দ শুনতে পাস কি না।"

আমি একটু চেষ্টা করতেই একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। ঝুম, ঝুম, ঝুম, ঝুম। কে যেন পায়ে নূপুর পরে সিঁড়ি দিয়ে উপর দিকে উঠছে আস্তে-আস্তে।

"ওই যে, ওই যে," উত্তেজিত গলায় আমি বলি।

"শুনেছি," একটু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে কৌশিক।

"আওয়াজটা কিসের বল তো?" দ্বিধাজড়িত গলায় জিজ্ঞেস করি আমি।

"কী মনে হচ্ছে তোর?" বাবাই জিজ্ঞেস করে। ওর গলাতেও যেন একটু হাল্‌কা উত্তেজনার ছোঁয়া।

"কে যেন হাঁটছে।"

"আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে।"

"আওয়াজটা কখন থেকে শুনছিস তোরা?"

"অনেকক্ষণ থেকে। কে যেন আমাদেরই জানলার পাশ দিয়ে হেঁটে উঠোনে উঠে বারান্দা টপকে সিঁড়ি পর্যন্ত এল, আস্তে-আস্তে হাঁটতে-হাঁটতে।"

"কে হাঁটছে, দেখতে পেলি কাউকে?"

"নাঃ।"

"তা হলে কি যা শুনে এসেছি সেই কথাটাই সত্যি নাকি?" ভয়ে-ভয়ে বলি আমি।

"হয়তো। তবে আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়," কৌশিক গম্ভীর গলায় বলে।

"এখনও?" আমি ঠাট্টা করে বলি।

"এখনও," কৌশিক আরও দৃঢ় গলায় বলে।

"তা হলে চল, বাইরে বেরিয়ে দেখি একবার ঘটনাটা ঠিক কী?" বাবাই উঠে দাঁড়িয়ে বলে কৌশিককে।

"বলিস কী, মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোদের?" আমি বলি, "এ অবস্থায় বাইরে বেরোবি কোথায়?"

"তুই তা হলে বোস ঘরে, আমি দেখে আসছি," বলে উঠে পড়ল কৌশিক।

কৌশিককে উঠতে দেখে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম একলাফে। এই ঘরের মধ্যে একা-একা থাকার কোনও মানেই হয় না। কাজেই দরজা খুলে আমিও বেরিয়ে পড়লাম ওদের সঙ্গে। বারান্দা, সিঁড়ি কোথাও কোনও পায়ের শব্দ পাওয়া গেল না আর। দেখতেও পাওয়া গেল না কাউকে।

হরিপ্রসাদের ঘরের সামনে গিয়ে দেখা গেল দরজা বন্ধ। ঘরের মধ্যে থেকে নাক ডাকার আওয়াজ আসছে তার। কৌশিক দরজায় ধাক্কা মেরে ডাক দিল, "হরিদা, হরিদা।"

খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর হরিদা দরজা খুলল। আমাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভারী অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনারা এত রাতে?"

"এখান দিয়ে একটু আগে কাউকে হেঁটে যেতে শুনেছ হরিদা?" বাবাই জিজ্ঞেস করল উত্তেজিত কণ্ঠে।

একবার আপাদমস্তক দেখে নিল আমাদের হরিদা। তারপর কঠিন এবং ঠান্ডা গলায় বলে উঠল, "ও আওয়াজ গত তিরিশ বছর ধরে শুনে আসছি দাদারা। ও নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। তোমরাও ঘামিও না। চুপচাপ শুয়ে পড়ো ঘরে গিয়ে। ভোর হতে এখনও দেরি আছে খানিক।"

ঘরে আমরা ফিরলাম বটে। কিন্তু ঘুম হল না একটুও। বিছানার উপর এপাশ-ওপাশ করতে-করতে একসময় পুবের জানলার ওদিককার আকাশ লাল হয়ে উঠল। তারপর ছাই-ছাই অন্ধকার সরিয়ে সূর্যের আলো ফুটতে শুরু করল ধীরে-ধীরে।

ট্রেনের জানলায় মাথা রেখে চুপচাপ বসে আছে কৌশিক। বাবাই মাথাটাকে এলিয়ে দিয়েছে পিছনের দেওয়ালে। আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরের নীল আকাশের দিকে, যে আকাশ অনন্ত, অসীম। মৃত্যুর পরে ওই আকাশেই হারিয়ে যেতে হয়? নাকি সকলকেই ফিরে-ফিরে আসতে হয় আপনজনের টানে, পূর্ব জীবন ঘিরে থাকা যাবতীয় চিহ্ন ও স্মৃতির টানে। কে জানে এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কী! কৌশিক বা বাবাই এখন কী ভাবছে জানি না, তবে এই সত্যিটুকু বোধ হয় আর ওদের স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, শুধু গায়ের জোর আর গোঁয়ার্তুমি দিয়ে এই পৃথিবীর হাজারও রহস্যকে, দীর্ঘলালিত ভয় আর বিশ্বাসকে এক লহমায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নারায়ণগঞ্জে প্রথম রাতের আতঙ্ক কেটে গিয়ে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি ওদের ফিরে আসার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তখন আমার কথা শুনলে এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ঝড় আমাদের সামলাতে হত না। কিন্তু এ বোধ হয় দৈবেরই লিখন। ঈশ্বর স্বয়ং বুঝি চেয়েছিলেন যে, ওদের দর্প চূর্ণ হোক। তাই ওদের এই বুদ্ধিভ্রম। আমার কোনও কথা, কোনও যুক্তিকেই আমল না দিয়ে শুধুমাত্র জেদ করে থেকে গেল ওরা ওই মৃত্যুপুরীতে আরও একটা দিন!

দিনেরবেলাটা ভালই কাটল আমাদের ঘুরে বেড়িয়ে, গল্পগুজবে। খাওয়াদাওয়ারও খামতি ছিল না কোনও। আর হরিদার রান্নার হাতটা চমৎকার। তবে একটা ব্যাপার দুপুর থেকেই কেমন যেন খটকা লেগেছিল আমাদের মনে। হরিদা যেন বড় বেশি গম্ভীর আজ! খটকাটা চরমে উঠল যখন সন্ধে হতে না-হতেই খাবারদাবার নিয়ে আমদের ঘরে ঢুকল হরিদা।

আমরা অবাক হয়ে বললাম, "এত তাড়াতাড়ি রাতের খাবার কেন হরিদা? তুমি কি যাবে কোথাও?"

"না," গম্ভীর গলায় উত্তর দিল হরিদা।

"তা হলে?"

"আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ো একদম।"

"কেন?"

"কারণ আছে।"

"কী কারণ?"

"ওঃ, বলছি তো আছে একটা কারণ আছে!"

"আমাদের বলতেই হবে, না হলে খাব না আমরা এখন। সবাই মিলে ছাদে উঠে বসে থাকব।"

"কোথায়?" যেন আগুন খেলে গেল হরিদার চোখে।

"ছাদে," খুব শান্ত গলায় বলল কৌশিক।

"খবরদার," চিৎকার করে উঠল হরিদা, "সিঁড়ির আশপাশেও যাবে না আজ কেউ তোমরা।"

"কেন?"

"আমি বলব না।"

"তা হলে আমরা যাব।"

"আজকের দিনে ওঁরা বাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আজই ওঁরা চলে গিয়েছিলেন কিনা, বাবুকে ছেড়ে দিয়ে।"

"কারা?"



নারায়ণগঞ্জে দু'রাত

"বাবুর স্ত্রী আর তুলি দিদিমণি।"

"তুলি দিদিমণি?"

"বাবুর মেয়ে। ও মাঝে-মাঝেই এখানে আসে। ছোটাছুটি করে, খেলে বেড়ায়। কালও এসেছিল। আপনারা তো নিজের কানে শুনেছেন।"

"ওটা তোমার কারসাজি, বানানো।"

"না, না, না," বলতে-বলতে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল হরিপ্রসাদ, খাবারের জায়গাগুলো ঘরের মধ্যে রেখে দিয়ে।

রাত যত বাড়তে লাগল আমাদের উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার পারদও চড়তে লাগল ক্রমাগত। বাবাই আর কৌশিকের উত্তেজনার মাত্রাটা যেন কিছুটা বেশিই। নিজেদের সঙ্গেই বোধ হয় কী একটা লড়াই চলছে ওদের মনে। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। বাইরে অন্ধকার আরও গাঢ়, আরও জমাট। মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়ায় লণ্ঠনের আলো কেঁপে-কেঁপে উঠছে। আর সেই কাঁপনে ঘরের দেওয়ালে আমাদের তিনজনের আবছা ছায়াও কেঁপে-কেঁপে উঠছে এমনভাবে যে, নিজেরাই যেন আচমকা শিউরে-শিউরে উঠছি মাঝে-মাঝে। এভাবেই অপেক্ষায় আর উৎকণ্ঠায় পার হয়ে গেল দু'-তিন প্রহর। ক্রমশ ঘুম নামতে চাইল চোখের পাতায়। আমরাও ভাবছি বিছানায় গা এলিয়ে দেব কি না, এমন সময় রাতের নিথর নীরবতাকে খানখান করে ভেঙে দিয়ে সমস্বরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল তিন-চারটে কুকুর। সে চিৎকার এমনই তীব্র আর এমনই ভয়ানক যে, আমরা তিনজনই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম বিছানা থেকে নেমে। আর তারপরই কুকুরের সেই তীব্র ভয়ংকর কান্নার রোল বাতাসে মিলিয়ে যেতে না-যেতেই শুরু হল সেই অপার্থিব পদধ্বনি। মৃদু অথচ স্পষ্ট। ঝুম, ঝুম, ঝুম, ঝুম। আমাদের দরজা পেরিয়ে বারান্দায় দু'-একবার হাল্‌কা পদচারণার পর সেই শব্দ ক্রমশ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকল উপরে। আরও উপরে।

মুহূর্তে কেমন যেন থমথমে হয়ে উঠল সমগ্র প্রকৃতি। হাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে গুমোট হয়ে উঠল ঘরের মধ্যেটাও। এমনকী, বাইরে তিরতির করে বয়ে চলা নদীটাও যেন ভয়ে গুটিয়ে নিল তার জলস্রোত। সমগ্র চরাচরে ওই একটানা ঝুম-ঝুম আওয়াজ ছাড়া যেন শব্দ নেই আর।

নিজের ব্যাগ খুলে একটা টর্চ হাতে নিয়ে চকিতে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল কৌশিক। পিছন-পিছন আমি আর বাবাই।

সিঁড়ির উপর টর্চের আলো ফেলল কৌশিক। কেউ নেই সেখানে। অথচ সেই ঝুম-ঝুম আওয়াজের কোনও বিরতি নেই। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকি আমরা। দোতলায় উঠে অবনীবাবুর ঘরের দিকেও চোখ বোলাই একবার। ঘর বন্ধ। কোনও শব্দ নেই বন্ধ ঘরের ওপারে। অবনীবাবু কি ঘুমোচ্ছেন? কত কিছু ঘটে যাচ্ছে এখানে, তার কিছুই কি আঁচ করতে পারছেন না তিনি? বাবাই হঠাৎ একটা আলতো চাপ দেয় আমার কাঁধে। আমি দাঁড়াই। শব্দ শুনি। সেই নূপুরপরা পা দু'খানা এখন খেলে বেড়াচ্ছে ছাদের উপর। আমরা ছাদের কাছাকাছি পৌঁছতেই একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর ছিটকে এল উপর থেকে, "তুলি, তুলি শিগগির এসো।"

আমরা ছাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজা ভেজানো। খিল দেওয়া নেই তাতে। একটা দরজা ফাঁক করে আমরা চোখ রাখলাম ছাদে। তখন চাঁদ উঠেছে আকাশে। জোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ছাদ। আর সেই জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখলাম আমরা একটা ছোট্ট মেয়েকে। পায়ে তার মল। পরনে লাল টুকটুকে ফ্রক। সে খেলছে, ছুটে বেড়াচ্ছে ছাদের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। হঠাৎ আর-একজন মহিলা মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে ধমক লাগালেন তাঁকে, "তুলি, দুষ্টুমি নয়, বাবা বকবেন।"

"কোথায় বাবা?" বলে খিলখিল করে হেসে উঠল তুলি।

"এই তো আমি এসে গেছি মামণি," বলে যে লোকটি তুলির সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখে আমরা তিনজনই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। ইনি তো অবনীবাবু! অথচ এ কী করে সম্ভব! তিনি যে প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত রোগজীর্ণ মানুষ। তুলি ছুটছে। ঝুমঝুম করে বাজছে তার পায়ের নূপুর। অবনীবাবুও ছুটছেন, তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে। ছুটতে-ছুটতে তুলি এখন ছাদের কিনারে। অবনীবাবুও দাঁড়াচ্ছেন না। কী সর্বনাশ, পড়ে যাবেন যে উনি ছাদের আলসে পেরিয়ে। সব ভুলে চিৎকার করে উঠলাম আমরা একসঙ্গে, "অবনীজেঠু।"

মুহূর্তে থেমে গেল দৌড়। তুলিকে বুকে চেপে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিলেন অবনীবাবু। আর সেই মহিলা হা, হা, হা, হা করে হাসতে-হাসতে মুখ ফেরালেন আমাদের দিকে। ওঃ কী বীভৎস সেই দৃষ্টি! কী ভীষণ কুৎসিত পচা-গলা আগুনে ঝলসানো সেই মুখাবয়ব। প্রচণ্ড ভয়ে চিৎকার করতে-করতে দুদ্দাড় করে নীচে নেমে আমরা অবনীবাবুর ঘরের সামনে দাঁড়াই। দম নিই বুক ভরে। বাবাই টোকা মারে দরজায়। দরজা খুলে যায় খটাং করে আওয়াজ তুলে পাল্লায়। ঘরের মধ্যে ঢুকে আরও ঘাবড়ে যাই আমরা। পুবের আকাশ থেকে ছিটকে আসা হাল্‌কা গোলাপি আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মস্ত খাটে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়ে শুয়ে আছেন অবনীজেঠু। চোখ বোজা। মুখের ভাব প্রশান্ত। এমনকী, ঠোঁটের কোণে একটা হাল্‌কা হাসির ছোঁয়াও লেগে রয়েছে যেন। দিশেহারা হয়ে চিৎকার করতে থাকি আমরা, "হরিদা, হরিদা।" হাঁকাহাঁকিতে একটু পরেই দৌড়ে আসে হরিপ্রসাদ। আমাদের হাত ধরে এনে বসায় নীচের ঘরে। ভিতরের আলো আর-একটু উজ্জ্বল হতেই মধুডাক্তারকে ডেকে আনে হরিদা। মধুডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রায় দেন, অবনীজেঠুর মৃত্যু হয়েছে অন্তত ছ'সাত ঘণ্টা আগে।

ব্যাগ গুছিয়ে চলে আসার সময় হরিদা সামনে এসে দাঁড়ায়। বিনয়ের সঙ্গে বলে, "সুপ্রিয়কে খবরটা দেবেন।"

আমরা বলি, "নিশ্চয়ই।"

হরিদা আরও বলে, "সময়সুযোগ পেলে আসবেন আবার— আমি তো রইলুম!"

হরিদার বলা সবক'টা কথাই কানে গিয়েছিল। কিন্তু এ-কথার কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি আমাদের কারও!

ছবি: কৌশিক কুণ্ডু

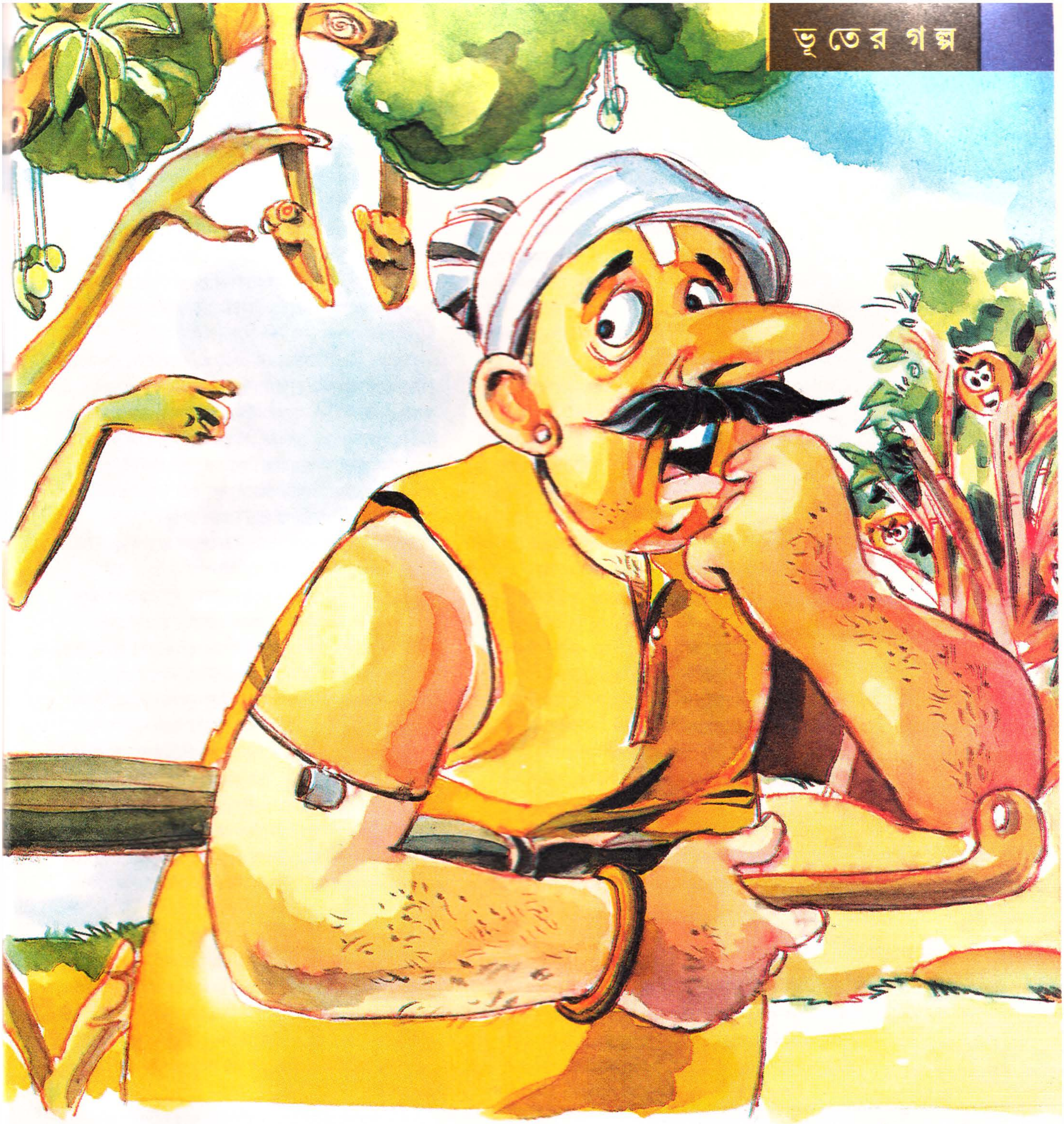
কুসুমডাঙার আমগাছ

বিপুল দাস



মিশিরজি 'জয় বজরংবলি' বলে একটা হুংকার ছাড়ল বটে, কিন্তু কেমন যেন ড্যাম্প-খাওয়া গলা। বর্ষাকালের বাইরে রাখা দেশলাই বাক্সের মতো নেতিয়ে পড়া। অথচ কুসুমডাঙায় মিশিরজির হুংকার হল গে শেষ কথা। কারও বাপের সাধ্যি নেই তার উপর রা কাড়ে। তা সে গোরু চুরির কেস বলো, আর ভূতপ্রেতের উপদ্রব বলো।

এই মিশিরজি না থাকলে কুসুমডাঙার লোক কবেই ফৌত হয়ে যেত। একা হাতে, মানে ওই আওয়াজ দিয়ে সব সামলেসুমলে রেখেছে। তা এত বড় একটা গাঁ-গেরাম, সব কি আর পারা যায়! ছোটখাটো উপদ্রব লেগেই আছে। সেসব কুসুমডাঙার লোকজনের গাসওয়া হয়ে গেছে। ভগীরথের বাড়ির লাউ সতু বিশ্বাস খাবে, কিংবা উঠোনের এক কোণে বেঁধে রাখা পুরুষ্টু পাঁঠা এই আছে এই নেই— এ কোনও বড় কথা নয়। ওটুকু হাতের কাজ দেখাতে না পারলে আর কুসুমডাঙায় থাকা কেন! গাঁয়ের ইজ্জত বলেও তো একটা কথা আছে! এই তো গতবার শীতে পঞ্চায়েত অফিসের পাশের মাঠে কলকাতার ম্যাজিশিয়ান এল। জাদুকর পি বি সরখেল। হ্যান্ডবিলে, ফেস্টুনে ছয়লাপ। ম্যাজিশিয়ানের পুরো



নাম কী হতে পারে, সে নিয়ে অনন্ত দাসের সঙ্গে কুমুদ প্রামাণিকের ঝগড়া শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে গড়াল। মিশিরজির কণ্ঠক্ষেপে ঝগড়া থামে।

তা সে সরখেলি ম্যাজিক দেখতে কুসুমডাঙা ভেঙে পড়ল। টুকটাক তাসের ম্যাজিক, টুপির ভিতর থেকে পায়রা, এসব হাবিজাবি খেলা দেখানোর পর দর্শকদের ভিতর থেকে একজনকে ম্যাজিশিয়ান স্টেজে ডাকল। কেউ আর এগোয় না। শেষে সামনের সারিতে বসে-থাকা গোলোক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ছানার কারিগর তারক ঘোষকে ম্যাজিশিয়ান আঙুল দিয়ে ইশারা করল। তারক আবার মুন্ডু ঘুরিয়ে পিছনে দেখল। লাভ হল না। সবাই ঠেলেঠুলে তাকেই পাঠিয়ে দিল। তারক কিছুক্ষণ পাবলিকের দিকে তাকিয়ে বোকার হাসি হেসে স্টেজে উঠে পড়ল। তার হাতের ঘড়ি খুলে নিয়ে সকলের চোখের সামনে টপ করে গিলে ফেলল ম্যাজিশিয়ান। তারপর পুরো একগ্লাস জল খেল। তারক ঘোষ আবার সকলের দিকে তাকিয়ে দাঁত ছড়িয়ে হাসল। একবার ম্যাজিশিয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল, "শ্বশুরমশাই দিয়েছিল!"

ম্যাজিশিয়ান তারকের মুন্ডুটা টেনে এনে তার ভুঁড়ির উপর

চেপে ধরে বলল, "শুনতে পাচ্ছেন? একটু পরে আর শোনা যাবে না। বিলকুল হজম হয়ে যাবে। একবার আসানসোলে বাহান্নটা বল্টু খেয়েছিলাম। পুরো হজম হতে বাহান্ন মিনিট সময় লেগেছিল। বিশ্বাস হয় না? এই যে ম্যাগনেট, আমার বডিতে লাগিয়ে ছেড়ে দিন, ঝুলে থাকবে। ওখানকার কিছু মাফিয়া দলে নিতে চেয়েছিল। যাইনি। আমি তো আসলে শিল্পী। কলাকার।"

তারক ঘোষ পরে বলল যে, মা মনসার দিব্যি, সে পষ্ট লোকটার পেটে ঘড়ির ডাক শুনেছে। ঠিক টিক টিক নয়, কেমন যেন ঘমঘম আওয়াজ হচ্ছিল। কিন্তু ঝামেলা শুরু হল একটু পরেই। বিশাল একটা ঢেকুর তুলে সেই জাদুকর ভানুমতীর নামে একটা ছড়া কেটে ঘড়ি বের করে আনল স্টেজের একেবারে কোণে রাখা একটা ইস্টিলের বাক্সের তালা খুলে। খুব একটা হাততালি পড়ল না। কুচোকাঁচারা একটু তালি মারল শুধু।

তারক ঘোষ তার জায়গায় এসে বসল। একটু পরেই দেখা গেল ম্যাজিশিয়ান কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভেলভেটের লম্বা জামা, মাথায় শলমা চুমকি বসানো তাজ, সব খুলে ফেলে আতিপাতি করে কী যেন খোঁজে। পুরনো লোকজন আগেই সন্দেহ করেছিল, এবার কনফার্ম হয়। শাবাশ তারক। কুসুমডাঙার ইজ্জত রেখেছে বটে! তারা ম্যাজিশিয়ানের ল্যাজে-গোবরে অবস্থা দেখে আপন মনেই বলে, 'বলিহারি তারক, মোক্ষম তুরুম ঠুকে দিয়েছিস তুই!'

জাদুরাজ চক্রবর্তী (ভোপাল), পি বি সরখেল (সিনিয়র) 'অনিবার্য কারণবশত অদ্য শো বন্ধ থাকিবে' ঘোষণা করলে মহাগন্ডগোল শুরু হয়ে গেল। মিশিরজি কেস ধরে ফেলেছিল। স্টেজে উঠে একখানা বাজখাঁই আওয়াজ ছেড়ে প্রথমে হট্টগোল থামায় এবং অ-মাইক গলায় জানিয়ে দেয়, শো চালু থাকবে। তারপর নেমে এসে তারক ঘোষকে বাইরে অন্ধকারে ছাতিমতলায় নিয়ে আর-একটা সিংহনাদ ছাড়ে। তখন তারকও গলা ছাড়ল।

"আমার শ্বশুরমশাই-এর দেওয়া ঘড়ি! কাচের উপর দাগ ফেলে দিল কেন?"

"ঠিক আছে। কিন্তু তুমি শো বন্ধ কোরতে পার না। মিথা কোথা বলছিস কাহে। এ রিস্টবাচ শ্বশুর দিল, কি তু চড়কমেলায় জোগাড় করলি, সোবাই জানে।"

"আর এটাকে ও শিল্প বলে কোন সাহসে। কলাকার? কলার শিল্পী। এই নেন। শিল্প অন্য জিনিস।"

পকেট থেকে ম্যাজিশিয়ানের যাবতীয় কলকব্জা, সিন্দুক, বাক্সের মাস্টার-কি বের করে মিশিরজির হাতে ফেরত দিল তারক ঘোষ। তারপর ম্যাজিক চালু হল বটে, কিন্তু তেমন জমল না। কেমন যেন ভয়ে-ভয়ে তাড়াহুড়ো করে সরখেলমশাই খেলা শেষ করল।

তো এই হল কুসুমডাঙা। এ গাঁয়ের লোক অন্য গাঁয়ের হাটে গেলে লোকজন চোখে-চোখে রাখে। ধুতি চাইলে গামছা দেখায়। একবার কুসুমডাঙায় বেদের দল তাঁবু ফেলেছিল। দিন তিনেক বাদেই ওরা বাধ্য হয় তাঁবু গুটিয়ে ফেলতে। গাঁয়ের কাচ্চাবাচ্চা বুড়োধাড়িদের দিনরাত ভিড় লেগে থাকত ওদের তাঁবুর আনাচেকানাচে। ঘটি-বাটি, তাবিজ-কবচ, মায় ওদের একটা লোমওয়ালা বাঘা কুত্তা বেমালুম গায়েব হয়ে গেল। এ আশ্চর্য ভোজবাজি দেখে ওরা লজ্জায়, ঘেন্নায় তিনদিনের মাথায় তাঁবু গুটিয়ে নীল দিগন্তে উধাও হয়ে গেল। হেডমাস্টারের ছোট ছেলে কলকাতা থেকে ফিরে এসে ঘটনা শুনে বলল যে, "শিওর, এ ঘটনা নিয়েই একটা ইংরেজি সিনেমা হয়েছে।"

ইদানীং মিশিরজির বাজার একটু মন্দা চলছিল। কুসুমডাঙা সেই আগের কুসুমডাঙা নেই। বেশ একটা গঞ্জ-গঞ্জ ভাব এসেছে। সোনামণির খালের উপর পাকা কালভার্ট হয়ে গেল। দীনবন্ধু সাহা সারের দোকান দিয়েছে। অম্বুজা সেন সিমেন্ট দিয়ে মনসাতলা বাঁধিয়ে দিল। জাগ্রত সংঘের কালী পুজোয় লাইটিং-এ পদ্মের পাপড়ি খোলে, বন্ধ হয়। কুমুদ প্রামাণিক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারিতে পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে। মিশিরজির রবরবা কেমন যেন ন্যাতপেতে হয়ে পড়ছিল। উঠতি বয়সের ছেলেরা তো গ্রাহ্যিই করে না।

শুধু উঠতিরাই বা হবে কেন! পুরনো দু'-চারজনও মনে-মনে এতকাল তার মুন্ডুপাত করে এসেছে। হতে পারে মিশিরজি ধার্মিক লোক। কথায়-কথায় তুলসীদাসী বচন ঝাড়ে, এমনকী, রবি ঠাকুরের ছড়াও দু'-একসময় বলতে শোনা গেছে। তা হলে কী হয়, আদতে সে কুসুমডাঙার লোকই না। মহানন্দা ঘাটের ইজারা নিয়ে এখানে ঠাঁই গাড়ল। ব্যস, যেন শিকড় চারিয়ে দিল কুসুমডাঙায়। নতুন ব্রিজ হল, ঘাট উঠে গেল, মিশিরজি উঠল না। শুরু হল তার হোমিওপ্যাথি আর সমাজসেবা। "চোরি করা পাপ আছে, ভগ্‌মান উপর থিক্যে সব কুছ দেখতে আছে। মানুষকে সেবা কোরলে পুন হোয়। চণ্ডীদাস শুনো, সোবার উপ্‌রে মানুষ সচ্‌ হায়, তাহার উপ্‌রে নাই।" দিনরাত এসব হাবিজাবি বলে কুসুমডাঙার মানুষের পিত্তিনাড়ি একেবারে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

সত্য বিশ্বাস পাক্কা ছ' মাস জেলে ঘানি টেনেছে এই মিসিরজির জন্য। একবার যদি মিশিরজি মুখ ফুটে পুলিশের কাছে বলত যে, সে রাতে সতুকে লেপতোশক মাথায় নিয়ে যেতে দ্যাখেনি, তবে আর কেস দাঁড়ায় না। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের মতো পুলিশকে বলে দিল, "হাঁ, সোতুই হোবে। আপাহিজ আদমি, আন্ধারমেও পষ্ট বুঝা যায়। মাথায় সামান ছিল।"

সতু অনেক চোখের ইশারাটিসারা করে মিশিরজিকে সামলানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার তখন অন্য রকম আনন্দ। এবার সতুকে সংশোধন করা যাবে, এই খুশিতে তখন সতু, সতু না হলেও সতু।

তবে কাজটা সতু বিশ্বাস ভাল করেনি। হতে পারে দূর সম্পর্কের শ্যালক। তারই জিনিসপত্র তুই ঝেড়ে দিবি! শ্যালকবাবু তার বোনের বিয়ের জন্য নতুন লেপতোশক আর মশারি কিনে পরদিন ভোরে জিনিসপত্র গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে আরও ভিতরে, তা প্রায় সাত-আট মাইল দূরে বড় শিমুলতলিতে ফিরে যাবে। রাতটা জামাইবাবুর বাড়িতে



কুসুমডাঙার আমগাছ

থাকবে বলে সেই নতুন বিছানা পেতে, মশারি টাঙিয়ে শুয়ে ছিল। এ গাঁয়ের বদনাম সে বিলক্ষণ জানত। মনে হয়, সেজন্যই নতুন জিনিসের উপরে গ্যাঁট হয়ে শুয়ে পড়েছিল। ভোরের দিকে অন্ধকার-অন্ধকার থাকতেই একবার প্রাঃতকৃত্য সারতে বদনা নিয়ে মাঠে গিয়েছিল। ফিরে এসে ঘুমচোখে ফল্‌স মশারি তুলে ধপাস করে শুয়েই দ্যাখে, ভূমিশয্যা।

সতু যে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে এ কাজ করেছে, তা নয়। শ্যালকবাবু উঠে বাইরে গেলে সেই অন্ধকারে তার শরীর কেমন যেন আনচান করে উঠল। জ্বর-জ্বর ভাব। দুটো চোঁয়া ঢেকুর উঠল। বার-তিথি-টাইম হিসেব কষে দেখল, একদম খাপে-খাপে মিলে যাচ্ছে। তবে আর দেরি কিসের! গুরুদেব ভুজঙ্গ ঢালির নাম স্মরণ করে সতু অ্যাকশন করে ফেলেছিল।

শ্যালকবাবু ছাড় দেয়নি। সতুর নামেই নালিশ ঠুকেছে। আর মিশিরজি যে তাকে ওই শেষ রাতে দেখতে পেয়েছিল, তা কে জানে! বাঁ পা টা একটু টেনে হাঁটে সতু। তাতেই আরও চিত্তির। ভগবান যাকে মারে, সবদিক দিয়েই মারে।

গাঁয়ে সতুর মতো আরও দু'-চারজন ছিল, যারা মিশিরজির এখনকার হেনস্থায় যারপরনাই সুখ পায়। তার গলার ব্যাটারি ডাউন এবং বাসস্ট্যান্ডের পাশে একটা পি সি ও বুথ, আর-একটা এগ রোলের দোকান হওয়ার পর পাবলিক এখন আর তাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না। এর মাঝে একদিন সন্ধেরাত্তিরে মনসাতলায় আমগাছের মগডাল ভেঙে সতু সোজা মাটিতে পড়ল। ভুঁই-এর টানে পাকা আপেল পর্যন্ত মাটিতে নেমে আসে, আর শরীরের মধ্যে মাথা হল গে ভারী বস্তু, সেটাই আগে মাটিতে পড়ল। ঘাড় মটকে সতু সঙ্গে-সঙ্গে মরে গেল। তারপর শুরু হল আসল খেল!

সতু সেদিন দুপুরে ভরা হাটের ভিতরে এদিক-সেদিক ঘুরতে-ঘুরতে সময়মতো একমুঠো কদমা, একটা পাকা পেঁপে, একটা গামছা সরিয়েছে। চটপট মনসাতলায় গিয়ে সেসব সামগ্রী বড় আমগাছের হাতদশেক উপরে মোটা ডালের ফাটা গর্তে লুকিয়ে রেখেছে। বিকেলের দিকে আর-এক খেপ মারার জন্য ফিরে এসে দেখল, হাট কেমন মরা-মরা। উপরন্তু কিছু উটকো লোকজনকে হাটের মাঝে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তার কেমন ধন্দ লাগল। এরা মোটেই হাটুরে লোকজন নয়। সতু ভালমানুষের মতো সরে পড়ল।

ঠিক সাঁঝের ঝোঁকে ঘুরপথে মনসাতলায় পৌঁছল সতু। বিকেল একটু গড়ালে মনসাতলার ত্রিসীমানায় কেউ আসে না। এই আমগাছ যেন কুসুমডাঙার দুঃখী মানুষজনের মৃত্যুর মৌরসি পাট্টা হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হলেই দু'জন দু'জনকে চোখে-চোখে রাখে। 'যাচ্ছি আমি মনসাতলায়' বললেই ঝগড়া আপসে মিটে যায়।

সতুর এতে বেশ সুবিধে হয়েছে। সটকানো জিনিস প্রায় সময়ই এ-গাছের উপর সে লুকিয়ে রেখেছে। আজ কিন্তু বিকেলের পর থেকেই তার মন বড় কু গাইছিল। হাটে এত ভিনদেশি মানুষজনের আনাগোনা, তার উপর হরিরামের দোকান থেকে যখন একটুর জন্য এক শিশি তরল আলতা তার হাত ফস্‌কে গেল, তখনই সে বুঝেছিল স্কন্ধে তার বারঠাকুরের নজর পড়েছে। কিছু একটা না ঘটে যায় না।

সুয্যি তখন অস্ত গেছে। গাঁয়ের কোনও ডাকাবুকোর এমন সাহস নেই যে, এখন মনসাতলায় আসে! সন্ধের পর মনসাতলায় আমগাছের তলা দিয়ে যাবে, এমন কথা কেউ ভুলেও ভাবে না। টিপিস-টিপিস করে জোনাকিগুলো জ্বলছে-নিভছে। একটা ছুঁচো দৌড়ে গেল। গোবদা লেজ ঝুলিয়ে একটা শিয়াল ছুঁচোটাকে দেখল। আমগাছের তে-ডালায় বসে এসব দৃশ্য দেখতে সতুর যে কী আনন্দ হয়! বিধাতা কত জীব পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে। যে যার মতো করে-কম্মে খাচ্ছে। আহা, বেঁচে থাক তোরা।

পেঁপে না কদমা, কোনটা আগে খাওয়া উচিত, এ-নিয়ে সতু মনস্থির করতে পারছিল না। তখন হঠাৎ সতু দেখল, জনাসাতেকের একটা দল চাপা আওয়াজে কথা বলতে-বলতে এদিকেই আসছে। সতু মুহূর্তের মধ্যে গিরগিটির মতো গাছের ডালের সঙ্গে মিশে রইল। সতু বিশ্বাস অন্ধকারে খারাপ দ্যাখে না। গুনে দেখল, সাতজন। উপর থেকে কান খাড়া করে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগল সে।

সর্বনাশ। এরা তো সেই কালুর দল। এক-এক করে রামদা, সড়কি, মশাল সব বেরোচ্ছে। সর্দার সিগারেট ধরাল। বাকি চারজন বিড়ি, একজন খইনি। বৃন্দাবন সাহার কাল মেয়ের বিয়ে। আজ তার সর্বস্ব লুট করবে কালুর দল। সব শুনতে পাচ্ছিল সতু।

"সর্দার, খবর সব ঠিক তো? তোমার বিরিঞ্চি ভুল খবর দিলে কিন্তু সব গন্ডগোল হয়ে যাবে!"

"তুই থাম তো। বিরিঞ্চি আমাগের নিজির লোক। এক বছর ধরে ও বাড়িতে রইছে। সব খুঁটিনাটি ডেলি রিপোর্ট করিছে। কর্তার আমাশা আছে। গিন্নি দোক্তা খায়। যে মেয়ের বিয়ে সে রাত্তিরবেলা রুটি খায়। চত্তির মাসে কুয়োর জল থাকে না।"

"সর্দার, বেরোতে তো এখনও অনেক দেরি। কেমন যেন খিদে-খিদে পাচ্ছে। প্রসাদী সন্দেশগুলো এখন খেয়ে নিলেই হত!"

"চোপ। হাটে বসে একগাদা জিলেপি আর শিঙাড়া খাইছিস। আবার খিদে!"

"উঁ, সাতবাসি শিঙাড়া।"

"যা, আমগাছটায় উঠে দ্যাখ। জষ্টি মাস, তোর জন্যে টুসটুসে পাকা আম ঝুলে রয়েছে!"

এখন সতু দেখল ভারী বিপদ। সত্যি যদি পাকা আমের খোঁজে গাছে ওঠে, তবে তার হয়ে গেল! তখন তার মাথায় যুগান্তকারী বুদ্ধি বিদ্যুতের মতো ঝিলিক মেরে উঠল। হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে গোটাসাতেক পাকা আম ছিঁড়ে নিল। তারপর এক-এক করে সাতটা আম টুপ-টুপ করে নীচে ফেলে দিল।

এ গাছের আম পেকে মাটিতে পড়ে পচে যায়। কেউ কুড়োতেও আসে না। এ গাছের আম খাওয়ার কথা কুসুমডাঙার কোনও মানুষ ভুলেও ভাবে না। তা যে শুধু ভয়ে, তা নয়। আতঙ্কও আছে। উন্মাদ হয়ে যাওয়ার চান্সও আছে। একবার নাকি একটা কাক ভুল করে টসটসে পাকা হলুদ আমে

ঠোকর দিয়েছিল। সেটাই ছিল পৃথিবীর প্রথম পাগল কাক। কয়েকদিন নাকি কা-কা না বলে যা-যা বলে লোকজনকে গলার ভিতরটা দেখাত। মিশিরজি বলেছিল, "কৌয়াদেরও টনসিল থাকে। সায়দ টনসিলে ঘা আছে।"

এদিকে সামান্য হাওয়া উঠেছিল। আমগুলো মাটিতে পড়তেই ওরা প্রথমে একটু থমকে গেলেও পরে আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেনি। মায়ের আশীর্বাদ মনে করে কুড়িয়ে এনে সকলেই প্রায় একসঙ্গে মুখে দিয়েছে। বিশেষত হাওয়া দিচ্ছিল, পাকা আম খসে পড়তে পারে। প্রথমে আর্তনাদ করে উঠল স্বয়ং কালু।

"বাবা রে, গিছি রে!"

তখন সেই আমতলায় একটা ভয়ংকর হইচই শুরু হয়ে গেল। সাত ডাকাতের মরণ-আর্তনাদ, সঙ্গে উন্মাদ-নৃত্য। গাছের উপর থেকে এসব দেখে আনন্দে সতুর স্থান-কাল বিস্মরণ হয়ে গেল। একটা নরম ডালে পা পড়তেই মটাস এবং ধপাস। ঘাড় মটকে সতু বিশ্বাস সঙ্গে-সঙ্গে মরে গেল।

এদিকে মনসাতলায় গন্ডগোল শুনে লোকজন প্রথমে এককাট্টা হয়। শেষে একটু-একটু করে এগোতে-এগোতে শেষমেশ দ্যাখে রামদা, সড়কি, ভোজালি, মশাল। চার ডাকাত অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তিনজনের মুখে গ্যাজলা, চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যায়, আতঙ্কে দিশেহারা। এক পাশে সতু মরে পড়ে আছে। সবাই বুঝতে পারল, সতু একা হাতে এই সাত ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে কুসুমডাঙাকে বাঁচানোর জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছে।

মট করে ডাল ভাঙতেই সতু প্রথমে কিছুক্ষণ বায়ুবন্ধনের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সবই ফসকে যাচ্ছিল তার হাত থেকে। শেষ পর্যন্ত ধপাস করে নীচে পড়ল। আত্মাটা বেরিয়ে একবার এ ডালে, একবার ও ডালে ঘোরাঘুরি করে শেষতক সড়াৎ করে তে-ডালের ফোকরে ঢুকে পড়ল। এসব সেই পুরনো দিনের কথা। গাঁয়ের সমস্ত লোকজন পরে জানতে পেরেছিল, সতু বিশ্বাস একা হাতে একদল ডাকাতকে কী এক অজানা অস্ত্রে ঘায়েল করে নিজে প্রাণ দিয়েছে। যতদিন গেছে, সতুর নামে একটা করে গল্প বাজারে চালু হয়েছে। রাতারাতি সতু চোর, বিপ্লবী সত্যেন বিশ্বাস হয়ে পড়ল। যত দিন যায়, ততই তার নাম চারদিকে ছড়াতে থাকে। সতু স্মৃতি পাঠাগার, সত্যেন লটারি সেন্টার, শহিদ সত্যেন নিবিড় মৎস্যচাষ প্রকল্প, সতু বিশ্বাস স্মৃতি হোমিও ক্লিনিক। শেষে কুসুমডাঙায় ছোট-বড় মিলিয়ে সাতচল্লিশটি শিশু-কিশোরের নাম 'সতু' হয়ে পড়লে পঞ্চায়েত থেকে উপরে প্রস্তাব পাঠানো হয় যে, 'অতঃপর কুসুমডাঙার নাম সতু বিশ্বাস নগর রাখা হউক।' নতুন বাসরুট চালু হল। পিচঢালা সড়ক। সতু বিশ্বাস সরণি।

এক-একটা অনুষ্ঠান হয়, তার আহ্লাদে ডগমগ হয়ে সতু এক বস্তা গুড়, এক বয়াম বাতাসা, এক ঠোঙা তিলের নাড়ু উড়িয়ে আনে। কুসুমডাঙা এখন আর শিয়াল-ডাকা গ্রাম নেই। কাপড়ের দোকান, বাসনের দোকান, দশকর্ম ভাণ্ডার, রাইস মিল, পাটগোলা, ইস্তক একজন ডাক্তারবাবু চেম্বার খুলেছেন। চারপাশ দেখেশুনে সতুর মনে বড় ফুর্তি আসে। গুড়ের বস্তায় পিঁপড়ে ধরেছে। আহা, খাচ্ছে খাক। তার তো প্রকৃতপক্ষে খাওয়া বলে কিছু নেই। ওই মিষ্টদ্রব্যের গন্ধ যা আসে, তাতেই আত্মা ভরে যায়। মরণের পর এই তো আসল জীবন।

হাটবাজার থেকে মাঝে-মাঝে জিনিসপত্তর উধাও হয়ে যাওয়া সবাই মোটামুটি মেনে নিয়েছে। যে লোকটা মরণের পরেও ভানুমতীর খেল দেখিয়ে যাচ্ছে, যে লোকটা নিজের জীবন দিয়ে ডাকাতের হাত থেকে কুসুমডাঙাকে রক্ষা করেছে, যে লোকটা গ্রামের সনাতন ঐতিহ্য তথা পরম্পরাকে যারা ভাঙতে চেয়েছিল, তাদের যথাযোগ্য শাস্তি দিয়ে চলেছে, তার আত্মার শান্তির জন্য দু'টো কদমা, কী এক তিজেল ঝোলাগুড় তো সামান্য ব্যাপার। গঞ্জের সমস্ত ব্যাপারিরা এক হয়ে সত্যেনাত্মা সন্তুষ্টি কমিটি গঠন করেছে। নিয়মিত চাঁদা জমা পড়ে। ওড়ানো জিনিস বাবদ এই ফান্ড থেকেই সাবসিডি দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ ভূতোৎপাটন মঞ্চ থেকে সম্পাদক আবির ঘোষ এসেছিল কুসুমডাঙার লোকজনকে বোঝাতে। পাবলিক তাকে গ্রামেই ঢুকতে দেয়নি। 'ও আমাদের ভূত, আমরা বুঝে নেব,' বলে তাকে চা খাইয়ে ফেরত ট্রেনে তুলে দিয়েছে।

শিরশিরে একটা হাওয়া উঠল। কয়েকটা শুকনো আমলকী পাতা সতুর সূক্ষ্ম শরীর ভেদ করে উড়তে-উড়তে মনসাতলা পার হয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল সতুর। এত সুখের মাঝেও একটা দুঃখ পিঁপড়ের মতো তার আত্মা কামড়ে ঝুলে আছে। হারামজাদা মিশিরজি নাকি কুসুমডাঙায় ইশকুল খুলেছে। গরিব ছেলেমেয়েদের আদর্শ শিক্ষা দিয়ে কুসুমডাঙাকে নাকি আদর্শ গ্রাম বানাবে। ইল্লি। লোকটার শয়তানি আর গেল না। কোন রাইস মিলের মারোয়াড়ি মালিক নাকি অনেক টাকা দিয়েছে। ঘরবাড়ি, লোহার আলমারি, চক-ডাস্টার। দিব্যি রমরমিয়ে নাকি ইশকুল চালু হয়ে গেছে। হেডমাস্টার রামনারায়ণ মিশ্র। হুঁ, হাতিঘোড়া গেল তল, মশা বোলতা কিত্না পানি। দেখাচ্ছি দাঁড়া।

ঠিক রাত ন'টা সাতচল্লিশ মিনিট। সতুর বাঁ দিক দিয়ে হুতোম প্যাঁচাটা উড়াল দিলে সতু বুঝল সময় হয়েছে। বাতাসে আত্মাটা ভাসিয়ে দিয়ে নেচে-নেচে মিশিরজির স্কুলের সামনে পৌঁছল। অফিস ঘরের দরজায় বড়-বড় দু'টো তালা। তাতে সতুর এখন আর কিছু আসে-যায় না। দরজার পাল্লা আর মেঝের মাঝখানে যে একচুল ফাঁক রয়েছে, সেখান দিয়ে দিব্যি সে গলে গেল। চেয়ারের পিছনে একটা নতুন আলমারি। চাবি গলানোর ফুটো দিয়ে সতু অক্লেশ ঢুকে পড়ল। তখনই অন্ধকারে প্রায় সব দেখতে পেত, এখন তো ঘুরঘুট্টি অন্ধকারেই ভাল দ্যাখে।

আলমারির সমস্ত কাগজপত্র ছিঁড়ে কুটিকুটি করে মিশিরজির চেয়ারের উপর একপোঁচ অদৃশ্য আলকাতরা লেপে দিল সতু। দেওয়ালঘড়ির কাঁটা দু'টো উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিল। এখন থেকে একটার পরে বারোটা বাজবে। শেষে রামনারায়ণ মিশ্র নামটা কেটে 'চাম ছাড়ায়ন বিশ্রী' লিখেটিখে ফিরে এল।



কুসুমডাঙার আমগাছ

॥ ২ ॥

সে রাতে সত্যিই সতু বিশ্বাসের মেজাজ ভাল ছিল না। আদর্শ শিক্ষানিকেতন ভাঙচুর করেও তাঁর আত্মা ঠান্ডা হচ্ছিল না। আমগাছের মধ্যিখানে তে-ডালের উপর বসে সতুর আত্মাটা রাগে দুঃখে নীল-নীল আভা দিচ্ছিল। লাড্ডুর গন্ধে চারদিক ম-ম। এমন সময় সতু দেখতে পেল, মিশিরজি হনহন করে এদিকেই আসছে। দেখেই তার অনেক দিনের পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। এ লোকটাই সাধুগিরি দেখিয়ে তাকে জেলের ঘানি টানিয়েছিল। এ লোকটাই কুসুমডাঙার লোকজনের অভ্যাস খারাপ করে দিচ্ছিল। শেষ বয়সে এসে আবার আদিখ্যেতা করে বিনে পয়সার ইশকুল খুলেছে। ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠন শেখাবে! হুঁ, বাপ-পিতেমো যে ধারায় জীবন কাটাল, সেই ধর্ম ত্যাগ করাই তো মহাপাপ। এই যে কুসুমডাঙা এখন এত বড় গঞ্জ, তবু ভুল করেও কেউ জামাকাপড় বাইরে শুকোতে দেয় না। কুসুমডাঙার ছেলে বাইরের গাঁয়ে বিয়ে করতে গেলে বরযাত্রীপিছু মেয়ের বাপ একজন লোক বহাল রাখে। এ কি কম গৌরবের কথা! আর কোথাকার যুধিষ্ঠির এসে যুগযুগান্তের নিয়মকানুন পালটে দেবে। ধম্মে সবে না রে মিশির!

মিশিরজি ধার্মিক লোক। ডাকাবুকোও বটে। হুংকার ছেড়ে একসময় কুসুমডাঙা বশে রেখেছে। দু'বেলা পুজোআচ্চা করে ঘরের বাইরে পা ফ্যালে। সতুচোর ক্রমে-ক্রমে শহিদ সতু হয়ে ওঠার ব্যাপারে তার ঘোরতর আপত্তি ছিল। কিন্তু হুজুগের ঠ্যালায় তার আপত্তি ধোপে টেকেনি। সতুর নামে এখানে-ওখানে কুচ্ছো গাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পাবলিক দেখা গেল সহ শহিদ সতুর পক্ষে। বিশেষ করে কড়া সিমেন্ট দিয়ে অম্বুজা আমতলা বাঁধিয়ে দেওয়ার পর নিজেই উদ্যোগ নিয়ে শহর থেকে রিপোর্টার ধরে এনেছিল। 'গ্রামরক্ষায় সতু বিশ্বাসের আত্মবলিদান' হেডিং দিয়ে খবর বেরিয়েছিল। মাঝে-মাঝে শহর থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী তাদের মাস্টারমশাইদের সঙ্গে আসে। নাকি এডুকেশনাল টুর। ছবি তোলে। সিমেন্টের চাঙড় খসিয়ে নিয়ে যায়। নিচু ডালের আমপাতা ছিঁড়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে থাকে। এখানে মিশিরজির কিছুই করার থাকে না।

মিশিরজি ধার্মিক মানুষ। গলায় জোর আছে। শরীরেও বেশ ভালই স্বাস্থ্যের আয়োজন। কিন্তু দু'টো দোষে বেচারা মার খেয়ে গেল। এক তো তার একা হাতে কুসুমডাঙা বাঁচাও আন্দোলন, দুই, ভূত-পিরেত-পিচাস-বরমদেও, এসব কিছুই সে মানে না। এসব নাকি মনের দুর্বলতা। সবল চিত্তের ধার্মিক মানুষের এসব বিশ্বাস করা উচিত নয়। আদমির মৌত হলে সে হয় স্বর্গে, না হয় নরকে যাবে। ব্যস, সোজা হিসেব। এর বাইরে আর যা কিছু, সব নাকি ছেলে-ডরানো কহানি। এসব কিছু এখন তার মনে পড়ে যাচ্ছিল।

আজ আমতলায় এসেই মিশিরজির কেমন যেন মনে হল। তুলসীদাসী রামায়ণের বাইরেও কী যেন একটা মনে হচ্ছে। আমগাছটা যথাস্থানে আছে, ভাঙাচোরা শহিদবেদিও অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবু কী যেন একটা অবাঞ্ছিত শব্দ কিড়ে-মাকড়ের মতো কবীরের দোঁহায় ঢুকে পড়ছে। আরও কাছাকাছি আসতেই মিশিরজির নাকের ডগা ফুলে উঠল। বাতাসে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গন্ধ। ভাল করে বাতাস টানল মিশিরজি। ঘিয়ে ভাজা লাড্ডুর গন্ধে আমতলা ভারী। শরীরে কেমন যেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। গুনগুন করে দু' লাইন দোঁহা আউড়ে একটু এগোতেই কড়া পাকের সন্দেশের গন্ধ। মিশিরজি চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠা মনে করার চেষ্টা করে দেখল, সবই ঠিকঠাক মনে আছে। তবে গন্ধ কেন?

মিশিরজিকে দেখার পর থেকেই সতুর আত্মার সেই দুখি-দুখি নীল আভাটা কেটে গিয়ে একটা ক্রূর হলুদ আভা ফুটতে শুরু করেছিল। সে দেখল, লোকটা আমতলায় এসেই নাক তুলে বাতাসে কী যেন শোঁকার চেষ্টা করছে। মাঝে-মাঝে বিড়বিড় করে নিশ্চয়ই মন্ত্র আওড়াচ্ছে।

আমতলায় এসে দাঁড়াতেই মিশিরজি দেখল, শহিদ বেদির পিছন থেকে কে যেন উঁকিঝুঁকি মারছে। অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

"কওন? কে আছে?"

"আমি, মিশিরজি! গরিব মানুষ।"

মিশিরজির পকেটে বেশ কিছু টাকাপয়সা ছিল স্কুল কমিটির। স্কুলের আলমারিতে না রেখে আজই ভেবেছেন বাড়িতে নিয়ে যাবেন। এ লোকটা, কে জানে, গুন্ডা, লুটেরাও হতে পারে। তবে তার হাতে রয়েছে বরাবরের মতো সেই বিখ্যাত অনেক পুরনো আমলের শক্তপোক্ত ছাতা। এক বাড়িতে এসব ফালতু আদমি চুরচুর হয়ে যাবে। আবার বলা যায় না, সত্যিকারের গরিব ইনসানও হতে পারে। রাতবিরেতে সাহায্য চাওয়া শুরু করেছে।

"ও, ফির রাত্রিবেলা লুকোচুরি খেললে পাপ হোয়। সামনে আও।"

মিশিরজির হিন্দি অথবা বাংলা কুসুমডাঙার লোকের গাসওয়া। সতু কিছু মনে করল না।

"মিশিরজি, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল, অনেক কিছু জানার ছিল।"

"বতাও।"

"কুসুমডাঙা কেমন জায়গা বলে মনে হয়?"

"এইটা কুনহ ডাঙাই না। বিলকুল পানি। সব বরবাদি আদমি। চোরচোট্টার মুলুক। আগে মালুম হোলে তোর টুটা নৌকায় চড়হ্‌তাম না।"

সতুর পক্ষে এতক্ষণ শরীর ধরে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ছিল। মিশিরজির শেষ কথাটি শুনে খি-খি করে হাসতে গিয়ে দেখল, শরীরটা বায়ুভূত হয়ে যাচ্ছে। হাত-পা-মুন্ডু সব যেন প্যাঁচ খুলে বেরিয়ে যাবে। স্তম্ভন কৌশলে সতু বায়ুভবন বন্ধ করল।

এক মুহূর্তের জন্য মিশিরজির ধোঁকা লেগে গিয়েছিল। চোখের সামনেই লোকটা যেন কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল



কুসুমডাঙার আমগাছ

মিশিরজি। পকেটে অত নগদ টাকা রয়েছে! এই লোকটা হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে একবার দৃশ্য হচ্ছে, আবার অদৃশ্য হচ্ছে, অন্ধকারে চেনাও যাচ্ছে না। কিন্তু গলাটা যেন কেমন শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এখন। "কহত কবীর শুনো ভাই মাধো ...."

"আপনি বুঝি মনে করেন পৃথিবীর সব কিছু আপনার নিয়মে চলবে! হিসেবের বাইরে কিছু হওয়ার জো নেই বুঝি! প্রত্যেকটা গ্রামের একটা নিজস্ব, কী বলে, শিল্পসংস্কৃতির ধারা আছে। সেই ধারা পালটানোর আপনি কে!"

"আরে মুরখ্, দুনিয়া চলতে সে হিসাব বরাবর। চালাইতে সে পরমাত্মা। রবিন্দর ঠাকুর পঢ়। লিখা আছে— হামি যোখোন ছিলেম আন্ধা। সন্সারে হামরা আন্ধার মতো চলতে আছি। ইশ্শোয়ার পথ দিখাইতেসে।"

"এই সংসারের বাইরে আর কোনও সংসার কি থাকতে পারে না? আপনার রবীন্দ্রনাথ বলেন, আর ইন্দ্রা গাঁধী বলেন, সবখানে কি সবার কথা খাটে! এই ধরেন, আশপাশে কোথাও ভিয়েন বসেনি, তবু কী সুন্দর মিষ্টি আশ্টার গন্ধ। পাচ্ছেন না? তারপর ধরেন, এক্ষুনি আপনার হাতে একটা চুয়ান্ন বছরের পুরনো ছাতা ছিল। কই, সে ছাতা কি আর আপনার হাতে আছে?"

মিশিরজি দেখল, সত্যি তার হাতে সেই বিখ্যাত ছাতা নেই। এ ছাতা খোলার সময় আর বন্ধ করার সময় বেশ তালে-তালে চার-পাঁচ রকমের অদ্ভুত আওয়াজ হয়। রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত সন্দেহের চোখে তাকায়। একবার বেগুনি গেঞ্জি আর লাল হাফপ্যান্ট পরা কয়েকটি ছেলে এসে তার কাছে ছাতাটা ধার চেয়েছিল। পরে ডেলি রেটে ভাড়ার কথাও বলেছিল। মিশিরজি রাজি হয়নি। বাংলা ব্যান্ড খুলতে হয়, সে নিজেই খুলবে। শেষে ছেলেরা বলেছিল, মিশিরজি রাজি হলে তাদের সঙ্গে স্টেজে বসে একবার ছাতা খুলবে, একবার বন্ধ করবে। পেমেন্ট ভাল। কিন্তু বেগুনি গেঞ্জি আর লাল হাফপ্যান্টের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত মিশিরজি পিছিয়ে আসে।

সেই ছাতা যদি চোখের নিমেষে হাওয়া হয়ে যায়, তবে কার না রাগ হয়! এ লোক সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

"দো মিনিটের ভিতে ছাতা ফিরত না পাইলে অনেক খারাপ পাবে।"

"খারাপ হবে! ছাতা? কিসের ছাতা? আচ্ছা মিশিরজি, ভূতপ্রেত, অপদেবতা— এসব বলে নাকি কিছু নেই?"

"উসব থোড়াই আছে। ফালতু কথা। জয় বজরংবলি।"

"জয় ভুজঙ্গ ঢালি।" সতু পালটা দিল, "কী হলে মানবেন?"

মিশিরজির হঠাৎ কেমন যেন জেদ চেপে গেল।

এতদিন ধরে নিয়মনিষ্ঠা ভরে সৎকাজ করে এসেছে, পুজোআচ্চা করেছে, তার কোনও শক্তি নেই। কিসের বরমদেও, কিসের বা পিচাশ! যৌবনকালের তেজ যেন ফিরে এল। চ্যালেঞ্জ যখন করছে এই ফালতু লোকটা, দেখা যাক।

"আখুন ফাগুন মাহিনা। তুমি আম খিলাও। তবে বুঝব কত ধানে কিতনা চাওল আছে। হঃ, হামাকে ভূতপিরেত শিখলাচ্ছে।"

হঠাৎ মিশিরজির সামনে থেকে সতু বিশ্বাস বিলকুল উবে গেল। পর মুহূর্তে সামনে হাজির, "এই যে আপনার আম!"

মিশিরজি যন্ত্রের মতো সামনে হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাতে একটা আম ধরিয়ে দিল সতু। অন্ধকারে রং বোঝা যায় না, কিন্তু আদতে দারভাঙ্গার মানুষ মিশিরজি হাতে নিয়েই বুঝল, একদম গাছপাকা। কার্বাইডের ক-ও নেই।

"নিন, মুখে দিন। না হলে আবার হয়তো বলবেন মাটির কিংবা পেলাসটিকের।"

মিশিরজি তখন ভয় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কুয়োয় ঝাঁপ দিতে তৈরি। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এখন সামনে ছাড়া পথ নেই। গলাটা এত চেনা লাগে কেন। একটু যেন পা টেনে হাঁটছিল। কে ও?

মিশিরজি মনে-মনে একবার আউড়ে নিল, "ঝরাপাতা গো, হামি তুমহারি দলে..." বলেই এক কামড় দিল ডান হাতের আমে। রসটা জিভে লাগতে যতক্ষণ। তারপর সেই আমতলায় যেন একটা দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল। এক দিকে মিশিরজির কানফাটানো পরিত্রাহি চিৎকার, অন্য দিকে সতুর মিশিরজিকে ঘিরে ঘুরে-ঘুরে নাচ। সঙ্গে দু'জনেরই সমানে মুখ চলছে।

"মর গিয়া রে, জ্বল গয়া। হামার ইশকুল। হায় রাম, হায় রাম, জান লে লিয়া খাট্টা আম। থোড়া জল, একটু পানি দিবেন কেউ। ভগবান তেরা ভালা করে..."

ওদিকে সতু খানিকটা রবীন্দ্রনৃত্যের ভঙ্গিতে হাওয়ায় শরীর ভাসিয়ে মনের সুখে গাইছে, "আমতলাতে হচ্ছে নাচন, নাচে মিশির তালে-তালে।"

"মুঝে জহর পিলা দিয়া রে, হামি জেনেশুনে বিষ করলাম পান..."

সতুর গান আর মিশিরজির অদ্ভুত নাচ দেখে আশপাশের গাছ থেকে, বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে, পুরনো ইটের পাঁজা থেকে সড়াৎ-সড়াৎ করে দর্শকবৃন্দ আসছিল। তারা খুব উৎসাহ দিচ্ছিল। আসলে বহুদিন কোনও ভাল গানবাজনার আসর হচ্ছিল না। এখন বেশ জমে গেল। শেষে সতু বিশ্বাস মিশিরজির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"ভূত আছে সত্যি কি না?"

"সচ্।"

"ইশকুল তুলে দিবি। এই নে ছাতা। লুকিয়ে রাখবি। সরকার জানতে পারলে জব্দ করে নেবে। এই দ্যাখ, আমার মুখটা ভাল করে দেখে নে!"

"তুই? সতু? জিন্দা?"

সমস্ত আমতলা জুড়ে একটা হাসির হর্‌রা উঠল। মিশিরজি দেখল, সতুর শরীর ভেঙে যাচ্ছে। হাত-পা-মুন্ডু যেন প্যাঁচ খুলে বেরিয়ে আসছে। চারপাশে অজস্র কালো-কালো ছায়া, হাসির গমকে গলে-গলে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে!

ছবি: কৌশিক কুণ্ডু

ডান হাতের জড়ুল

সৌগত চক্রবর্তী



"তোদের ফিজিক্স কিন্তু মেনে নিয়েছে ভূত আছে।" চমকে ফিরে দেখি, আমাদের প্রবল ভৌতিক তর্কের মাঝে কখন যেন তাঁর নিজস্ব হাতল-ভাঙা চেয়ারটায় ভূতের মতোই এসে গ্যাঁট হয়ে বসেছেন অনাথকাকা। মুখে মিটিমিটি হাসি। হাতে বাঁকাচোরা লাঠি।

এই অনাথকাকা এক বিচিত্র মানুষ। তিনি যেমন আমাদের কাকা, তেমনই বাবা-কাকাদেরও কাকা। বলা যায় পাড়ার সর্বজনীন কাকা। বাবার কাছে শুনেছি, তিনকুলে কেউ নেই অনাথকাকার। জীবনধারণের প্রয়োজনে রাস্তায় গান গেয়ে দাদের মলম বিক্রি থেকে শুরু করে অকূল দরিয়ায় নাবিক হয়ে ভেসে বেড়ানো, এমন কোনও কাজ পৃথিবীতে নেই, যা অনাথকাকা করেননি। কামিয়েছেন যেমন, উড়িয়েছেনও তেমন দু'হাতে। আর অভিজ্ঞতার আগুনে সেঁকে-সেঁকে তাঁর লম্বা রোগা শরীরটাও কেমন যেন দড়ির মতো পাক খেয়ে গেছে। এই শুকনো শরীরের মাঝে বড় অস্বাভাবিক লাগে অনাথকাকার জ্বলজ্বলে দু'টো চোখ আর সবসময় ঠোঁটের এককোণে লেগে থাকা হাল্‌কা হাসিটা। আমরা অনাথকাকাকে ভালবাসি। কারণ, আজকের মতো প্রতি রবিবার আমাদের আড্ডায় অনাথকাকার ভর্তি ঝুলি থেকে দু'-একটা অভিজ্ঞতা, গল্পের টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

অনাথকাকার মুখে-মুখে তর্ক করার অভ্যেস আমাদের তেএঁটে নাস্তিক ভন্ডুলটার। অনাথকাকার কথার পিঠে-পিঠেই তাই সে বলে ওঠে, "ফিজিক্স এমন কথা কোথায় বলেছে দেখিয়ে দাও দিকি।"

"কেন? শক্তির নিত্যতা সূত্র পড়িসনি? এই বিশ্বে রাজত্ব করছে আট রকম শক্তি। যান্ত্রিক শক্তি, তাপ শক্তি, আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি।"

"চৌম্বক শক্তি, তড়িৎ শক্তি, রাসায়নিক শক্তি আর পারমাণবিক শক্তি। কিন্তু এতে ভূত শক্তিটা কোথায় শুনি?" ভন্ডুল চটপট শূন্যস্থান পূরণ করে।

ভন্ডুলের দিকে একটা করুণার হাসি ছুড়ে দিয়ে শান্তকণ্ঠে অনাথকাকা বলেন, "হিন্দুশাস্ত্র পড়েছিস? আমাদের আত্মা কী কী দিয়ে তৈরি জানিস?"

ইশকুলের অভ্যেসমতো ডান হাতটা আকাশে তুলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে ছুটকি, "জানি-জানি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।"

"ঠিক বলেছিস," অনাথকাকা সায় দেন। "এই পাঁচটা বস্তুই হিন্দুমতে শক্তির পাঁচ রূপ। যার কোনও সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই। যা এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয় মাত্র। তোদের ফিজিক্সও তো তাই বলেছে।"

"এতে ভূতটা কোথায় শুনি? নাকি তোমার মনের মধ্যেই ভূতের বাসা?"

"ওরে গর্দভ, আমার শরীর থেকে ওই শক্তিগুলো বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও বাসা বাধে যখন, তখন সেটাই হয় ভূত। অন্তত আমারই একবার সেরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল।"

গল্পের গন্ধে সকলেই একটু নড়েচড়ে এগিয়ে বসি কাকার দিকে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ওঁর মুখে খেলে যায় সেই অতিপরিচিত শিশুসুলভ হাসিটা। ইঙ্গিত বুঝেই ছুটকি ছুটল ভিতরে, মায়ের কাছে অনাথকাকার চায়ের জন্য দরবার করতে।

তেজপাতা দিয়ে ফোটানো ঘন দুধের চায়ে চোঁ শব্দে একটা চুমুক দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা তৃপ্তির 'আঃ' শব্দ বের করলেন কাকা। তারপর দু' হাঁটুর মাঝে লাঠিটাকে জাপটে ধরে ফতুয়ার পকেট দু' হাতে থাবড়ে একটা বিড়ি বের করে ঠোঁটের বাঁ কোণে চেপে আমার দিকে ফিরলেন কাকা। অভ্যেসমতোই টেবিলের ড্রয়ার থেকে বার করি মায়ের ঠাকুরঘর থেকে লুকিয়ে আনা দেশলাইটা। আর যথারীতি গল্পের উত্তেজনায় পরপর চারটে কাঠি নষ্ট করে পাঁচ নম্বর কাঠির আগুনে জ্বেলে দিই অনাথকাকার বিড়ি।

স্টিম ইঞ্জিনের মতোই মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে হাঁটু মুড়ে চেয়ারের উপর পা তুলে বসলেন অনাথকাকা। তারপর হাতের বাঁকাচোরা লাঠিটা কোলের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন, "আমি তখন গোবরডাঙায়। গোবরডাঙা কোথায় জানিস তো? বনগাঁ লোকালে যেতে হয় শিয়ালদা থেকে। প্রায় ষাট-বাষট্টি বছর আগেকার কথা। ইংরেজ আমল। সদ্য-সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করে গোবরডাঙা পোস্ট অফিসের চাকরি নিয়ে তল্পিতল্পা বেঁধে এখানে নেমেছি। এবার হাঁটতে হবে প্রায় মাইল তিনেক। প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছি, হঠাৎ দেখি রোগা, শণের মতো চুলের এক বুড়ি এগিয়ে আসছে আমার দিকে। মুখে হাসি। ঠোঁটের মধ্যে থেকে উঁকি মারছে মাত্র একটা কি দু'টো হলদে ত্যাড়াবাঁকা দাঁত, গোটা মুখের চামড়া কুঁচকে পচা কালো হয়ে যাওয়া আমের মতন চেহারা নিয়েছে। ঠেলে বেরিয়ে আছে ঘোলাটে চোখ দু'টো। পরনে একটা শতচ্ছিন্ন থান। এককালে হয়তো এর রং ছিল সাদা। এখন ছাইবর্ণে পা দিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলেছে কালো রঙের দিকে। কোমর থেকে আস্ত শরীরটা ঝুঁকে পড়েছে সামনে। এমন একটা টলমলে ভাব, যেন যে-কোনও মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়বে বুড়ি। দুপুরবেলা ফাঁকা রাস্তায় আমাকে দেখেই দু' হাত দিয়ে বাতাসে সাঁতার কাটতে-কাটতে ল্যাগব্যাগ করতে-করতে আমার দিকে এগিয়ে এল। অনেক কষ্টে আমার দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে খোনা গলায় বলে উঠল, 'বাবু রে, তোকে কখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! তোর মা'কে একটা পয়সা দিবি বাবু! মুড়ি খাব!'

"চমকে উঠলাম বুড়ির কথা শুনে। এত খোনা গলার আওয়াজ কোনও জ্যান্ত মানুষের হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। বুকের সামনে উঠে এসেছে বুড়ির কম্পমান ডান হাতখানা। মনে হচ্ছে, শুধু দু'খানা হাড়ের উপর যেন আঠা দিয়ে চিটিয়ে দেওয়া হয়েছে চামড়া। একটা পয়সা বুড়ির হাতে দিতে গিয়ে লক্ষ করি, বুড়ির ডান হাতে জ্বলজ্বল করছে লোমে ভরা প্রায় ছ' ইঞ্চি লম্বা একটা জড়ুল।

"পয়সা পেয়েই আনন্দে আটখানা বুড়ি বাঁ দিকে একটু কান্নিক খেয়ে রাস্তা পার হতে ছুটল। বোধ হয় তাড়াতাড়ি মুড়ি কিনে পেটের আগুন নেভাবার জন্যই। আর তাতেই ঘটল দুর্ঘটনা। টাল সামলাতে না পেরে বুড়ি মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

"দৌড়ে গিয়ে বুড়িকে তুলতেই দেখি, বুড়ির গোটা মুখে গুঁড়ো মাটির আলপনা। ঠোঁটের কোণটা একটু কালচে-লাল হয়ে গেছে। এই শুকনো শরীরেও তা হলে রক্ত আছে! আমার হাতে ভর দিয়ে ফোকলা হাসিতে মুখ ভরিয়ে বুড়ি করুণ সুরে বলে উঠল, 'বাবু রে, তোর মা যখন-তখন পড়ে যায়। তোর মা'কে একটা অবলম্বন দিবি!'

"বুড়িকে নিয়ে এসেছিলাম পোস্ট অফিস সংলগ্ন আমার কোয়ার্টারে। আমার সঙ্গেই দু'বেলা খেত বুড়ি। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছরের ভিক্ষে করার অভ্যেসটা আর ছাড়তে পারেনি। আমার কিনে দেওয়া লাঠি বা অবলম্বনটায় ভর দিয়ে ঠুকঠুক করে ঘুরে বেড়াত গোটা এলাকা ভিক্ষে করতে-করতেই। শুনেছিলাম, ওর পরিচয় 'লক্ষ্মণবাবুর মা'। লক্ষ্মণবাবু ছিলেন এই পোস্ট অফিসেরই পুরনো মাস্টার। হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় লক্ষ্মণবাবু মারা যাওয়ার পর বুড়ির ভিক্ষে করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

"এমন করে বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল গোবরডাঙার দিনগুলো। আমার মায়ের অভাব অনেকটাই পূরণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘকালের অপুষ্টি আর বার্ধক্যে বুড়িও একদিন মায়া কাটাল পৃথিবীর। আবার আমি একা। অবলম্বন বলতে বুড়ির ফেলে যাওয়া লাঠি আর পোষা কুকুর কালু।

"একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুনি, বাইরে শনশন হাওয়ার শব্দ। আর সেইসঙ্গে ক্যাঁচকোঁচ, দমাস-দমাস আওয়াজ। দেখি, হাওয়ার দাপটে খুলে গেছে আমার কোয়ার্টারের দরজা। আশ্চর্য! দরজা খুলল কী করে? তবে কি ছিটকিনিটা ঠিকমতো লাগানো হয়নি! অনেক সময় অবশ্য এরকম হয়।"



ডান হাতের জড়ুল

চোঁ-ও-ও শব্দে অনাথকাকা এক চুমুকে শেষ করে ফেললেন কাপের নীচের ঠান্ডা তলানিটুকু। নিভে যাওয়া বিড়িতে ঘনঘন শেষ তিন-চারটে টান মেরে ক্যারমের স্ট্রাইকারের ভঙ্গিতে টুস্‌কি মেরে গ্রিলের মধ্যে দিয়ে নিখুত লক্ষ্যে বিড়িটা ছুড়ে দিলেন জানলার বাইরে। তারপর ভিজে জিভ দিয়ে ঠোঁট দু'টোকে চেটে নিয়ে ফের বলতে শুরু করলেন, "বাইরে বেরিয়ে কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম, প্রচণ্ড হাওয়ায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে আমার কোয়ার্টারের কোণে মাটি ফুঁড়ে ওঠা কচি পাঁচ-ছ' ফুট উচ্চতার আমগাছটা। আর তাকে ঘিরে প্রবল আনন্দে ছুটে বেড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে, কখনও বা লুটোপুটি খাচ্ছে ইদানীং মনমরা হয়ে থাকা কালু। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, আকাশ মেঘে ঢেকে থাকা সত্ত্বেও এসব আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

"তবে এই রহস্যজনক দেখতে পাওয়াটা তখন আমার মাথায় ঢোকেনি। ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়েছি। ঘুমিয়েছি কি ঘুমোইনি, আবার সেই শব্দ। ক্যাঁচকোঁচ, দমাস-দমাস! দেখি, হাওয়ার দাপটে আবার খুলে গেছে দরজা! এবার কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম। একটা ঠান্ডা কনকনে স্রোত যেন বয়ে গেল আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। প্রাণপণে বিছানায় পড়ে থাকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। কিসের যেন একটা টান আমাকে টেনে নিয়ে গেল বাইরের দিকে।

"বাইরে সেই একই দৃশ্য। পার্থক্য শুধু দু'টো। দেখলাম, আমগাছটা অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। এবার হয়তো হুমড়ি খেয়ে পড়বে মাটিতে। আর সেই পড়ে যাওয়া প্রতিহত করতেই যেন সবচেয়ে নীচের ডাল দু'টো অনেকখানি ছড়িয়ে গেছে দু' পাশে। আর-একটা অপূর্ব গন্ধে যেন ম-ম করছে চারধার। এক অমোঘ টানে পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম গাছতলায়। মনে হল যেন প্রচণ্ড হাওয়ায় আমার শরীরটা শুকনো পাতার মতোই ঝিরঝির করে কাঁপছে। আর ঠিক সেই সময় শনশন হাওয়াই যেন আমার কানে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'বাবু রে, আমার যে দাঁড়াতে বড় কষ্ট, অবলম্বন দিবি না!'

"ভয়ে, আতঙ্কে আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠে এল গলার কাছটায়। কোনওরকমে ঘরে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুললাম। পরেরদিন সকালে অবশ্য মনে করে আমগাছের ডান দিকের ডালটায় বেঁধে দিয়েছিলাম বুড়ির লাঠিটা। আর তখনই দেখেছিলাম, সেই ডালটায় আশ্চর্যজনকভাবে পড়েছে একটা প্রায় ছ' ইঞ্চির মতো লম্বা কালো স্পট। রোঁয়ায় ভর্তি। ঠিক যেন একটা জড়ুল!"

"তারপর?" ফিসফিসিয়ে কোনওরকমে বলল ছুটকি।

আবার পকেট থাবড়ে একটা বিড়ি বের করে আমার দিকে তাকান অনাথকাকা। এবার ছ'বারের চেষ্টায় আগুন লাগাই বিড়িতে। আকাশের দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছাড়েন কাকা। বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাসও। আস্তে-আস্তে ফের বলতে শুরু করেন, "তারপর আর কিছুই নেই। কোনওদিন হয়নি ওই অভিজ্ঞতা। ভেবেছিলাম গোবরডাঙাতেই কাটিয়ে দেব বাকি জীবনটা। কিন্তু হঠাৎই মারা গেল কালু। আমগাছটাও কেন জানি না ক্রমশ শুকিয়ে আসতে লাগল। তাই এই লাঠিটা খুলে নিয়ে আবার শুরু করলাম নিরুদ্দেশ যাত্রা।"

আমাদের সকলের চোখ গিয়ে পড়ল অনাথকাকার বাঁকাচোরা লাঠিটার দিকে। ততক্ষণে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন অনাথকাকা। দাঁড়িয়েছেন সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে। সেই সময়ই, বোধ হয় টাল সামলাতে গিয়েই অনাথকাকার হাতের উপর থেকে অনেকখানি সরে গেল তুষের চাদরটা। চমকে দেখি, অনাথকাকার ডান হাতে জ্বলজ্বল করছে প্রায় ছ' ইঞ্চি লম্বা লোমে ভরা একটা জড়ুল। ভন্ডুলদের দেখাবার আগেই তড়িঘড়ি অনাথকাকা ঢেকে দিলেন হাতখানা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে রহস্যময় একটা হাসি হেসে বললেন, "অবলম্বনটা ছাড়তে পারিনি!"

ও কী! গলার স্বরটা যেন একটু খোনা-খোনা লাগল না! কিন্তু আমাকে চিন্তাভাবনার কোনও অবকাশ না দিয়েই প্রায় ল্যাগব্যাগ করতে-করতেই লাঠি ঠুকঠুকিয়ে অনাথকাকা এগিয়ে গেলেন বাবার ঘরের দিকে।

ছবি: বিপ্লব মণ্ডল

আমবাগানের ভূত

সুকুমার রুজ



প্রিয় তপু ও গোপু, কলকাতা থেকে রনি লিখছি। আশা করি তোরা ভাল আছিস! তোদের অ্যানুয়াল পরীক্ষা নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে এতদিনে। আমার পরীক্ষা কম্প্লিট। নিশ্চয়ই জানিস, টনিদা এবার মাধ্যমিক দিল। কাল ওয়ার্ক এডুকেশন পরীক্ষা হয়ে গেলেই ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

আমরা আগামী রবিবার সকালের গাড়িতে তোদের কাছে, মানে, আমাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাব। এক সপ্তাহ থাকব। তারপর আমাদের সঙ্গে তোরা এখানে, মানে, কলকাতায় বেড়াতে আসবি। এমনই কথা ছিল, মনে আছে তো! টনিদা বলেছে, গত বছর নাকি ভূত দেখাবি বলে দেখাতে পারিসনি! এবার ভূত-পেতনিগুলোকে সেজেগুজে তৈরি থাকতে বলিস। এবার তেনারা দেখা না দিলে জানব ওঁরা নেই। তোরা বাজি হেরে যাবি। বাজির কথা মনে আছে তো! নাকি ভুলে মেরে দিয়েছিস?

ভাল কথা, দিনুদাকে নিয়ে তোরা যেন অবশ্যই স্টেশনে থাকিস। আমাদের সঙ্গে অনেক জিনিসপত্তর থাকবে।

কাকা-কাকিমা'কে প্রণাম জানাস। আর আমার নাম করে, পয়সা দিয়ে, নিতাইকাকার দোকান থেকে দু'জনে দুটো চকোলেট খেয়ে নিস।

তোদের রনিদা

(যেহেতু তপুর চেয়ে এগারো দিনের বড় রনি)

চিঠিটা হাতে পেয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে গোপন। ওর মনে খুশির হাওয়া। সকলের আগে দাদাকে চিঠির কথা জানাতে হবে। কালই দাদা বলছিল ওদের কথা। গত বছর দারুণ মজা হয়েছিল নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে। কাঁকড়ার তাড়া খেয়ে রানির কাদায় আছাড় খাওয়া, মৌমাছির চাকে ঢিল মেরে টনির শাঁক-আলু হয়ে যাওয়া। এসব কথা উঠতে সকলে হেসে লুটোপুটি। দাদা বলেছিল, "এবার ওদের বোকা বানিয়ে, নাস্তানাবুদ করেই ছাড়ব।"



কিন্তু দাদা কোথায়? নিশ্চয়ই আমবাগানে গিয়ে বসে আছে!

গোপন এক ছুটে আমবাগানে। যা ভেবেছে ঠিক তাই! কুঁড়েঘরের পাশে বাঁশের চটানে বিপিনকাকা আর দাদা বসে আছে। বিপিনকাকা গলা ছেড়ে সেই 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গানটা গাইছে। এ গানটাই রোজ গায় বিপিনকাকা। তবু কী ভাল যে লাগে এ গান শুনতে! কাকা বলে, এ লালন ফকিরের গান। আলমপুরের এক ফকিরের কাছে শিখেছে। দাদা আধখানা ব্লেড দিয়ে এক মনে কচি আমের খোসা ছাড়াচ্ছে।

গোপন চট করে পকেটে হাত দিয়ে দেখে নেয় ওর আধখানা ব্লেডটা ঠিকঠাক আছে কি না। কাল অনেক কাণ্ড করে দাদার কাছ থেকে ব্লেডটা বাগিয়েছে। দাদা তক্কে-তক্কে ছিল। ছোটকাকু দাড়ি কামানোর পর বাতিল ব্লেড কখন ফেলেন! তারপর বহু কষ্টে দু' ভাইয়ে ভাগাভাগি। অন্য পকেটে হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে নস্যির ডিবের ঢাকনা খুলে গিয়ে, কালকের মতো নুন-লঙ্কা গুঁড়ো পকেটে পড়ে গেছে কি না! ঠাকুরদা'র নস্যির ডিবে। অনেক পুরনো। ঢাকনির প্যাঁচ কাটা। দাদু মারা যাওয়ার পর কাঠের আলমারির কোণে পড়েছিল ডিবেটা। মায়ের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর ক'রে কাল ওটা হাতিয়েছে নুন-লঙ্কা গুঁড়ো রাখার জন্য। আধখানা ব্লেড আর এই ডিবে থাকার জন্য বন্ধুদের কাছে যে ওর কদর বাড়বে, সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত।

গোপন কী ভেবে চুপিচুপি দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শুকনো বটপাতার উপর খোসা ছাড়ানো কচি আম। গোপু টুক করে এক টুকরো আম নিয়ে মুখে পুরে দেয়। তপু খপ করে ওর কান ধরে, "অ্যাই, নিলি কেন? কত কষ্ট করে ছাড়াচ্ছি।"

"আঃ! লাগছে, কান ছাড়। একটা ভাল খবর দোব। তাই তার পুরস্কারটা আগেই নিলাম।"

"কী খবর রে?"

গোপন চিঠিখানা দাদার চোখের সামনে মেলে ধরে। তপন চিঠি পড়ে বাঁশের চটান থেকে লাফিয়ে নামে, "দারুণ খবর এনেছিস! আমার সোনাভাই! নে, আম খা। জানিস, টনিদা খুব সাহস দেখায়। এবার আসুক না! জমিদারদিঘির জঙ্গলে গিয়ে ছেড়ে দোব। বাছাধন টের পাবে। ভূতে অবিশ্বাস!"

পকেট থেকে নুন-ঝালের ডিবে বের করে গোপু, "এই নে দাদা নুন-লঙ্কা গুঁড়ো। কাল পদ্মপিসিকে পটিয়েপাটিয়ে গুঁড়িয়ে নিয়েছি।"

মনের আনন্দে দু'জনে কচমচ করে খেতে থাকে নুন-ঝাল দিয়ে কাঁচা আম। তপু চাকুমচুকুম শব্দ করে মুখে, "উঃ! খুব ঝাল! লঙ্কা বেশি হয়ে গেছে। মা'কে দেখিয়েছিস চিঠিটা?"

"না। পিয়নকাকু চিঠিখানা আমার হাতে দিতেই পড়ে নিয়ে সোজা তোর কাছে। কী টক রে আমগুলো! ল্যাংড়া বোধ হয়! দাঁত আমলে যাবে!"

"হ্যাঁ, ল্যাংড়া। কাঁচায় খুব টক!"

বিপিনকাকার গান থেমে গেছে। দু' ভাইয়ের কথায় কান ওর, "কিসের খপর গো কানাই-বলাই?"

"জ্যাঠার ছেলেরা এখানে আসছে। সাতদিন পর আমরাও ওদের সঙ্গে কলকাতা যাব। সেই যে রনি-টনিদা, মনে আছে?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ। সেই যে ভূত-পেরেত, জিন-পরি-আজরাইন বিশ্বেস করে না, লম্বা-রোগা সাহেবরঙা ছেলেটা তো! ওঃ, ওদের নিয়ে কত কাণ্ড!"

"ঠিক ধরেছ!"

"ভাল, ভাল। ক'দিন হইহুল্লোড় হবে আরকি! ইশকুল খুলতে দেরি আচে তো!"

"হ্যাঁ, রেজাল্ট বেরোবে, তারপর...! যাই কাকা! মা'কে চিঠির ব্যাপারটা জানাই।"

তপু-গোপু গুটিগুটি এগোয় বাড়ির দিকে। গাছের ডালে বসে একটা কোকিল কু-কু করে ডাকছে। দু'জনে কোকিলের স্বর নকল করতে-করতে হাত ধরে হাঁটতে থাকে। কোকিলটা ডেকে চলে প্রাণপণে।

॥ ২ ॥

রবিবার। তপু, গোপু ও দিনুদা স্টেশনে এসে বসে আছে। কলকাতা থেকে আসার প্রথম গাড়ি ঢুকবে দশটায়। তবুও ওরা ন'টায় এসেছে। ট্রেনের সময় হতে একজন রেলকর্মী ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজায়। টিকিট কাটার ঘণ্টা। ঢং-ঢং-ঢং, তিনটে শব্দ করে টিকিট-ঘন্টি থামলেও তপু-গোপুর মনের মধ্যে ঘণ্টা বেজেই চলে নিঃশব্দে। আর-একটু পরেই ওরা এসে যাবে। কতদিন পর দেখা হবে, কথা হবে! গাড়িটা লেট করছে খুব!

ওই যে দেখা যাচ্ছে গাড়িটা। এখনও অনেকটা দূরে। এখনও গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবুও তপু-গোপু যেন শুনতে পাচ্ছে গাড়ির ঝিক্-ঝিক্। নাকি নিজের বুকের ধুকপুক! কে জানে!

দিনুদা বলে ওঠে, "দ্যাক, এ গাড়িতে আবার আসচে কি না! এটায় না এলে আবার ডেড়ঘণ্টা।"

দিনুদা'র কথায় তপু-গোপু অসন্তুষ্ট হয়। মুখে কিছু বলে না! তবে ওদের মনের মাঝে বাজতে-থাকা একতারাটার সুর কেটে যায়।

গাড়ির সামনের দিকেই ওরা ছিল। জ্যাঠামশাই আসেননি। জেঠিমাকে প্রণাম করার পর তপন-গোপন, টনি-রনিকে জড়িয়ে ধরে। টনি বলে, "অ্যাই, আমাকে প্রণাম করলি না! আমি তোদের চেয়ে বড় না! গুরুজনদের প্রণাম করতে হয়!"

তপন বলে ওঠে, "তুই গুরু নয়, লঘুজন হবি আমার চেয়ে। আমি পঞ্চাশ কেজি। তোর ওজন চল্লিশও হবে না মনে হয়। তা হলে কে গুরুজন?"

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে তপুর কথায়। দিনুদা ইতিমধ্যে ব্যাগট্যাগ কাঁধে তুলে নিয়েছে। সে বলে, "চলো বউমা।"

জেঠিমা বলেন, "হ্যাঁ, চলো দিনুদা! তুমি তো একই রকম আছ গো দিনুদা! মোটেই বুড়ো হওনি!"

"বুড়ো কী করে হব বলো তো! কেউ তো আমাকে কাকা-জ্যাঠা বা দাদু বলে না! কত্তাবাবু, মা, ছেলে, সকলেরই 'দিনুদা' আমি। তাই... হেঁ-হেঁ-হেঁ। চলো বউমা, হেঁটেই চলো। এক দণ্ডের পত, তাই গাড়ি আনিনি।"

বাড়ির পথে যেতে-যেতে কত রকমের গল্প। বাগানের আমগাছগুলোতে আম ধরেছে কি না, বাগানের পাহারাদার সেই বিপিনকাকা কেমন আছে, সে অন্য গান শিখেছে, নাকি এখনও শুধু 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গায়! এমন হাজারও প্রশ্ন।

তপু-গোপু উত্তর দেওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে জেনে নেয়, গত বছর বিড়লা মিউজিয়ামে একটা ডাইনোসর তৈরি হচ্ছিল, সেটা হয়ে গেছে কি না, কথা বলা রোবোট সেই 'খগেনবাবু' একাই আছে নাকি আর-একটা এসেছে?

এভাবে একে অপরের কৌতূহল মেটাতে-মেটাতে ওরা বাড়ির কাছাকাছি। টনি বলে, "কী রে তপু! চিঠিতে আগাম খবর দিয়েছিলাম তোদের ভূতটুতগুলোকে রেডি থাকার জন্য। এবার ভূত দেখাবি তো? সেই যে বলিস, মাছ খেয়ে নেয়, লালপাড় শাড়ি পরে বসে থাকে! ওদের সঙ্গে এবার মোলাকাত করিয়ে দিস। তা না হলে মনে আছে তো বাজি ধরার কথা!"

তপুর মিনমিনে গলা, "কপালে থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবি। ওসব শখ করে কাউকে দেখানো যায় না। তোকে আগেও বলেছি, ওদের নিয়ে মজা করিস না। কী হতে কী হয়! ওদের গতিবিধি সর্বত্র।"

রানি-টনি হেসে ওঠে, "তাই নাকি! তোদের বাড়িতেও আসে তা হলে! তবে তো নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যাবে। বাড়ি তো এসেই গেলাম।"

॥ ৩ ॥

নদীর ধারে গাঙশালিখের ছানা খুঁজতে যাওয়া। পুকুরে সাঁতার শিখতে গিয়ে রনির একপেট জল খেয়ে ফেলা। ঢিল ছুড়ে আম পাড়তে গিয়ে ছোটকাকার কাছে কানমলা খাওয়া। এসব নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন কেটে যায়। এর মধ্যে আমবাগানেই কেটেছে বেশি সময়। বিপিনকাকার কাছে ওর ছেলেবেলার ভূতের গল্প শোনা, তার সঙ্গে ওর সেই খাঁচা-



আমবাগানের ভূত

পাখির গান তো আছেই। আজ ঠিক হয়েছে, বিকেলে যাবে জমিদারদিঘির জঙ্গলে। কিন্তু দুপুরেই আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে। মা বললেন, "আজ কালবোশেখি হবে মনে হচ্ছে। এ বছরের প্রথম ঝড়। আজ তোরা কোথাও বেরোস না!"

রনি আকাশের দিকে তাকায়, "বাব্বা! একেবারে অন্ধকার হয়ে এল যে! কী রে গোপু! ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি?"

টনি কাঁধ ঝাঁকায়, "ছাড় তো! ভূত না হাতি! তিনদিন হয়ে গেল ভূতের দেখা নেই। তপু-গোপু, এরকম আঁধার-ঘেরা পরিবেশে একজন কাউকে ভূত সাজিয়ে দেখা অন্তত! নিজেদের সম্মানটা বাঁচা!"

"গোপুর ফিসফিসে গলা, "দ্যাখ, ওসব নিয়ে মজা করিস না টনিদা! কখন যে ওরা দেওয়ালে কান পেতে রাখে...!"

একটু পরেই শনশন করে হাওয়া বইতে থাকে। গাছপালাগুলোতে লাগে দোলা। তপু-গোপুর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে আমবাগানে যাওয়ার জন্য। ঝড়ে আম পড়বে। সঙ্গে-সঙ্গে না কুড়োলে অন্য ছেলেরা কুড়িয়ে নেবে। বিপিনকাকা একা কি সব কুড়োতে পারবে? বেশিরভাগ সময়ই তো ওকে বাগানের পশ্চিম দিকটায় পাহারা দিতে হয়।

মায়ের কাছে বাগানে যাওয়ার আরজি পেশ করা হয়। কিন্তু আরজি না-মঞ্জুর। ঝড়ের সময় বাগানে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু তেমন ঝড় ওঠেনি। জোরে হাওয়া বইছে মাত্র। এই হাওয়াতেই তো কচি আমগুলো টুপটাপ পড়ে! ঝড় ওঠার আগেই ওরা বাগান থেকে ফিরে আসবে, এই অঙ্গীকার করে ওরা মা-জেঠিমাকে নিমরাজি করায়। চারজনে চারটে থলে হাতে নিয়ে ছুট লাগায় বাগানের দিকে। মা হাঁক পাড়েন, "তাড়াতাড়ি চলে আসবি। আর যদি বৃষ্টি নামে বিপিনের কুঁড়েঘরে থাকবি। ভিজিসনে যেন! ঠান্ডা লাগবে।"

মায়ের কথাগুলো ওদের কানে যাওয়ার আগেই ওরা বাগানে পৌঁছে গেছে। বেশ অন্ধকার বাগানটা। যেন সন্ধে নেমে গেছে। শোঁ-শোঁ, কটকট শব্দ। থোকা-থোকা আমওয়ালা ডালগুলো খুব জোরে-জোরে দুলছে। নারকোল গাছগুলো এমন দুলছে যেন ভেঙে পড়বে! এত ধুলো উড়ছে যে, ভাল করে চোখ মেলা যাচ্ছে না। তার মধ্যেই ওরা আম কুড়োচ্ছে। চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। তা না হলে শুনতে পাচ্ছে না। বেশ কিছু আম কুড়িয়েছে। এমন সময় চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামে। মোটা-মোটা ফোঁটা। গোপু বলে, "দাদা, বিষ্টি নামছে, বাড়ি চল।"

"দাঁড়া না! থলে ভর্তি হয়নি এখনও। তা ছাড়া বিপিনকাকার সঙ্গেও তো দেখা হল না। সকালে গেলাম নদীর ধারে! চল, কুঁড়েতে ঢুকি গিয়ে! বৃষ্টি থামলে বাড়ি যাব।"

বাঁশের চটানের পাশেই তালপাতা-ছাওয়া কুঁড়েঘর। চেরা বাঁশের তৈরি আগড়টা খোলাই ছিল। কিন্তু ভিতরে বিপিনকাকা নেই। নিশ্চয়ই ওই পশ্চিম দিকটায় গেছে কাকা! বাগদিপাড়ার ছেলেগুলো যা উৎপাত করে!

কুঁড়ের ভিতরটা আরও বেশি অন্ধকার। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার আলোয় ওরা চোখ বুজে ফেলছে। কারণ, তার পরেই কান-ফাটানো মেঘের ডাক শোনা যাবে। গোপুর মনে ভয়। ও বলে, "চল না দাদা, বাড়ি চলে যাই। মা চিন্তা করবেন।"

টনির গলা, "কী রে গোপুচন্দ্র! ভয় পাচ্ছিস নাকি! ভূতের ভয়! আমি আছি না! তোদের ভূত এখন আসবে না। শহরের ছেলেদের ভূত ভীষণ ভয় পায়।"

এমন সময় বিপিনকাকা আসে। পরনে একটা লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জি। ভিজেটিজে একশা। চোখ-মুখ ঢুকে গেছে কোটরে। কেমন যেন দেখতে লাগছে কাকাকে। অথচ যখন চটানে বসে গান গায়, তখন কত সুন্দর লাগে!

কাকা ওদের দেখে বলে, "তোমরা এই ঝড়ের মধ্যে বাগানে এসেছ কেন? আমি তো আছি। যাও, শিগগির বাড়ি চলে যাও। তোমার বাবা জানতে পারলে আমাকে বকবেন, তোমাদেরও...! এ ঝড় মোটেই ভাল নয়!"

"দাঁড়াও না কাকা। আর ক'টা আম কুড়িয়ে নিই। ওখনও ঝোলা ভরেনি।

"নাও, ঝোলা পাতো দিকিনি!" বলে বিপিনকাকা কুঁড়ের ভিতরে এক কোণ থেকে এক ঝুড়ি আম নিয়ে আসে। ওরা এতক্ষণ কুঁড়ের ভিতর থাকলেও আমের ঝুড়ি চোখে পড়েনি। বিপিনকাকা ঝুড়ির আম ঢেলে সকলের ঝোলা ভর্তি করে দেয়। তারপর গম্ভীর গলায় বলে, "এবার যাও। আর-এক মিনিটও দাঁড়াবে না। বিপদে পড়বে। শিগগির বাড়ি চলে যাও সব্বাই!"

তপু-গোপু অদ্ভুত চোখে তাকায় বিপিনকাকার দিকে। ওর এরকম গলার স্বর কখনও শোনেনি! এত মিষ্টি ব্যবহারের কাকা আজ যেন একটু অন্য রকম! গলায় আদেশের সুর! চোখ দুটো যেন ধক-ধক করে জ্বলছে!

গোপু বলে, "চলো টনিদা। আমাদের থলে তো ভরে গেছে!"

"চল। কাকিমা চিন্তা করবেন বলছিস। বৃষ্টিতে কিন্তু পুরো ভিজে যাব।"

॥ ৪ ॥

ওরা বাড়ি পৌঁছেছে। দ্যাখে, উঠোনে তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিপিনকাকার বড় ছেলে অমল। ও উঠোনে দাঁড়িয়ে মা'কে বলছে, "কর্তামা, বাবার কাল রাত থেকে আন্তিরিক হয়েচে। বাবাকে সকালেই হাসপাতালে নিয়ে গেয়েছে কাকারা। আমুও গেইছিলাম। বাবা বলল, বাগানে যেন দিনুদাকে পাটায়। তা নইলে সব আম শেষ করে দেবে ছেলের দল। আর বাবা বলেছে, কিচু টাকা দিতে। ওযুদবিযুদ কিনতে হয় যদি!"

টনি ব্যাপারটা শুনে-বুঝে বলে ওঠে, "অ্যাই চোপ! ঢপ মারার আর জায়গা পাও না! কিছু টাকা গ্যাঁড়ানোর ধান্দা! এখনই বাগানে বিপিনকাকাকে দেখে এলাম! আর বলে কিনা সকাল থেকে হাসপাতালে...যা, ভাগ!"

অমল হতভম্ব। ওর মুখ কাচুমাচু। চোখে জলও চলে আসে বুঝি!

"টনি! তুমি থামো। ও মিছে কথা বলে না। আমি দেখছি।



আমবাগানের ভূত

তোমরা ভিজে জামা-প্যান্ট পালটাতে যাও!" মা গম্ভীর গলায় বললেন।

টনি নিজের মনে গজগজ করতে থাকে, "আমি কি তবে মিছে কথা বলছি! আমি নিজের চোখে...তা ছাড়া তপু-গোপুও তো...!"

তপু বলে, "কী বুঝলি টনিদা?"

"কী আবার বুঝব! আমি মিথ্যেবাদী হয়ে গেলাম, আর...!"

"অমল মিছে কথা বলে টাকা নিতে আসেনি। ওরা খুব বিশ্বস্ত! বাগানে যাকে দেখলাম ওটা আসলে...!"

"ভূত, তাই তো! যত্তসব! চল, বাগানে আমার সঙ্গে। তোদের ভূতকে ধরে নিয়ে আসি তা হলে! কাকিমা...!"

কাকিমা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, "এই নে অমল! আমার কাছে মাত্র দুশো টাকা ছিল। তোর কর্তাবাবু তো বাড়িতে নেই! বাবা কেমন থাকে সন্ধেবেলায় খবর দিয়ে যাস। সাবধানে যাবি!"

॥ ৫ ॥

কিছুক্ষণ পর ঝড়বৃষ্টি থামে। আকাশের ঘন মেঘ কোথায় উধাও! ঝকঝকে নীল আকাশ। ঝিকমিকিয়ে রোদ উঠেছে। টনি যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। ও বলে ওঠে, "তপু! বৃষ্টি থেমে গেছে। চল, এবার বাগানে। বিপিনকাকাকে ডেকে নিয়ে আসি।"

তপুর মন সায় দেয় না বাগানে যেতে। ও ইতস্তত করে। ওর মনে ভেসে ওঠে বাগানে দেখা বিপিনকাকার কথাগুলো। কী গম্ভীর ও কর্কশ! আর চোখ দুটো...

টনি রেগে ওঠে, "তোরা গাঁয়ের ছেলেরা না খুব ডরপুক। সাহস বলতে কিস্‌সু নেই। ভূত-ভূত করেই হেদিয়ে গেলি।"

তপু সামনের বছর মাধ্যমিক দেবে। ওর নাকের নীচে কালো রেখা। গলার স্বর ভেঙেছে। এখন ও যুবক হওয়ার পথে। তাকে কিনা এমন কথা বলে মাত্র দেড় বছরের বড় টনিদা! ওর মনের মধ্যে কেমন-কেমন হচ্ছে। ও বলে, "চল। তোর তো সাহস আছে! তোরা শহরের ছেলে কিনা! আমরা গাঁয়ের ছেলে, একটু ভিতুই হই।"

টনি-রনি ও তপু-গোপু আবার বাগানের দিকে। বাগানের সুঁড়ি পথটায় কাদা হয়ে গেছে। তার উপর উড়ে পড়েছে শুকনো পাতা। চারদিকে কেমন এক সোঁদা-সোঁদা গন্ধ! গাছপালা, ঝোপঝাড়গুলো এখন কেমন শান্ত! পাতা থেকে জল ঝরছে টুপটাপ। ভিজে পাতায় পড়েছে বিকেলের ফিকে রোদ। কী সুন্দর যে লাগছে! এইমাত্র ওরা যেন চান করে উঠে রোদ পোয়াচ্ছে! গাছগাছালিতে পাখপাখালি ভিজে ডানা ঝাড়ছে আর নানান সুরে ডেকে যাচ্ছে। ওরা এগোচ্ছে বাগানের ভিতর দিয়ে। ওদের গায়ে ভেজা-হাওয়ার ঠান্ডা পরশ। টনি সকলের আগে। পিছনে অন্যরা।

কুঁড়েঘরটার কাছাকাছি গিয়ে ওরা চমকে ওঠে। আমগাছের বিশাল এক ডাল ভেঙে পড়েছে কুঁড়েঘরটার উপর। বাঁশের চটান, কুঁড়েঘর একেবারে পিষে গেছে! ওদের চোখ তো ছানাবড়া, মুখ থেকে কথা সরে না কারও। টনিও কেমন হতভম্ব হয়ে যায়! রনি বলে, "দাদা! আমরা যদি কুঁড়েঘরটায় থাকতাম, তা হলে কী হত বল তো!"

তপু বলে, "কী রে টনিদা! থামলি কেন? এগো!"

গোপুর ভেজা গলা, "দাদা, বাড়ি ফিরে চল!"

টনি সাহস দেখিয়ে বলে, "বিপিনকাকা ওই ঘরের ভিতর চাপা পড়ে যায়নি তো! চল তো দেখি!"

ডাল-পাতার খোঁচা বাঁচিয়ে ওরা সাবধানে এগোয় গাছের ডাল চাপা-পড়া ঘরটার কাছে। তালপাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ঘরের সেই আমের খালি ঝুড়িটা থেঁতলে গেছে। আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

তবে কি বিপিনকাকা ডাল ভেঙে পড়ার আগেই ঘর থেকে সট্‌কান দিয়েছে! তাই যদি হয়, তা হলে এখন তো এখানেই থাকার কথা!

একটা পাখি হঠাৎ বিকট শব্দে ডেকে ওঠে। সে ডাক ওদের বুক কাঁপায়। একে অন্যের মুখের দিকে তাকায়। এমন সময় ওরা শুনতে পায়, বহু দূরে কে যেন গাইছে, 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় ...।'

টনি বলে, "বিপিনকাকার গলা না?"

তপু বলে, "বিপিনকাকার গলা এমন হতেই পারে না!"

"তবে?"

"বাড়ি চল সবাই। এখানে আর এক মিনিটও নয়!"

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দ্যাখে, বিপিনকাকার ছেলে অমল হাপুস্ চোখে কাঁদতে-কাঁদতে বেরিয়ে যাচ্ছে। তপু বলে, "কী রে অমল! কী হয়েছে?"

অমল কোনও কথা বলে না। একবার টনির মুখের দিকে তাকিয়ে চলে যায়। বাড়িতে ঢুকে দ্যাখে, মা, জেঠিমা, এমনকী দিনুদাও বারান্দায় বসে কাঁদছে।

"কী গো, কী হয়েছে মা?"

"কী হয়েছে কাকিমা? কাঁদছ কেন তোমরা?"

ওরা বারান্দায় উঠে দ্যাখে, মেঝেতে দুটো একশো টাকার নোট ভাঁজ হয়ে পড়ে। তার পাশেই বিপিনকাকার সব সময়ের সঙ্গী সেই লাঠিটা।

মা বললেন, " জানিস, তোদের বিপিনকাকা আর নেই! ওর ভাইরা হাসপাতাল থেকে দেহ নিয়ে এসেছে। হাসপাতালে পৌঁছনোর ঘণ্টাখানেক পরেই মারা গেছে!"

তপু-গোপুর গলায় আক্ষেপের স্বর। চোখে জল। রনি-টনির মনটাও বিষণ্ণ। এ ক'দিন বিপিনকাকার কাছে কত গল্প শুনেছে! ছেলেবেলার দস্যিপনার গল্প, ভূতের গল্প! সত্যি-সত্যি সেই বিপিনকাকা আর নেই! তা হলে যে থলেয় আম ভরে দিল, সে কে? তবে কি...!

টনি হিসেব মেলাতে পারে না। ভাবে, তা হলে তপু-গোপুই কি বাজি জিতে গেল! নাকি এ বাজিতে শুধু তপু-গোপু নয়, চারজনই জিতে গেল বাজিটা। বিপিনকাকা জিতিয়ে দিল সব্বাইকে।

ছবি: দেবাশিস দেব



নিস্তারিণীর হাসি

শমিত মণ্ডল

পঞ্চু ঘোষাল ঝাঁকড়া লিচুগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে বলল, "এই যে রাধাকৃষ্ণ কুটির। অবশ্য কুটির কথাটা বাড়াবাড়ি। দেখছেন তো, কেমন পেল্লায় বাড়ি।" পঞ্চু ঘোষাল এ অঞ্চলের নামী দালাল। গতকালই চায়ের দোকানে আলাপ সুজয়ের সঙ্গে। অল্প পয়সায় বাড়িভাড়া খুঁজছে শুনে এ-বাড়ি দেখাতে নিয়ে এসেছে।

"যান, আপনি ভিতরে গিয়ে দেখে আসুন।"

"আপনি যাবেন না?" অবাক হয় সুজয়।

"আমি এখানে ছায়ায় দাঁড়াই। শরীরটা ভাল না।"

অগত্যা একা-একাই যেতে হল সুজয়কে। সামনে-পিছনে মিলে ছোট-বড় সাত-আটটা ঘর তো হবেই। বড়-বড় জানলা। গাছপালা-ঘেরা বাড়ি। পিছনের দিকে কুয়োতলা। বড় উঠোনের একপাশে তুলসী মঞ্চ। একটা কাঠচাঁপার মস্ত গাছ। অনেক পুরনো একটা শিউলি। চারদিক পরিষ্কার, একটা পাতাও পড়ে নেই। খুশি হয়ে সুজয় ফিরে আসে পঞ্চুর কাছে।

"সামনের এই দু'টো ঘর আপনি ব্যবহার করবেন। জল বলতে কিন্তু কুয়ো। খাওয়ার জল রাস্তার ধারে টিউবওয়েল থেকে নিয়ে আসতে হবে। ইলেকট্রিকও অবশ্য নেই। একলা মানুষ আপনি, অসুবেধে কী!"

রোগাপাতলা মানুষটা এটুকু কথা বলেই হাঁপাতে লাগল। শাঁ করে খানিক নস্যি নাকে টেনে তবে সুস্থির! "ভাড়ার কথা ভাবছেন তো? বেকার মানুষ আপনি, কী আর বলি, দেবেন দু'শো টাকা। কোনও তাড়াহুড়ো নেই, মাস ফুরোলে দেবেন। পঞ্চু দালাল কিন্তু ভাই ওরকম না।" তড়বড় করে চলে গেল লোকটা।

খোলা দরজাটা ভেজিয়ে দিল সুজয়। একটু আগে একপশলা ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। দক্ষিণমুখো বিশাল জানলা দিয়ে চমৎকার ঠান্ডা হাওয়া আসছে।

নিজের জীবনের কথা ভাবছিল সুজয়। সেই ছেলেবেলায় মা-বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই পিসির বাড়িতে মানুষ।

সেখানে বেশ আদরেই বড় হয়েছে সে। পিসেমশাইয়ের কাপড়ের ব্যবসা ছিল জমজমাট। প্রায়ই বাড়িতে কীর্তনের আসর বসত। বৈষ্ণববাড়ি, বাড়িসুদ্ধ সবাই নিরামিষাশী। সেই থেকে সুজয়ের নিরামিষ খাওয়ার অভ্যেস। হঠাৎ পিসিমা মারা যাওয়ায় বিপত্তি। ব্যবসা প্রায় লাটে, কিন্তু সেদিকে পিসতুতো দাদাদের নজর নেই। তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া নিয়েই ব্যস্ত। বিরক্ত হয়ে সুজয় ভূগোলস্যার প্রণববাবুর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ছোট ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে পড়ার খরচ জোগাড় করে নিত। তারপর একদিন হঠাৎ এই শহরে এল ভূগোলে অনার্স পড়ার জন্য।

হঠাৎ ক্যাঁচকোঁচ একটা শব্দ হল দরজায়। ধীরে-ধীরে খুলে গেল দরজাটা। চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল সুজয়। হাল্‌কা বাতাসে ক্ষীণ মোমবাতির শিখাটা কাঁপছে। সুজয়ের মনে হল, এক্ষুনি বোধ হয় নিভে যাবে। উঠে, ভাল করে চেপে দরজাটা বন্ধ করল। পুরনো আমলের ভারী দরজা। এসে বসেছে সবে, আবার খুলে গেল দরজাটা। বিরক্ত হয়ে এবার সুজয় ছিটকিনি এঁটে দেয়। ব্যস, আর খুলবে না! এই ভেবে বসতে না-বসতেই হাল্‌কা খসখস শব্দ হল ওর পিছনে। জামাকাপড়ের শব্দ যেমন হয়। প্রায় ঘাড়ের কাছে। পিছন ফিরে তাকাল সুজয়। না, কেউ নেই, কিছুই নয়। তবুও কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। কেউ যেন হাঁটা-চলা করছে ঘরে। তবে কি...! না, মন শক্ত করে বসল সুজয়। হঠাৎ টের পেল, হাল্‌কা একটা স্পর্শ, মাথায় কে যেন খুব আস্তে হাত বুলিয়ে দিল। চমকে উঠল সুজয়। একটু ভয়-ভয়ও করছে। তবুও নিজেকে সামলে নিল। ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। ঘরের ভিতরে কেউ একটা যে আছে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মনে সাহস এনে জোর গলায় প্রশ্ন করল, "কে তুমি? কী চাও, হ্যাঁ? সামনে এসে বলো।"

একটু সময় কেটে গেল। হাল্‌কা একটা স্বর, একটু অনুনাসিক স্বর ভেসে এল, "আসতে তো পারি সামনে, কিন্তু আমাকে দেখে শেষে ভিরমি খাবি না তো রে ছোঁড়া?" সুজয় বুঝতে পারে কণ্ঠস্বরটি এক বৃদ্ধার। "দেখিস বাপু, শেষমেশ আমাকে আবার দুষিসনি যেন!"

মোমবাতির কম্পিত শিখায় ধোঁয়া-ধোঁয়া যে মূর্তি স্থির হল, সেটা সাদা থান পরা এক বৃদ্ধার। মাথায় কদমছাঁট চুল। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে শরীরটা। প্রথমটা একটু চমকে উঠলেও সামলে নেয় সুজয়। না, ভয়ের কী আছে, ঠাকুমা-দিদিমা'র মতোই তো চেহারা! ভূত-পেতনি বলে তো মনে হচ্ছে না! "প্রতিদিনই সন্ধেবেলায় যাই হরিসভায়। মন্দিরের পাশে নিমগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে কেত্তন শুনি। তা আজ বাঁশবেড়ের মথুর ঠাকুর এসে এমন চমৎকার 'মানভঞ্জন' গাইলে, পুরোটা না শুনে বাড়ি ফিরি কী করে! এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে, তুলসীতলায় প্রণাম সারব বলে শাঁ করে এসে দেখি, ঘরে ধূপকাঠির গন্ধ, তুলসীমঞ্চে একখানা ধূপ পোঁতা। এদিকে বৈঠকখানা ঘরে দেখি, মোম জ্বেলেছে কে। ঘরে ঢুকে দেখি, তুমি, গায়ে একফোঁটাও আমিষের গন্ধ নেই। কী শান্তি, কী শান্তি! তা বাবা, তুমি এয়েচ কোথা থেকে? এখেনে ঢোকালে কে, ব্যাটা পঞ্চু নিশ্চয়ই!"

নিজের পরিচয় দেয় সুজয়। সব শুনে খুব খুশি হয় বুড়ি। সুজয়কে নাতির ছেলে 'পুতি' পাতিয়ে ফেলল। সেই সঙ্গে চলল পঞ্চুর মুণ্ডুপাত। পঞ্চু এখন এই বাড়ি বিক্রি করে হালফ্যাশনের ফ্ল্যাট বানাতে চায়। কিন্তু বাদ সেধেছে বুড়ি। পঞ্চু এ-বাড়িতে ঢুকলেই গায়ে-মাথায় পড়ে মাঝারি সাইজের ইটের টুকরো। এখন সে বাসনা ত্যাগ করে একেবারে বিক্রি করে দিতে চায়। কিন্তু 'ভূতের বাড়ি' বলে বদনাম রটে গিয়েছে। এখন একে-তাকে ধরে এনে ভাড়াটে, কখনও বা বিনিপয়সার কেয়ারটেকার হিসেবে রেখে বাড়িটার বদনাম ঘোচাতে চায়। কিন্তু ভূতের উপদ্রবে এক রাতের বেশি কেউ টিকতে পারে না। একবার তো পঞ্চুর মেশোমশাইয়ের ভাই বুক ফুলিয়ে এ-বাড়িতে রাত কাটাতে এসে অজ্ঞানটজ্ঞান হয়ে সে এক কীর্তি! "বটে! দু'শো টাকা ভাড়া চেয়েচে? দেখাচ্চি মজা! আমার পুতির কাছ থেকে টাকা নেবে! শোন, তুই ওই নচ্ছারটাকে ভুলিয়েভালিয়ে রাত্তিরে না হয় সন্ধেবেলায় একবার এই ঘরে আন দিকিনি। তারপর দ্যাখ, আমি ওর কী হাল করি!"

বুড়ি সুজয়কে নিজের লোক মনে করে স্বচ্ছন্দে 'তুই' সম্বোধন করে। সুজয় এতে খুশিই হয়। সেও 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে আসে।

"তুমি কি ওর ঘাড় মটকে দেবে নাকি?"

"রাম রাম, তা কখনও পারি! আমরা হলাম সাতপুরুষের বোষ্টম।" সুজয় অবাক হয়ে লক্ষ করে, বুড়ি কেমন স্বচ্ছন্দে রাম নাম উচ্চারণ করল। শরীরটা শুধু একটু কেঁপে উঠল মাত্র।

"আচ্ছা ঠাকুরমা, তুমি তো মরে ইয়ে, পেতনি হয়েছ। কিন্তু দিব্যি রাম নাম করছ দেখছি!"

বুড়ি খুব খুশি হয়। নড়েচড়ে বসে বলল, "হে হে, সবই নামের ফল রে বাবা। সারা জেবন রাধামাধবের সেবা করেচি, হরেকেষ্ট নাম করেচি, সেই রেশ রয়ে গিয়েছে এই পেতনি জন্মেও। প্রথম-প্রথম কষ্ট হত খুব। শরীরটা ভেঙে পড়তে চাইত, কিন্তু আমি জোর করে নাম্ করে-করে সইয়ে নিয়েচি। এখন শরীরটা একটু কেঁপে ওঠে মাত্র!"

"বা, বেশ মজা তো! পেতনির মুখে রাম নাম!"

বাজারের ব্যাগ হাতে গেটের বাইরে পা দিয়ে সুজয় দেখল, সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ অবাক হয়ে তাকে দেখছেন।

"এ-বাড়িতে কবে এসেছেন?"

"গতকাল।"

"তার মানে রাতে ছিলেন? কোনও ইয়েটিয়ে, মানে..."

"ভূতপ্রেত? না দেখিনি।"

"অথচ দেখুন, লোকে বলে ভূতের বাড়ি। আমার শ্যালক তো কিনবে বলে ভেবেছিল, কিন্তু নিস্তারিণী বুড়ির কথা শুনে..."

"কে নিস্তারিণী বুড়ি?"

"সে মশাই অনেক কথা। শ্বশুরের ভিটে আঁকড়ে পড়ে ছিল



নিস্তারিণীর হাসি

বুড়ি রাধামাধবের জন্য। সবাই কলকাতা গেলেও বুড়ি যায়নি। এসব অঞ্চল তখন ম্যালেরিয়ার জন্য কুখ্যাত ছিল। একা ফাঁকা বাড়িতে মরে পড়েছিল বুড়ি। সেই থেকে নাকি এ-বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। পুজোআচ্চাও নাকি করে, হে হে।" চুপ করে থাকে সুজয়। "দেখি, আবার খবর দিতে হবে শ্যালকবাবুকে।" বলে চলে যান ভদ্রলোক।

"রাতে কেমন ঘুম হল? কোনও অসুবিধে হয়নি তো!" কখন যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে পঞ্চু।

"না, অসুবিধে আর কী!" একটু হাসে সুজয়। পকেট থেকে পঞ্চু খইনি-চুনের কৌটো বার করে একমনে খইনি তৈরি করতে-করতে বলল, "সবাই বলে ভূতের বাড়ি! এই তো দিব্যি আপনি রাত কাটালেন। ওই যে কথা বলছিল আপনার সঙ্গে, নেত্য হালদার, শ্যালকের জন্য এ-বাড়ি দেখেছিল। তখন দর দিয়েছিলাম সাড়ে চার লাখ, নিলে না। এখন এ-বাড়ি সাতের কমে ছাড়ব না। থাকুন তো মশাই চেপে আপনি দু'-এক মাস।"

বুড়ির বুকের ভিতর কত কথাই না জমা হয়েছিল! সুজয়কে ভাল শ্রোতা পেয়ে বুড়ি এখন সব উজাড় করে দেয়। নিজের জন্মসাল জানে না বুড়ি। তবে রবিঠাকুরকে সে একবার দেখেছিল, "আহা, কী চমৎকার দাড়ি!"

দিনকয়েক পরে বুড়ি বলে আসল কথা, "সোনা আমার, মানিক আমার, এবারে আমাকে মুক্তি দে বাবা! আমার রাধামাধবের ভার তুই নে।"

"না না, ওসব নিয়মকানুন আমার ধাতে সইবে না। বেশ আছি ঝাড়া হাত-পা।" প্রবল আপত্তি জানায় সুজয়। কিন্তু বুড়িও নাছোড়বান্দা। প্রতিদিনই ঘ্যান-ঘ্যান করে। সুজয় কিছুতেই রাজি হয় না।

সেদিন কলেজ থেকে ফেরার পরে তুমুল ঝগড়া হল দু'জনের। বন্ধুদের পাল্লায় পরে কলেজ ক্যান্টিন থেকে একটা ডেভিল খেয়েছিল সুজয়। বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই পায়ের কাছে এসে পড়ল একটা ইটের টুকরো। বুড়ি কিছুতেই ঘরে ঢুকতে দেবে না! সে কী তর্জন-গর্জন, "ও সব ছাইপাঁশ গিলে ভরসন্ধেয় উনি ঘরে ঢুকবেন! ছ্যা-ছ্যা! সারা বাড়ি আমিষ করে দিলে গা! নেয়ে এসে তবে ঘরে ঢুকবি ছোঁড়া!"

সুজয়ও ঝগড়া করতে ছাড়ল না। ও কি ইচ্ছে করে খেয়েছে, নাকি খেয়ে তৃপ্তি পেয়েছে! বন্ধুরা জোর করলে ও কী করবে! কিন্তু বুড়ি কিছুতেই চাড়ল না। সন্ধেবেলায় আবার স্নান করতে হল সুজয়কে। দু'-একটা হাঁচিও হল বইকী! কিন্তু তাতে কার কী? দু' দিন সুজয় ভাল করে কথা বলল না বুড়ির সঙ্গে। শেষে বাবা-বাছা করে বুড়িই মান ভাঙাল সুজয়ের।

একমাস হয়ে গেল সুজয়ের এ-বাড়িতে। পঞ্চু এর মধ্যে আর আসেনি। মগরার কাছে কোথায় জলের দরে জমি বিক্রি হচ্ছে, সেটা নিয়ে ব্যস্ত। দু' দিন দু'জন সম্ভাব্য ক্রেতা এ-বাড়ি দেখতে এসে বুড়ির হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছে। বুড়ির ধাক্কায় পড়ে গিয়ে পা মচকেছে। আজ শনিবার। কলেজ ছুটি। সারাদিন বাড়িতেই ছিল সুজয়। নিস্তারিণী দেব্যার তো সারাদিন ঘুমনোর কাজ। বিকেলে জেগে ওঠে। এটাই স্বাভাবিক। বুড়ি যাই বলুক, সুজয় ঠিক করেছে, বাড়ি ভাড়ার দু'শো টাকা পঞ্চুর হাতে ও তুলে দেবে। এক মাস হয়ে গেল, এবার যে-কোনও দিন এল বলে! এখনও দিনের আলো রয়েছে। শুয়ে একটা মজার বই পড়ছিল সুজয়। এক সময়ের ডাকসাইটে ভূতের ওঝা শিবচরণ ভূতবিশারদের লেখা 'সহজ ভূত বশীকরণ প্রণালী'। কীভাবে বিদেশি ভূতদের সঙ্গে টেলিগ্রাফিক পদ্ধতিতে যোগাযোগ করা যেতে পারে, তার একটা হদিশ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। আর দেশি ভূতদের নানা কথা বলে কীভাবে নানারকমের কাজ, যেমন বিছানা পাতা, মশারি টাঙানো, জল বওয়া, পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়া, তারই কৃৎকৌশল ঝরঝরে ভাষায় লেখা।

"সুজয়বাবু আছেন নাকি?" পঞ্চুর গলা।

বই বন্ধ করে সাড়া দিল সুজয়, "চলে আসুন ভিতরে।"

"আরে ভাই, আপনিই আসুন না বাইরে।"

মোমবাতি জ্বালায় সুজয়। ঘরের ভিতরে আবারও আসতে বলে। দরজায় দাঁড়িয়ে দ্যাখে, গেটের কাছে পঞ্চু ইতস্তত করছে, "ভয় পাচ্ছেন নাকি ভিতরে আসতে?" হেসে জিজ্ঞেস করে সুজয়।

"না, ভয় কিসের, কাকে ভয় আমার!" বলতে-বলতে ভিতরে আসে পঞ্চু।

খুব তাড়াতাড়ি নামতে থাকে সন্ধ্যার অন্ধকার। একঘেয়ে সুরে ডাকছে ঝিঁঝিপোকা। জামরুল গাছের ডালে কী একটা পাখি ডানা ঝাপটাল।

"ওফ, কতদিন পরে যে ঘরে ঢুকলাম। বাঃ, বেশ সাজিয়েগুছিয়ে নিয়েছেন দেখছি! ভাড়ার টাকাটা..."

দু'শো টাকা মানিব্যাগ থেকে বার করে দেয় সুজয়।

"সুজয়বাবু, সামনের মাস থেকে কিন্তু ডবল ভাড়া লাগবে।" হাত বাড়িয়ে টাকাটা সবে নিয়েছে পঞ্চু। হঠাৎ কে যেন পঞ্চুর হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল টাকাটা। শূন্যে দুলতে লাগল দুটো একশো টাকার নোট। পঞ্চুর মুখে একবার ঝাপটাও মারল নোট দু'টো।

"এ কী কাণ্ড!" কথাটা অনেক কষ্টে বলতে পারল পঞ্চু।

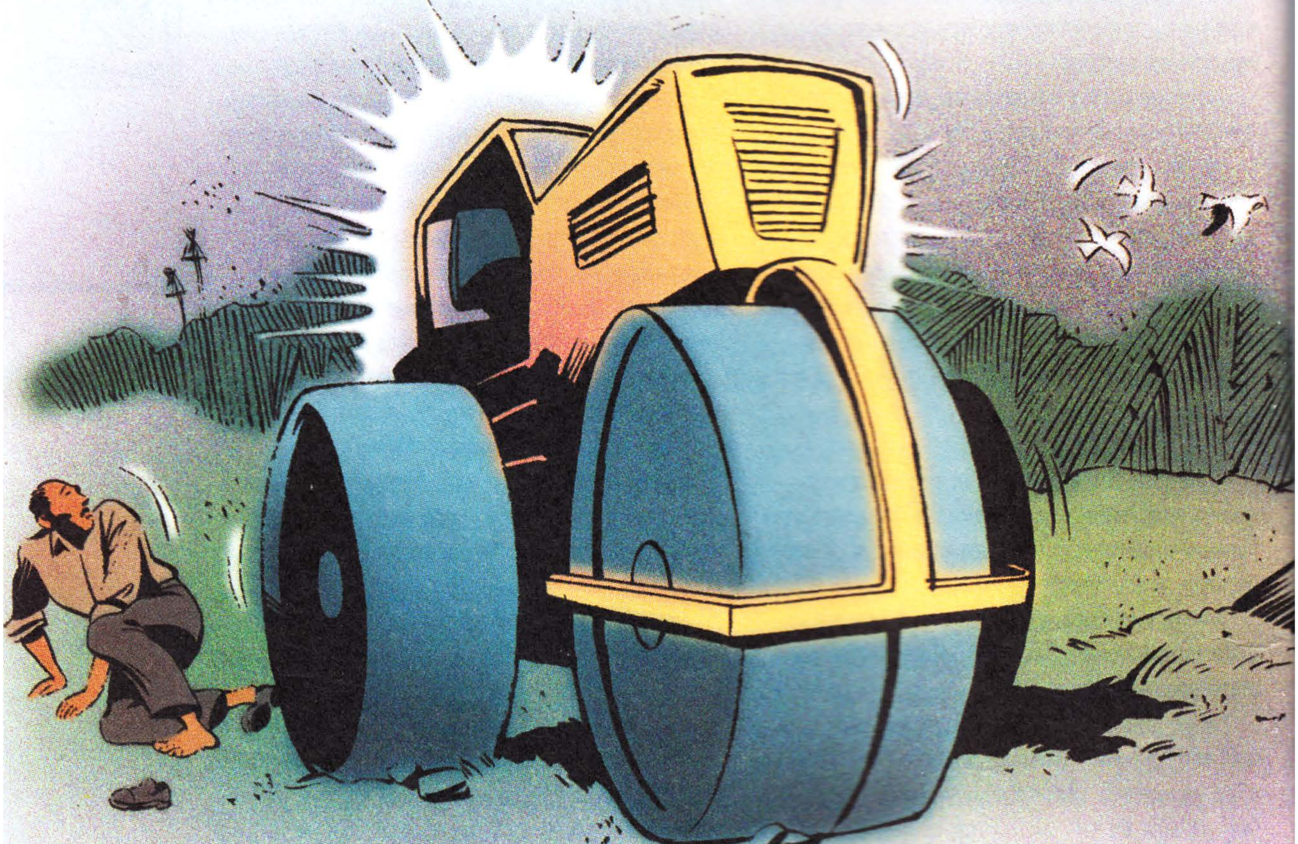
তারপর সে এক বিচ্ছিরি দৃশ্য। একটা কঙ্কালের হাত, শুধুমাত্র কনুই পর্যন্ত, নোটগুলো ধরে আছে। আর পারে না বেচারা পঞ্চু! মুখ দিয়ে বু-বু আওয়াজ করতে থাকে। ঘেমে-নেয়ে গিয়েছে একেবারে। এক পা, এক পা করে পিছু হটতে থাকে। মুখের শব্দ বন্ধ হয়নি। দরজার বাইরে পা দিয়ে লম্বা পায়ের মারাত্মক একটা দৌড় লাগায়। ঘণ্টায় কত কিলোমিটার বেগ কে তার হিসেব করে!

অনেকক্ষণ হাসি চেপে ছিল সুজয়। এবারে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। বুড়িও হাসতে লাগল। দু'জনের দু'রকম গলার হাসিতে কাঁপতে থাকে মোমবাতির শিখা।

ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

ভুতুড়ে রোলার

বিপুল মজুমদার



গোটা এলাকা আচ্ছন্ন ধুলো আর ধোঁয়ায়। রাস্তার একপাশে টার বয়লারে পিচ গলানো হচ্ছে। পাশেই স্পটমিক্স প্ল্যান্টে মশলা মাখাইয়ের কাজ চলছে। সবার পিছনে দশরথের আট টনের জেসপ রোলার তার ভারী শরীর নিয়ে রাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত। ধোঁয়া-ধুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে শব্দের তাণ্ডব। তিন-তিনটে মেশিনের গর্জনে কান বধির হয়ে যাওয়ার উপক্রম। রাস্তার অর্ধেকটা যান চলাচলের জন্য ছেড়ে দিয়ে বাকি অর্ধেকটায় মেরামতির কাজ চলছে। সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে যেতে হচ্ছে বলে যানবাহনের জট পাকিয়ে যাচ্ছে মাঝেমধ্যে। আর তখন গাড়িগুলোর হর্নের শব্দও কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। হেল্পার শুকদেবের আর ভাল লাগছে না। তিনঘণ্টা একটানা কাজ করে সে ক্লান্ত। ক্লান্তি যতটা না তার শরীরে, তার চেয়ে মনে বেশি। কিন্তু এসব কথা দশরথকে বলা যাবে না। বলতে গেলেই ক্যাচাল বেধে যাবে। লালচে চোখ দুটোকে তেরচা করে দশরথ ঠিক বলে উঠবে, "গাঁয়ের ছেলের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করা পোষায় কখনও! ভাল না লাগলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চাষ করগে যা!"

কাল ডাক্তারবাবুর মুখে সতর্কবার্তাটা শোনার পর থেকেই শুকদেবের মনমেজাজ খারাপ। ডাক্তারবাবু বিষণ্ণমুখে বলেছিলেন, "রোগটা তেমন সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না মশাই। কলকাতায় গিয়ে ভাল কোনও জায়গা থেকে ছেলের রক্তটা পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে আসুন।"

মাসদুয়েক ধরে শুকদেবের ছেলে অভি অসুখে ভুগছে। বিচিত্র অসুখ। কেউ রোগ ধরতেই পারছে না। স্থানীয় ডাক্তারবাবুরা ফেল মেরে গেলে শেষপর্যন্ত দিনদশেক আগে সদর শহর চুঁচুড়ায় ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিল শুকদেব। খুঁজেপেতে ভাল ডাক্তারও জোগাড় করেছিল। কিন্তু তাঁর চিকিৎসাতেও তেমন উন্নতি হল না। শেষমেশ সেই ডাক্তারবাবুই কপালে একগন্ডা ভাঁজ ফেলে রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেই তো হল না। এই মুহূর্তে কলকাতায় যাওয়া চাট্টিখানি কাজ নয়। পুরোদমে রাস্তার কাজ চলছে। সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত রোলার

চলছে একটানা। এখন ছুটি চাইতে যাওয়া মানে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ধাতানি খাওয়া। সবচেয়ে বেশি ভয় দশরথকে। কথায় আছে না, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! সাহেবকে ম্যানেজ করা গেলেও দশরথকে রাজি করানো শিবেরও অসাধ্য। ছুটির কথা শুনলেই দাঁতমুখ খিঁচোবে দশরথ। বলবে, "ফোকটে চাকরি পেয়েছিস তো, তাই বুঝছিস না কত ধানে কত চাল। ব্যাটা কুঁড়ের বাদশা। কাজের সময় কোনওরকম ছুটিফুটি নেওয়া চলবে না। হেল্পার ছাড়া ড্রাইভার কাজ করবে এটা তুই ভাবলি কী করে?"

মাথার উপরের গনগনে রোদ হাইরোডের দু'পাশের গাছের চাঁদোয়ার জন্য অনেকটাই ফিকে। প্লাস্টিকের বোতল থেকে কয়েক ঢোক জল গলায় ঢেলে আকাশের দিকে তাকাল শুকদেব। মাথার উপরের ঝাঁকড়া কৃষ্ণচূড়া গাছটার জন্য বড্ড মায়া হল তার। তিন-তিনটে মেশিনের পেট থেকে বেরিয়ে আসা কালো ধোঁয়ায় কৃষ্ণচূড়ার সবুজ পাতা আর লাল-লাল ফুলগুলো যেন হাঁসফাঁস করছে। ঠিক তার ছেলে অভি যেমন করছে এখন! দশ বছরের ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতে আজকাল কষ্ট হয় শুকদেবের। দিন-দিন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে ছেলেটা। চোখের দৃষ্টিটাও কেমন ফ্যাকাসে। ক'দিন ধরেই ছেলের মুখে অদ্ভুত বায়না। রোলারে চড়াতে হবে তাকে। বাপের রোলারে একবার সে চাপবেই চাপবে। রোজই ঘ্যানঘ্যান করে একই কথা বলে চলেছে। বিব্রত শুকদেব এড়িয়ে যেতে চায় কিন্তু ছেলে নাছোড়বান্দা।

মহা ফ্যাচাং হল দেখছি। শুকদেব জানে তার অবস্থানটা কোথায়। ছেলের কাছে হিরো হলেও ডিপার্টমেন্টে কেউ তাকে পোছে না। একদম নিচুতলার কর্মী সে। ছেলে জানে, বাবা রোলার চালান। আট টনের ভারী গাড়িটা নিয়ে গুমগুম শব্দ তুলে বীরদর্পে রাস্তা কাঁপিয়ে এগিয়ে যান।



ছেলের কাছে হিরো সাজতে গিয়ে রোলার নিয়ে নানাধরনের গালগল্প করেছে শুকদেব। বলেছে, জেসপ রোলারটা নাকি তার কথা শোনে! সে ড্রাইভারের সিটে বসলেই রোলারের সব ব্যামো নাকি ঠিক হয়ে যায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এখন? ছেলের আবদারে রীতিমতো বিপাকে পড়েছে শুকদেব। আসল কথা হল, দশরথের দাপটে ড্রাইভারের সিটে বসার কদাচিৎ সুযোগ পায় সে। বিড়িতে দম দেওয়ার দরকার পড়লে কিংবা শরীর খারাপ লাগলে তবেই শুকদেবকে ডাকে দশরথ। নইলে হেল্পার যখন-তখন স্টিয়ারিংয়ে হাত দেবে এটা তার মনোমতো নয়।

ছেলেকে রোলারে চড়ানো যে কঠিন কাজ তা শুকদেব ভালই জানে। আগে হলে ছেলেটাকে সঙ্গে করে এনে দশরথকে বলেকয়ে রোলারে চড়িয়ে দিত শুকদেব। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। অসুস্থ ছেলেটাকে ছ'-সাত কিলোমিটার পথ ঠেঙিয়ে ঠা-ঠা রোদে টেনে আনলে ধকল সহ্য করতে পারবে না। সবচেয়ে ভাল হয় রোলারটা নিয়ে অসুস্থ ছেলেটার কাছে পৌঁছে যাওয়া। সেখানে এক রাউন্ড চড়িয়ে ফিরে এলেই হয়ে যায়। কিন্তু কে তাকে সে সুযোগ করে দেবে? মাথার উপর সাহেবসুবোরা থাকলেও দশরথ ইচ্ছে করলেই এ-কাজটা করতে পারে। রোলার ড্রাইভার হলেও দপ্তরে তার দাপট আছে। ইউনিয়নের নেতা সে। এমনকী, সোজাপথে না হলে বাঁকাপথেও সে শুকদেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারে। কিন্তু কিছুতেই তা করবে না দশরথ। কালই তো শুকদেবের ইচ্ছের কথাটা শুনে পান খাওয়া লাল দাঁতে ব্যাঙ্গের হাসি খেলে গিয়েছিল দশরথের। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "রোলার কি ছেলের হাতের খেলনা নাকি! আমি কি পাগল হয়েছি যে, ছ'-সাত কিলোমিটার পথ ঠেঙিয়ে একগাদা তেল পুড়িয়ে তোর বাড়িতে গিয়ে হাজির হব! ওসব ন্যাকামি ছাড়।"

"ছেলেটা রোগে ধুঁকছে দশরথদা। তুমি ইচ্ছে করলেই ওর মনের স্বাদ মেটে। তেমন হলে তেলের খরচ না হয় আমিই দিয়ে দেব। সাহেবকে ম্যানেজ করে একবারটির জন্য রোলারটা নিয়ে চলো দাদা। প্লিজ়।"

"ভাগ তো," মাছি তাড়ানোর মতো করে হাত নাড়িয়েছিল দশরথ, "ছেলে আবদার করল আর সঙ্গে-সঙ্গে তুই নেচে উঠলি! ওরে, এটা সরকারি গাড়ি, আমার বাপের সম্পত্তি নয় রে। কাজ কর,কাজ কর।"

নিজে ছেলের বাবা হয়েও দশরথ বুঝতে চাইল না। রোলার চালাতে-চালাতে আর কন্ট্রাক্টরের কাছে হাত পাততে-পাততে ওর অনুভূতিগুলো সব ভোঁতা হয়ে গেছে। কালকের কথা আজ আবার মনে উদয় হওয়ায় শুকদেবের মন আরও খারাপ হয়ে গেল। দিন বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সূর্য যত গনগনে হতে থাকল শুকদেবের বিষণ্ণতা ততই বেড়ে চলল। মনে পড়ল আজ সকালের কথা। আজ সকালেই দু'হাতে শুকদেবের গলা জড়িয়ে ধরে ক্ষীণ কণ্ঠে অভি বলেছিল, "বাবা, অটোর মতো রোলারের চাকাও বুঝি তিনটে?"

"না বাবা, রোলারের চারটে চাকা। সামনের চাকা দুটো একসঙ্গে গা ঘষাঘষি করে থাকে বলে তিনটে বলে মনে হয়।"

"তাই? ইস, কবে যে তোমার রোলারে চাপব! আমায় তুমি কবে রোলারে চাপাবে বাবা? আমার যে ভীষণ ইচ্ছে করে..."

হঠাৎ একদঙ্গল মানুষের মিলিত আর্তনাদ ধুলো-ধোঁয়ার সঙ্গে পাক খেয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। গেল-গেল রব উঠল আশপাশ থেকে। রাস্তার কাজে ব্যস্ত এস. এ. ই, ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট আর কুলিকামিনরা মুহূর্তের জড়তা কাটিয়ে দুদ্দাড় দৌড়ে এল। নিমেষে থেমে গেল টার বয়লার আর স্পটমিক্স প্ল্যান্টের ঘড়ঘড়ানি। রোলার চলছিল নিজের নিয়মে। চাকার গা ঘেঁষে পিছন-পিছন চলছিল শুকদেব। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে এসব কোনও ব্যাপারই নয়। রোলারের আগুপিছুর সঙ্গে তাল রেখে হেল্পার শুকদেব হামেশাই এমন আগুপিছু করে থাকে। কিন্তু আজ সে নিজের মধ্যে ছিল না। তার মন চলে গিয়েছিল বিছানায় শয্যাশায়ী দশ বছরের ছেলেটার কাছে। অন্যমনস্কতাই তার কাল হল। দশরথ ক্লাচ নিয়ে লিভার ঠেলে গাড়ি পিছন দিকে ব্যাক করতেই আনমনা শুকদেব চাকার তলায় চলে গেল!

তারপর কয়েকটা ঘণ্টা শুধু ঝামেলা আর ঝামেলা। ডাক্তার, হসপিটাল, থানা-পুলিশের চক্করে পড়ে সকলেরই প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার দশা। তার মধ্যেই কেউ একজন শুকদেবের বাড়ির লোকদের খবর দিল। তারা এল। ইঞ্জিনিয়ারসাহেব চাইলেও কান্না-বিধ্বস্ত শুকদেবের বউ শুকদেবের মৃতদেহকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইল না। অসুস্থ ছেলের সামনে মৃত স্বামীকে হাজির করানোর সাহস তার নেই। যদি কিছু হয়ে যায়! যদি মানসিক আঘাতে ছেলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে! শেষপর্যন্ত শুকদেবের স্ত্রীর ইচ্ছে অনুসারে স্টকইয়ার্ড থেকেই সরাসরি শ্মশানের উদ্দেশে যাত্রা করল সকলে।

॥২॥

সকাল দশটায় ইঞ্জিনিয়ারসাহেব অফিসে ঢুকতেই নাইটগার্ড পশুপতি ছুটে এল। পশুপতির চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। হাঁপাতে-হাঁপাতে সে বলল, "স্যার, আমি আর রতন কাল সারারাত ভীষণ টেনশনে ভুগেছি। ভয়ংকর কাণ্ড স্যার, জেসপের আটান্ন-উনষাট রোলারটাকে ভূতে পেয়েছে।"

অফিসে ঢুকে সবেমাত্র নিজের চেয়ারে বসেছেন সাহেব। এক গ্লাস জল খেয়ে ঘর্মাক্ত শরীরটাকে যে জুড়োবেন, সেই সুযোগও দিল না পশুপতি। হুট করে মেজাজ খিঁচড়ে গেল সাহেবের। "ইয়ার্কি মারার জায়গা পাসনি... রোলারের ঘাড়ে ভূত চেপেছে! বেরো ঘর থেকে।"

সাহেবের চিৎকারে দমে গেলেও হাল ছাড়তে চাইল না পশুপতি। হাতজোড় করে বলল, "বিশ্বাস করুন স্যার, রাত দুটো নাগাদ হঠাৎ শুনি রোলারের ইঞ্জিন ভটভট করে উঠল! আমি আর রতন তখন দক্ষিণের শেডটার কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। শব্দ শুনে ছুটে গেলাম। দেখি, রোলারটার চাকা একটু-একটু করে গড়াতে শুরু করেছে। রোলারটা এগিয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে। স্টকইয়ার্ডের ওদিকটায় ভাল আলোর ব্যবস্থা নেই। দেখলাম, ড্রাইভারের সিটে ছায়া-ছায়া কে



ভুতুড়ে রোলার

একজন বসে রয়েছে! রতন, আমি দু'জনেই 'কে কে' বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম। রতন তো 'চোর-চোর' বলে হল্লাও জুড়ে দিল। একটু পরেই দেখি, আমাদের চিৎকার চেঁচামেচিতেই বোধ হয় ড্রাইভারের সিট থেকে ছায়ামূর্তি উধাও!"

"উধাও! চালাকি নাকি? স্টকইয়ার্ডে জলজ্যান্ত একটা লোক ঢুকল, বিনা চাবিতে গাড়ি স্টার্ট করল, আবার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ভোজবাজির মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল। আমায় কি তোরা বাচ্চা পেয়েছিস?" সাহেব বেশ বিরক্ত।

বিব্রত পশুপতি, "বিশ্বাস না হলে রতনকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন স্যার।"

সাহেবের ভুরু কুঁচকে গেল, "ডাক তবে রতনকে।"

রতন এসে একই কথা বলল। আর-একবার ওই ঘটনার বর্ণনা শুনে সাহেব রতনকে বললেন, "তোর কি মনে হয় রোলার চুরি করে কেউ পালানোর মতলবে ছিল?"

রতনের চোখে হঠাৎ ভয়ের ছায়া, "প্রথমে তাই ভেবেছিলাম স্যার। পরে সবদিক ভেবে দেখলাম ওটা ভূতেরই কাণ্ড। নইলে দু'জনের চোখের সামনে থেকে দুম করে একটা লোক নিজে-নিজে উবে যেতে পারে না!"

"থাম তো। ভূতের খেয়েদেয়ে কাজ নেই রোলার চালাতে আসবে! সত্যি পারিসও বটে তোরা," মৃদু ধমক দিলেন সাহেব।

সাহেব ঘটনাটাকে কিছুতেই পাত্তা দিতে চাইছেন না দেখে তলে-তলে ক্ষুব্ধ হল পশুপতি। অবশ্য এটাও ঠিক যে, এসব ঘটনা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কাল থেকেই তার মাথার মধ্যে একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। ভেবেছিল, কথায়-কথায় সাহেবকে সেটা খুলে বলবে। কিন্তু মানুষটা তো হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছেন সব। তবু মরিয়া হয়ে সে বলে উঠল, "আমার মন বলছে, ওটা শুকদেবের প্রেতাত্মার কাজ। ওই রোলারের চাকার তলাতেই তো...! তা ছাড়া রোলারটার প্রতি খুব টান ছিল ওর। খুব যত্ন করত গাড়িটার। ধুয়েমুছে সারাক্ষণ ঝকঝকে তকতকে করে রাখত।"

গুম মেরে গেলেন সাহেব। কিছু সময় চুপচাপ কাটিয়ে দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, দিনসাতেক রোলারটার উপর নজর রাখ তোরা। তারপর দেখব কী করা যায়।"

সাহেবের কথায় পশুপতি আর রতন সেদিন রাত থেকেই জে-ফাইভ এইট ফাইভ নাইন রোলারটার উপর কড়া নজর রাখতে শুরু করে দিল। কিন্তু ভুতুড়ে কাণ্ড থামল না। বিরাট স্টকইয়ার্ডের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দু'জনকে পাহারা দিতে হয়। পশুপতিরা রোলারটা থেকে একটু দূরে গেলেই ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গাড়ি চলতে শুরু করে। ওরা টর্চ হাতে হইহই করে ছুটে এলে আবার গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। ঠিক যেন চোর-পুলিশ খেলা। শেষপর্যন্ত এমন হল যে, সবকিছু বাদ দিয়ে পশুপতি আর রতন রোলারটার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রাত কাবার করতে লাগল।

॥৩॥

সাতদিনের মাথায় সাহেবের ঘরে ডাক পড়ল দশরথের। দশরথ ঘরে ঢুকতেই চিন্তাগ্রস্ত সাহেব বললেন, "এ তো দেখছি মহা ঝঞ্ঝাটিয়া কেস। কী করা যায় বলো তো দশরথ?"

অফিসময় আলোচ্য বিষয় শুকদেবের ভূত। তার রোলারের উপর শুকদেবের নজর পড়ায় দিনকয়েক ধরে দশরথের মেজাজ বেশ খাপ্পা। সুযোগ পেলেই শুকদেবকে তেড়ে গালাগালি দিচ্ছে সে। অন্য ড্রাইভাররা তাদের রোলার বের করলেও তার রোলারের কাজ বন্ধ। একে তো অ্যাক্সিডেন্টের জন্য সাতদিন ধরে রোলারটা বেকার পড়ে আছে, তার উপর ভূতের উপদ্রব। সে বিরক্তির সঙ্গে বলল, "এক কাজ করুন স্যার, স্টকইয়ার্ডে ঘটা করে একটা শনিপুজো লাগান। চাইলে, বাহাত্তর ঘণ্টা নাম সংকীর্তনও করতে পারেন। রামনামে শুকদেবের ভূত পালাতে পথ পাবে না।"

কথাটা সাহেবের মনোমতো হল না। "ধুস, তা আবার হয় নাকি? সরকারি অফিসে শনিপুজো, নাম সংকীর্তন...! না হে, অন্য রাস্তা থাকলে বলো।"

"তবে এক কাজ করতে পারেন, ডিজেল ট্যাঙ্ক খালি করে রাখুন। তেল না থাকলে গাড়ি স্টার্ট নেবে কীভাবে!"

কথাটা এবার মনে ধরল সাহেবের। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "মন্দ বলোনি। ভূতের বাপের কম্ম নয় তেল ছাড়া গাড়ি চালায়!"

কিন্তু এত কিছু মতলবের পরেও জেসপ রোলারটার ইঞ্জিন গভীর রাতে আবার গর্জন করে উঠল। পশুপতি, রতন ছুটে এসে হতবাক। অন্য এক রোলারের ট্যাঙ্ক খালি করে অলৌকিকভাবে জেসপ রোলারটায় ডিজেল ভরা হয়েছে। সে রাতটা কোনওমতে কাটিয়ে পরদিন সকালেই ছুটির দরখাস্ত দিয়ে পশুপতি হাওয়া। রতন মুখ কাচুমাচু করে সাহেবকে বলল, "আমার পক্ষে একা-একা পাহারা দেওয়া সম্ভব নয় স্যার।"

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সহেব অগত্যা অফিসের সবাইকে নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে বসে পড়লেন। দশরথ বলল, "এবার আমি নিশ্চিত স্যার, ভূতটা আর কেউ নয়, শুকদেবই। ওর একটা গুণ ছিল চাবি ছাড়াই সরু একটা তার দিয়ে যে-কোনও তালা খুলতে পারত। বদমাশটা এখানে সেই কম্মই করেছে!"

"সে না হয় হল, কিন্তু প্রবলেম সল্‌ভ করি কীভাবে?" ভূতের উৎপাতে নাজেহাল সাহেব মুখ শুকনো করে ফেললেন। বললেন, "উপরতলা থেকে চাপ আসছে। কী যে করি?" পরক্ষণে কী মনে হওয়ায় চোখে যেন আলো জ্বলে উঠল সাহেবের, "এক কাজ করা যাক দশরথ, রোলারটাকে এই স্টকইয়ার্ড থেকে জাঙ্গিপাড়া স্টকইয়ার্ডে চালান করে দিই। রোলার সরলে শুকদেবও ঠান্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, শুকদেবের ভূত কেন এমন করছে! এর পিছনে রহস্যটা কী?"

"আমার মনে হয় রোলারটাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার মতলব আছে ওর।"

"বাড়ি...! সে কী, কেন?"

"ওর অসুস্থ ছেলের খুব রোলার চাপার শখ। হয়তো সেই শখ মেটাতেই...!"



ভুতুড়ে রোলার

"ও কি এসব কথা বলেছিল নাকি তোমাকে?"

"তা বলেছিল স্যার। তবে তা তো হয় না। ফালতু আবদার।"

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কিছু একটা ভেবে নিলেন। তারপর খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "ওর ছেলের তো শুনলাম ব্লাড ক্যানসার হয়েছে। ঠিক আছে, এক কাজ করো, জাঙ্গিপাড়া স্টকইয়ার্ডে রোলার নিয়ে যাওয়ার পথে শুকদেবের বাড়িতে একরাউন্ড ঘুরে যেও। ওদিকেই তো যাচ্ছ, রোলারে একপাক চড়িয়েই দিও ছেলেটাকে।"

"স্যার, শুকদেবের ছেলে এখনও জানে না ওর বাপ মারা গেছে। রোলার দেখে যদি বাপের খোঁজ করে?"

"আহা রে বেচারা! দু'দিনের অতিথিকে বাপের মৃত্যুর কথা জানিয়ে কী লাভ? যাই হোক, একটা কিছু বানিয়ে বলে দিও। আর দেরি কোরো না। যাও, রোলার নিয়ে বেরিয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি।"

॥৪॥

ট্যাঙ্কে তেল ভরে রোলার স্টার্ট করতে গিয়ে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ল। শেষপর্যন্ত মেরামতি করে স্টকইয়ার্ড থেকে বেরোতে-বেরোতে প্রায় বিকেল। ঘণ্টা দুই-আড়াইয়ের রাস্তা। তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর জন্য জোরে রোলার ছুটিয়ে দিল দশরথ। ছ'কিলোমিটার যাওয়ার পর রাস্তা দু'ভাগ হয়ে যাবে। একটা রাস্তা যাবে জাঙ্গিপাড়ায়, অন্য রাস্তা যাবে শুকদেবের বাড়ির দিকে। গাড়ি যতই এগোয় দশরথের মাথায় ততই প্যাঁচালো বুদ্ধি খেলতে থাকে। সে ভাবল, শুকদেবের বাড়িতে গেলে সময় নষ্টের সঙ্গে-সঙ্গে ফালতু কিছু তেলও পুড়বে। তা ছাড়া শুকদেবের বাড়ি ঘুরে যেতে গেলে জাঙ্গিপাড়ায় পৌঁছতে-পৌঁছতে নির্ঘাত রাত হয়ে যাবে। সুতরাং ওদিকে যাওয়া নেই। সাহেব কৈফিয়ত চাইলে কিছু একটা বলে দিলেই হবে। সে নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল, "ব্যাটা হেল্পার যতদিন চাকরি করেছে ততদিনই জ্বালিয়েছে। এবার মরে ভূত হয়েও জ্বালাচ্ছে।"

দোমাথার কাছাকাছি এসে গাড়ি থেকে নামল দশরথ। সে মনস্থির করেই নিয়েছে, কিছুতেই শুকদেবের বাড়ির দিকে যাবে না। যে ছেলে দু'দিন পরেই স্বর্গে যাবে, তার রোলার না চাপলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। রাস্তার পাশের চায়ের দোকান থেকে এককাপ চা খেয়ে আর বিড়িতে খানিক টান দিয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল দশরথ। তারপর চোয়াল শক্ত করে শুকদেবের বাড়ির রাস্তার দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে সোজা জাঙ্গিপাড়ার দিকে রোলার ছুটিয়ে দিল।

নির্জন হাইরোডে হাল্কা অন্ধকার নেমেছে। রোলারে হেডলাইট না থাকায় সাবধানে এগোচ্ছে দশরথ। যদিও এ-রাস্তায় গাড়িঘোড়া কম, তবু অন্ধকারের সুযোগে একবার ঠোক্কর লেগে গেলেই মুশকিল। রোলারের কিছু না হলেও মুড়ির কৌটোর মতো অন্যরা সব তুবড়ে যাবে। শুকদেবের বাড়ির রাস্তা দিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর আবছা অন্ধকারে দশরথের হঠাৎ মনে হল, রোলারের ছাদে কে যেন বসে রয়েছে! চোখের সামনে তার কালো-কালো দুটো পা শুধু দেখা যাচ্ছে। ভয়ে বুকের রক্ত জমে গেল দশরথের। তার শিরদাঁড়া বেয়ে এক শীতল স্রোত পায়ের দিকে নেমে গেল। তবু সে প্রাণপণে স্টিয়ারিং আঁকড়ে বসে রইল। মনে-মনে নিজেকে সাহস দিতে থাকল, ভয় পেলে চলবে না। থমথমে পরিবেশে ঘড়ঘড় করে রোলার এগোচ্ছে। একটু বাদেই ঘাড়ের কাছে কার যেন দীর্ঘশ্বাস! ভয়ে শক্ত হয়ে গেল দশরথ। কাঁপা-কাঁপা হাতে ইঞ্জিন বন্ধ করে আর্তনাদ করে উঠল, "এমন করিস না রে শুকদেব, আমি হার্টফেল করে মারা যাব।"

দশরথের মুখের কথা শেষ হল না। হঠাৎ দুটো হিমশীতল হাত এসে ড্রাইভারের সিটে বসা দশরথকে আঁকড়ে ধরল। তারপর প্রবল শক্তিতে তাকে রাস্তার পাশের শুকনো নালার মধ্যে সবেগে ছুড়ে দিল। নালায় মুখ থুবড়ে পড়েই জ্ঞান হারাল দশরথ।

॥৫॥

ঘরে-বাইরে লোডশেডিং। শুকদেবের বিধবা বউ মুমূর্ষু ছেলের মাথার কাছে বসে হাতপাখায় হাওয়া করছে। হঠাৎ শুনল, ঘড়ঘড় আওয়াজ। এ শব্দ তার চেনা। সে উৎসুক হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, একটা রোলার বাড়ির পাশের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে এই সময় এ রাস্তায় রোলার! হতবাক হয়ে গেল শুকদেবের বিধবা বউ। ছেলেটার বড় ইচ্ছে রোলারে চড়ার। কিন্তু এখন শরীরের যা গতিক তাতে চড়ার প্রশ্ন আসে না। তবে চড়তে না পারলেও একবার চোখের দেখা তো দেখতে পারে। খানিক ভেবেই নাড়া দিয়ে ছেলেকে টেনে তুলল শুকদেবের বউ, "অভি, ওই দ্যাখ রোলার।"

কাঁচা ঘুম ভেঙে চোখ মেলল অভি। জানলা দিয়ে রোলারটার দিকে একঝলক তাকিয়েই অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল, "বাবা, তুমি! রোলার নিয়ে শেষপর্যন্ত এলে তবে!"

"কী বলছিস তুই!" অভির মায়ের গলায় কান্না দলা পাকিয়ে গেল, "তুই থাম অভি। কোথায় তোর বাবা! আমি যে কিছুই...!"

"ওই তো বাবা, রোলারটার উপর বসে রয়েছে।" কথা শেষ করেই ধনুকের ছিলা থেকে ছিটকে বেরনোর মতো করে দরজার দিকে ছুটে গেল অভি। শরীর থেকে রোগটোগ সব যেন উধাও হয়ে গেছে। সে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। মা ছুটে আসার আগেই দাঁড়িয়ে থাকা রোলারটার উপরে চেপে বসল।

"অভি দাঁড়া, দাঁড়া। সোনামানিক আমার। নেমে আয় বাবা...।" শুকদেবের বিধবা বউ কাতর আর্তনাদ করে চলন্ত রোলারটার পিছু-পিছু ছুটতে থাকল। সে দেখল ড্রাইভারের সিট খালি! অভির চোখেমুখে কিন্তু হাজার পাওয়ারের আলো। বহুদিন পর সে খিলখিল করে হেসে উঠল, "মা, তুমি শুধু-শুধু ছুটো না। আমি একটু ঘুরেই চলে আসব। ভয় কী, বাবা তো সঙ্গে আছে!

ছবি: শঙ্করী বসু

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যাত্রাপথে

মু • খ • ব • ন্ধ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান - আপাতদৃষ্টিতে নিছক পাঠ্যক্রমচর্চার স্থান হলেও মানবজীবনে এর শিকড় প্রোথিত অনেক গভীরে। জীবন গড়ে ওঠার প্রথম রসদ সংগৃহীত হয় এখান থেকেই। মানসিক বিকাশেও বিদ্যালয়েও ভূমিকা অপরিসীম। জানার মাঝে অজানার জ্ঞানপিপাসা জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। কেবল শিক্ষাদানই নয়, সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য নৃত্য, সঙ্গীত, খেলাধুলো, সাহিত্যচর্চা, এ-সবেতেই উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। স্কুলগুলো আয়োজন করছে পড়ার বাইরেও নানা শিক্ষণীয় ও সৃজনশীল অনুষ্ঠান। এই নিশ্চিত, নিরাপদ, উষ্ণ সান্নিধ্য পড়ুয়াকে করে তুলছে আত্মদৃপ্ত। যা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে প্রশস্ত করছে তার যাত্রাপথ। স্কুলগুলোর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শিক্ষাক্ষেত্র বলতে যে সাধারণ বোধ জাগ্রত হয়, তার বাইরেও এরা বয়ে আনে অনেক সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। ■



বি.ডি. মেমোরিয়াল স্কুল বিল্ডিং

বি.ডি. মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট

১

মে, ১৯৬৬ সালের এক পূণ্য প্রভাতে যাত্রা শুরু হয়েছিল বি.ডি. মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট-এর। প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন দ্রৌপদী দেবী খৈতান। আর বিদ্যালয় পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল অধ্যক্ষা উষা মেহতার আন্তরিক প্রচেষ্টায়। যান্ত্রিকতা থেকে দূরে, প্রাকৃতিক বাতাবরণে অবস্থিত বিদ্যালয়টি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পুঁথিগত শিক্ষার বাইরেও এখানে নিয়মিত চর্চা হয় অনেক সৃজনশীল সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির। আছে সঙ্গীতভবন, কলাভবন, ইত্যাদি। 'ইমপালস্' নামাঙ্কিত অনুষ্ঠান তারই পরিচয়বাহী। কেন্দ্রীয় শিক্ষাপর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়ের ফলাফলও সন্তোষজনক।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত দিবাবিভাগীয় বোর্ডিং-এর ব্যবস্থাপনা বিদ্যালয়ের সাফল্যে নতুন মাত্রা এনেছে। সঙ্গে আছে সুবৃহৎ গ্রন্থাগার।

নানাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। সম্প্রতি কৃষাননাথের চিত্রকলা 'হিন্দুস্থান টাইমস' আয়োজিত প্রতিযোগিতায় প্রথম। **'হেলপজ ইন্ডিয়া'** অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম সুভাশিস বণিক। দক্ষিণ কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় ক্রিকেটে (অনূর্ধ্ব ১৪ বছর) স্বমহিমায় উদ্ভাসিত এখানকার ছাত্রছাত্রীরা। সর্বভারতীয় 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' পরিচালিত নৃত্যকলা প্রতিযোগিতায় প্রথম এই বিদ্যালয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত কার্টুন শিল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম অর্ণব পোদ্দার।

শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্ক করে আধুনিক পৃথিবীর যোগ্য নাগরিক করে গড়ে তোলাই এই বিদ্যালয়ের কামনা। শুভচেতনা হোক তাদের পাথেয়। ■



আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তন স্কুল বিল্ডিং

আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তন

১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা সংস্কৃতিমনা মানুষের হাত ধরে আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তনের যাত্রা হয়েছিল শুরু। তৎকালীন প্রধানশিক্ষিকা প্রিয়বালা দত্তের আন্তরিক পরিশ্রম এবং সমআদর্শে দীক্ষিতা সহশিক্ষিকাগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বর্তমানে এই বিদ্যালয় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

১৯৫৪ সালে প্রথম এই বিদ্যালয় থেকে ছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। ফলের নিরিখেও বিদ্যালয় বরাবরই যোগ্যতার পরিচয় রেখেছে।

শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে চলে আনুষঙ্গিক সৃজনশীলতার চর্চাও। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা 'উন্মেষ' তারই প্রমাণ রাখে।



আদর্শ বালিকার ছাত্রীরা এক্সকারশনে

প্রায় ন' বছর হল রুমা চট্টরাজ এই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এই ক'বছরে ছাত্রীদের সুবিধে ও উন্নতিকল্পে কর্মোদ্যোগের মধ্যে এগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১) বিদ্যালয় গৃহ সম্প্রসারণ
২) ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে প্রাইভেট বাসের ব্যবস্থা
৩) ক্যান্টিনের ব্যবস্থা
৪) ২৬ জানুয়ারি ও ১৫ অগস্ট দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ
৫) বিদ্যালয় থেকে ছাত্রীদের ন্যায্য দামে খাতা ও ১০% কমিশনে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ
৬) দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের জন্য অনুদান ব্যবস্থা
৭) কম্পিউটার সায়েন্স, নিউট্রিশন, মিউজিক ইত্যাদি বিষয়কে পাঠ্যক্রমের আওতায় আনা
৮) কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

এই বিপুল কর্মকান্ডের লক্ষ্য কিন্তু একটাই - সমাজের উপযুক্ত সংবেদনশীল মানুষ গড়ে তোলা। সহমর্মিতা, প্রচেষ্টার জোরে বাধার বেড়াজাল এড়িয়ে একদিন শতবর্ষের আলোকে দীপ্ত হোক এই প্রতিষ্ঠান, এই কামনা সত্যি হোক। ■

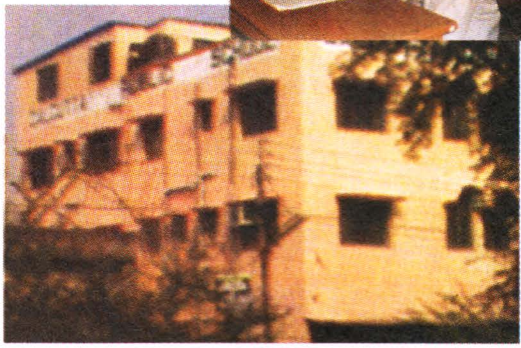
ক্যালকাটা পাবলিক স্কুল
(সি.আই.এস.সি.ই., নয়াদিল্লি অনুমোদিত)

এই স্কুলের একটিই লক্ষ্য - তা হল সাক্ষর ভারতবর্ষ। এই স্কুলের অন্তরে আছে দ্ররিদ্রদের জন্য প্রচুর ভালবাসা। ১৯৯৪ সালে খুব সাধারণভাবেই যাত্রা শুরু করে ক্যালকাটা পাবলিক স্কুল, ১৪৪/ই কালিকাপুর পূর্বলোকে। তখন ছিল মাত্র কয়েকজন ছাত্রছাত্রী, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল মহান। লক্ষ্য - সাধারণের জন্য শিক্ষা। এই স্কুলের বৈশিষ্ট্যই হল স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত অ্যাডভাইসারি বোর্ড ও কনভেন্ট শিক্ষিত তরুণ। উদ্যমী, উৎসাহী কর্মঠ শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষাদানে ব্রতী এই স্কুল আজ বিখ্যাত স্কুলগুলোর অন্যতম। সমাজের সব শ্রেণির পক্ষেই সহজসাধ্য খরচে এখানে পড়ানো হয়। যেসব অভিভাবক তাঁদের শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন, তাঁরা আজ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের গুণমানে অত্যন্ত আনন্দিত। শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে এই স্কুলের আই.সি.এস.ই.-তে সাফল্যের হার ১০০%।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই স্কুল যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছে। বিভিন্ন কুইজ, সঙ্গীত ও অঙ্কনের প্রতিযোগিতায় রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নানা পুরস্কার লাভ করেছে ক্যালকাটা পাবলিক স্কুল। এই স্কুল আগামী বছরে আরও অনেক সম্মান লাভ করবে। তিনটি স্ট্রিমেই আই.এস.সি. ক্লাস হয়। সামনেই তৈরি হবে নতুন বিস্তৃত ক্যাম্পাস। আধুনিকতম সুবিধে সমন্বিত বিল্ডিং।

পাঠ্যক্রম সুবিশাল তবুও সমাজ সেবা সংক্রান্ত নানারকম কাজ করায় স্কুল সমান উৎসাহী। নিজেদের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর জন্য তারা অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।





ক্যালকাটা পাবলিক স্কুল বিল্ডিং

সেইসঙ্গে একইভাবে চালায় একটি দাতব্য বিদ্যালয়, যেখানে থাকে দুপুরের আহারের ব্যবস্থা, বিনামূল্যে দেওয়া বই ও ইউনিফর্ম। স্কুলের লক্ষ্য ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার করা ও অন্তরকে উন্মুক্ত করা।

এ ছাড়াও স্কুলে আছে নানারকম সুযোগসুবিধা, যেমন, কেরিয়ার কাউন্সেলিং, ভোকেশনাল গাইডেন্স, হেলথ চেকআপ, যোগ ও ধ্যানের ব্যবস্থা ইত্যাদি। ■

স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠ, টালিগঞ্জ

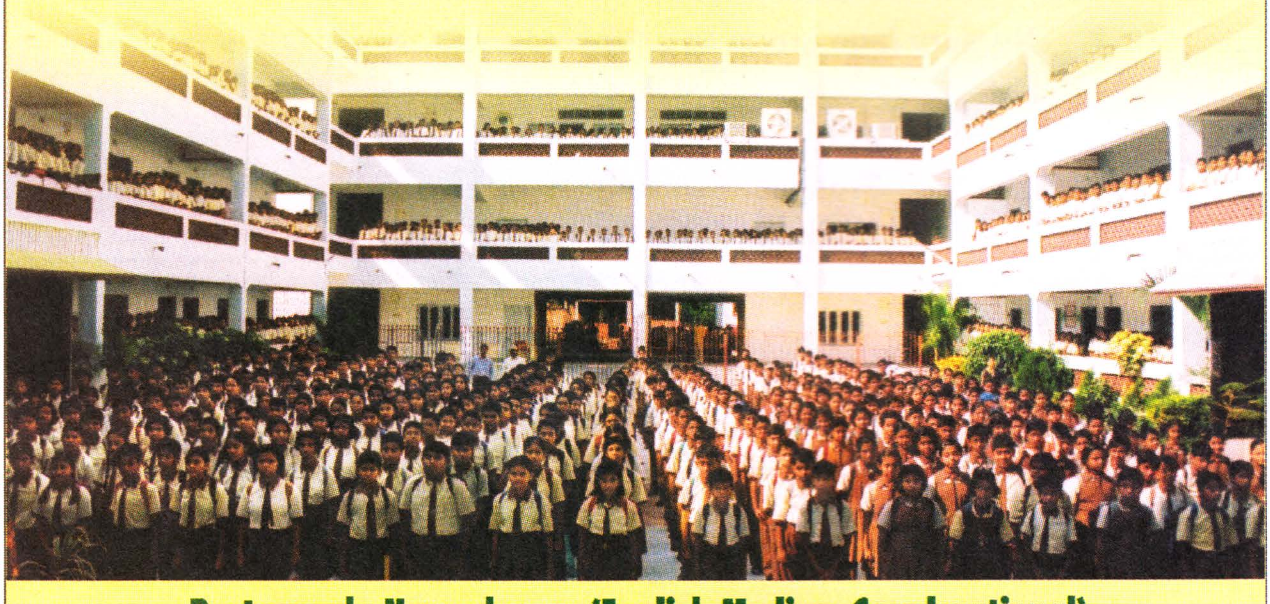
স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠ, টালিগঞ্জ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত নামী ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। এখানে নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য স্নেহময় আশ্রমিক পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষাদান করেন। স্কুলটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। প্রায় ২৫ বছর আগে এই স্কুলের শুরু। ছোট্ট স্কুল আজ ধীরে-ধীরে পূর্ণতা লাভ করেছে। উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য, তিনটি বিভাগেই পড়ানো হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল খুবই আকর্ষক। এই দুটি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা একশো ভাগ কৃতকার্য। পাঠ্যক্রমের সঙ্গে-সঙ্গে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির উপরেও জোর দেওয়া হয়। নাচ, গান, আবৃত্তি, কর্মশিক্ষা, কুইজ, বিতর্ক, খেলাধুলা,



কেমিস্ট্রি ল্যাবে ছাত্রছাত্রীরা

DECADES OF ACADEMIC EXCELLENCE of B. D. MEMORIAL INSTITUTE

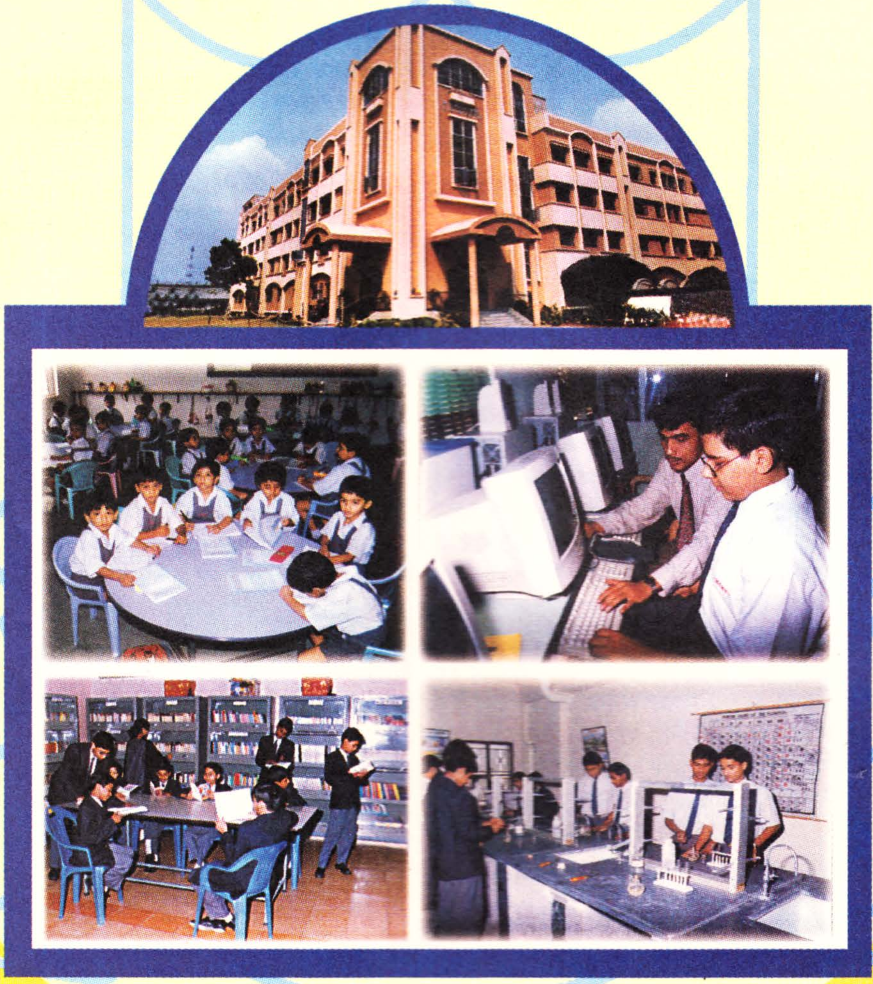
NOW AT YOUR DOORSTEP AT BORAL



Pratapgarh, Narendrapur (English Medium Co-educational)

Affiliated to Central Board of Secondary Education (Toddlers - XII)

In Persuit of Academic Excellence



M.C. Kejriwal Vidyapeeth for boys affiliated to ICSE & ISC provides a comprehensive array of academic, computer, sports, cultural, yoga and extra-curicular activities. The vision purports to groom likewise and caring, responsible citizens to meet the challenges of global society. MCKV has defined the cult of rare traditional values aptly blended with state-of-the-art process in educational scenario. From nursery to class XII MCKV's teachers and instructors have the proven abilities to provide exemplary guidance which become the hallmark of Vidyapeeth.

ADMISSION OPEN FOR ACADEMIC SESSION 2005-06 FOR CLASS XI IN SCIENCE, COMMERCE & ARTS STREAM

M.C. KEJRIWAL VIDYAPEETH

(ICSE/ISC AFFILIATED, ISO 9002 CERTIFIED, AN ENGLISH MEDIUM SCHOOL FOR BOYS)

243, G.T. Road (N), Liluah Howrah-711 204, Ph : 2654 3387/3388

Fax : 2654 9318, Email : mckv@kiswok.com, Website : www.mckv.org

anandadv@vsnl.net



ফিজিক্স ল্যাবে ছাত্রছাত্রীরা

সব বিষয়েই ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হয়। কম্পিউটার শিক্ষার জন্য আলাদা সময় রাখা হয়েছে এখানে। উপযুক্ত ল্যাবরেটরির (বিজ্ঞান ও ভূগোল) সুযোগ ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে থাকে। এই স্কুলের গ্রন্থাগারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রন্থাগারে বসেও পাঠের কাজ চলতে পারে, আবার বাড়িতে বই নিয়ে যাওয়ার সুযোগও আছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। স্কুলে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেমন তাদের উৎসাহী করে তোলা হয়, তেমনই বাইরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তাদের অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়। বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নানা প্রদর্শনী, ইন্টার হাউস প্রতিযোগিতা, ম্যাগাজিন ইত্যাদির মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়। পাঠ্যক্রমের একঘেয়েমি কাটাতে একাধারে শিক্ষা ও আনন্দের উপকরণ হিসেবে প্রতি বছর জুনিয়র ও সিনিয়র ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুটি পৃথক শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলার জন্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও করা হয়। এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন। তা ছাড়া কুইজ, আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে সসম্মানে সফল। ফুটবলে ২০০৫ সালে 'অনূর্ধ্ব ১৪ সর্বভারতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে' চ্যাম্পিয়ন বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছে এই স্কুলের ছাত্র বিশ্বজিৎ নট্ট। এখানকার আর এক ছাত্রী তুলি দাস 'আন্তর্জাতিক শান্তি চুক্তি'তে TTIS-এর তরফে বাংলার ছাত্রীদের একজন সদস্যা হিসেবে পাকিস্তানে শান্তি প্রচারে অংশগ্রহণ করেছে। সব মিলিয়ে এটি একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়েছে। ■

এম.সি. কেজরিওয়াল বিদ্যাপীঠ

১৯৯৭ সালে এক বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে, দেবী সরস্বতীর আরাধনার মুহূর্তে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি এস. এস. কেজরিওয়াল-এর মনে এম.সি. কেজরিওয়াল বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার ভাবনার বীজ বপন হয়েছিল। শীঘ্রই এই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে কোমল চারাগাছের রূপ লাভ করল ১৯৯৭ সালের ১৫ জুন এস.এস. কেজরিওয়াল মহাশয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে। ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে এই বিদ্যালয়ের কর্মপ্রণালী শুরু হল ৩৮৫ জন ছাত্র এবং ১৯ জন শিক্ষকের সহায়তায়।

সভাপতি মহাশয় স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন এক ঐতিহ্যশালী বিদ্যালয়ের, যেখানে ছাত্ররা ভবিষ্যৎ জীবনের সব প্রতিকূলতাকে জয় করে এগিয়ে চলার শিক্ষা পায়। তিনি আরও চেয়েছিলেন, ভারতীয় ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে ছাত্রদের অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলতে।

১৯৯৮ সাল থেকে সাত বছরের যাত্রা শেষে আজ সেই ছোট্ট চারাটি বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে, যার ছাত্রসংখ্যা ২,৫০০ জন এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ১২০ জনের বেশি।

আমাদের সভাপতি মহাশয়ে উদারতা ও উচ্চাশার কারণে সুযোগ-সুবিধে এখানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা অন্যের কাছে স্বপ্নমাত্র এবং কোনও ব্যক্তি এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে এলে অনুভব করবেন যে, এটি অতিকথন নয়। আমাদের সভাপতি এস.এস. কেজরিওয়াল এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র কিষাণ কেজরিওয়াল সর্বদা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে আমরা সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আরোহণে সমর্থ হব। এখানে মন্তেসরি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত (বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার) ছাত্ররা শিক্ষার সুযোগ পায়।

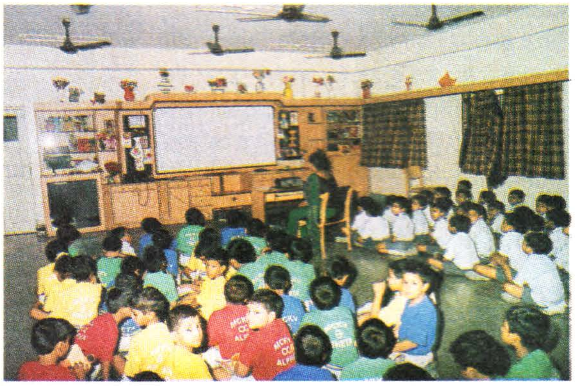


এম.সি. কেজরিওয়াল বিদ্যাপীঠ

আমাদের এখানে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং কম্পিউটার সংক্রান্ত গবেষণাগারের সুবিধে আছে।

আমাদের বিদ্যালয়ের গর্ব এক বিশাল গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারের আয়তন প্রায় ৩,০০০ বর্গফুট এবং একশোজনের বেশি ছাত্র এখানে একসঙ্গে পাঠের সুযোগ পায় - এর থেকে গর্বের বিষয় হল যে, এই গ্রন্থাগারটিকে 'বোধশক্তির চারুকেন্দ্র' আখ্যা দেওয়া যায়। ১২৯টি বিষয়কেন্দ্রিক প্রায় সাত হাজারের বেশি পুস্তক এবং এক বিশাল সংখ্যক দেশি বিদেশি সাময়িকপত্র রয়েছে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে।

ছাত্র ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্কুলে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন কর্মশালা, জ্ঞানবৃদ্ধিকারী প্রশিক্ষণ এবং আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষক এবং ছাত্রদের বিভিন্ন কর্মশালা এবং আলোচনা চক্রে যোগদানের জন্য বাইরে পাঠানো হয়। নামী প্রতিষ্ঠান থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে আসা হয় বিভিন্ন সময়ে জ্ঞানবৃদ্ধিকারী প্রশিক্ষণ দানের জন্য। (জুলাই ও জানুয়ারি) বছরে দু'বার শিক্ষক-অভিভাবকদের সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়। অভিভাবকরা এর ফলে তাঁদের সন্তানের নির্ধারিত শ্রেণিশিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের ব্যবহার এবং তাদের নির্ধারিত কার্যাবলি সম্পর্কে কথোপকথনের সুযোগ পান। এর ফলে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সাক্ষাৎকারপর্বে অভিভাবকদেরও নতুন ধারণা বা পরিকল্পনা দানের জন্য আহ্বান জানানো হয়, যার দ্বারা স্কুল এবং ছাত্ররা উপকৃত হতে পারে। ■


ক্লাসরুমের এক ঝলক

গার্ডেন হাই স্কুল

গার্ডেন হাই স্কুল হল সতীকান্ত গুহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক স্পনসর্ড একটি স্কুল। এই কো-এডুকেশনাল, ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি রাসবিহারী কানেক্টরের কাছে অবস্থিত। ৬০,০০০ বঃফুঃ আয়তনের স্কুল বিল্ডিংটি বালিগঞ্জ স্টেশন ও গড়িয়াহাট ক্রসিং-এর খুবই সন্নিকটে, যার ফলে আসা-যাওয়া সহজ। আর ব্যস্ত শহরের কোলাহল থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত, তাই নিরিবিলি পরিবেশে পড়াশোনা ভাল হয়।

স্কুলটিতে বর্তমানে নার্সারি থেকে (৩ + বয়োগোষ্ঠীর জন্য) ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস আছে। আই.সি.এস.ই. সিলেবাস অনুসরণ করে পড়ানো হয়। অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলেছে। যথাসময়ে ১১ ও ১২ শ্রেণির প্রবর্তন করা হবে। ইন্ডিয়ান বোর্ডের হাঃসেঃ কোর্সের বিকল্প হিসেবে স্কুল এই বছরের জুলাই মাসেই এ. এস. এবং এ. লেভেল কোর্সের প্রবর্তন করবে। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল এগজামিনেশনস, ইউ কে-এর সরাসরি অনুমোদন ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে।

গার্ডেন হাই-তে সকলেরই বিশ্বাস যে, বাবা-মায়েরা সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য স্কুলে পাঠায়। তাই এখানে পড়াশোনার উপর অতিমাত্রায় চাপ না দিয়ে শিশুমনকে বিকাশের পথে চলিত করা হয়। কারণ, প্রকৃত শিক্ষা হল শিশুকে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করা।

এখানে শিক্ষাগত উৎকর্ষকে প্রাধান্য না দিয়ে অনাবশ্যক বৈশিষ্ট্য

দিয়ে বাবা-মা'কে চমকে দেওয়ার কোনও চেষ্টা করা হয় না। যতই হোক, স্কুলের 'প্রাণ' হল লাইব্রেরি, খেলাধুলার মাঠ নয়। এবং পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যকলাপ সত্যিই পাঠ্যক্রমের 'অতিরিক্ত' হিসেবেই থাকবে। গার্ডেন হাই স্কুল : ৩১৮ প্রান্তিক পল্লি, রাজডাঙা, কলকাতা- ৭০০ ১০৭,। ফোন : ২৪৪১ ৩৮০৪ / ৩৮০৫ / ৪১৩১। ■



গার্ডেন হাই স্কুল বিল্ডিং

ফিউচার ক্যাম্পাস স্কুল

১৬ এপ্রিল ২০০৫ - আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যার বছরে, সাদা পাথরের উপর জন মিরো অনুসরণে ছবিতে মোড়া দেওয়াল আর চতুর্দিকে সবুজের মধ্যে সোনারপুরে ফিউচার ক্যাম্পাস স্কুলের উদ্বোধন করলেন আয়ান আলি বাঙ্গাশ সরোদ বাজিয়ে এবং ছবি এঁকে। সঙ্গে ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ড: পার্থ ঘোষ, ফাদার ম্যাথু প্রমুখ এবং স্কুলের চেয়ারম্যান শিলাজিৎ ঘোষ। জমজমাট অনুষ্ঠান, সঙ্গে আলোর বাজি। ফিউচার বেছে নিয়েছে সি.বি.এস.ই. বোর্ড, (ক্লাস লোয়ার কে.জি. থেকে বারো)। ফিউচারের বিশেষত্ব হল - স্কুলটি তৈরি করেছেন শিক্ষাবিদরা, যাঁরা গড়েছেন ফিউচার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং ফিউচার বিজনেস স্কুল (দুটিই AICTE অনুমোদিত)।

প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোলের প্রতি শিশুকে আকর্ষণ করা। তাদের ভাল লাগানো এবং তাদের মধ্যে জানার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলাই ফিউচারের উদ্দেশ্য। বড়দের জন্য থাকবে সর্বভারতীয় স্তরে কম্পিটিটিভ পরীক্ষার তালিম।



ফিউচার ক্যাম্পাস স্কুলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ফিউচার-এ ক্লাসপ্রতি তিরিশজনের বেশি ছাত্র নেওয়া হচ্ছে না। সর্বোপরি রয়েছে সব সময়ের জন্য ইন্টারনেট যোগাযোগ। ■

পরিশেষে

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কয়েকটি স্কুলের পরিকাঠামো ও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এখানে নিবেদন করা হল। আমরা দেখলাম, শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে তাদের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা এঁরা নিয়েছেন। আমরা আশা করি, এর সুফল স্বরূপ আমরা লাভ করব বেশ কিছু দ্বায়িত্ববান নাগরিক। যাঁরা হবেন ভবিষ্যতের কান্ডারি। অমরা দেখতে পাব এক উজ্জ্বল তারকাখচিত ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন করতে সক্ষম হবে আজকের এই শতদলেরা।



গা ছমছম

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

__আগে যা ঘটেছে:__ ময়নাগড়ে সবাই বেশ শান্তিতেই ছিল। একদিন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা অচেনা ছেলের সঙ্গে আলাপ হল উদ্ধববাবুর। ছেলেটা নাকি ম্যাজিক জানে। তার নাম হিজিবিজি। পাঁচুর সঙ্গে ভাব জমাল হিজিবিজি। টকাই চোরের হঠাৎ বৈরাগ্য দেখা দিল। হিজিবিজি জানাল, তার দেশের নাম রূপকথা। তারা যে ভাষায় কথা বলে তার নাম ডোডো। সে নাকি এখানে এসেছে কয়েকজন চোর-ডাকাতকে খুঁজতে। হরগোবিন্দ ঘোষালের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে শিবেন ফিরে এল খাজাঞ্চিখানায়। সেখানে শ্যামাচরণ বলল যে, শিবেনের ঘরে নাকি চোর ঢুকেছিল। শিবেনের ধারণা, ভজহরি তার রিসার্চের থিসিস চুরি করবেই। ভজহরিও রিসার্চ করে। ছদ্মবেশ ধরতেও নাকি ওস্তাদ ভজহরি। থিসিসটা লুকিয়ে রাখার জন্য অনেক রাতে লুকিয়ে রাজবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল শিবেন। সেখানে অন্ধকারে কে একজন তাকে চিনে ফেলল। শিবেনের ধারণা, লোকটা ভজহরি। সে শিবেনকে বলল, রাজবাড়িতে মাটির নীচে পানিঘর আছে। সেখানে খাবার জল রাখা হত। সেই ঘরটা শিবেনকে খুঁজে বের করে দিতে হবে। তারপর...

শিবেন একমত হয়ে বলল, "সে তো ঠিক কথাই হে ভজহরি। চারদিকে তো চাপেরই জয়জয়কার দেখছি। গরম ইস্তিরি দিয়ে চেপে ধরলে কোঁচকানো কাপড় যেমন সটান হয়ে যায়, ফোঁড়া টনটন করছে তো চেপে ধরো, পুচ করে পুঁজ বেরিয়ে ব্যথা আরাম হয়ে যাবে। এই তো সেদিন একটা কাঁকড়াবিছে চটি দিয়ে চেপে ধরলুম, ব্যাটা চ্যাপটা হয়ে গেল। না হে ভজহরি, যে যত চেপে ধরতে পারে তারই তত সুবিধে।"

"হ্যাঁ শিবেন, চাপ দিতে জানলে সব কাজ হয়। তাই বলছিলাম, তুমিও যদি শ্যামাচরণের উপর একটু চাপ সৃষ্টি করতে পার, তা হলে পানিঘরের কথা সে লক্ষ্মীছেলের মতো বলে দেবে।"

"কিন্তু কীরকমভাবে চাপ সৃষ্টি করতে হবে ভজহরি? তার বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসতে হবে কি?"

"হুঁ, সে প্রস্তাবও মন্দ নয় বটে। তবে কী জানো? শ্যামাচরণ বুড়ো মানুষ। তার উপর রোগাভোগা। তোমার মতো একটা দশাসই লোক বুকে চেপে বসলে হিতে বিপরীত হতে পারে তো! শ্যামাচরণ পটল তুললে পানিঘরের হদিশ দেবে কে?"

"তাই তো ভজহরি, আমার ওজন যে দু' মন দশ সের, সেই কথাটা মনে ছিল না। তা হলে কি গাঁ থেকে একটু হাল্‌কা দেখে কাউকে ডেকে

আনব ভজহরি?"

"তুমি খুবই বুদ্ধিমান হে শিবেন। তবে কিনা অন্য কেউ শ্যামাচরণের উপর চাপ সৃষ্টি করতে না-ও চাইতে পারে। যাই হোক, এ-ব্যাপারে অন্য কাউকে চাপাচাপি করার দরকার নেই। তুমি বরং একটা কাজ করো, আমার পিস্তলটা নিয়ে যাও। চাপ সৃষ্টি করার পক্ষে এটা খুবই ভাল জিনিস।"

"কিন্তু ভাই, পিস্তল দিয়ে আমি যে কোনওদিন চাপ সৃষ্টি করিনি। কী করে করতে হয় তাও জানি না।"

"তোমাকে কিছুই করতে হবে না শিবেন। পিস্তল নিজেই চাপ সৃষ্টি করবে। তুমি শুধু জুতমতো বাগিয়ে ধরে কঠিন গলায় বলবে, 'পানিঘরের সন্ধান যদি না দাও, তা হলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।' "

"বাঃ, এ তো সোজা কাজ! কিন্তু পিস্তলটা আবার ফুটেটুটে যাবে না তো! একটু আগে তুমিই যেন বলছিলে, বন্দুক, পিস্তল অনেক সময় ফুটে যায়।"

"সব কাজেরই বিপদের দিক থাকে হে শিবেন। ভয় পেও না! পিস্তলের উপর চাপ সৃষ্টি না করলে সে কিছু করবে না।"

"কথাটা যেন কী বলতে হবে?"

" 'পানিঘরের সন্ধান যদি না দাও তা হলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।' অবশ্য প্রথমেই কথাটা বলার দরকার নেই। আগে একটু আদুরে গলায় আদর করার মতো পানিঘরের সন্ধান চাইবে। তারপর একটু অভিমান করে ঠোঁট ফোলাবে। তাতেও কাজ না হলে গৃহত্যাগ করার হুমকি দেবে। তারপর চোখ রাঙাবে। তারপর ভয় দেখাবে। শেষ অবধি কাজ না হলে পিস্তল বাগিয়ে ওই কথাটা বলবে। পারবে না শিবেন? না পারলে তোমার থিসিস..."

"খুব পারব, খুব পারব," বলে শিবেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, "দাও ভাই ভজহরি, তোমার পিস্তলটা আমাকে দাও। এক্ষুনি গিয়ে শ্যামাচরণের উপর চাপ সৃষ্টি করে পানিঘরের হদিশ জেনে আসছি। শুধু কথা দাও, পানিঘরের হদিশ দিলে তুমি আমার থিসিসটার দিকে হাত বাড়াবে না।"

"পাগল নাকি! শত হলেও আমি তোমার ছেলেবেলার বন্ধু। কথার খেলাপ হবে না ভাই। পানিঘরের খবর দিতে পারলে তোমার কোনও ভয় নেই।"

ছায়ামূর্তি অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে শিবেনের হাতে যে জিনিসটা দিল, সেটা ছোট হলেও বেশ ভারী। পিস্তল সম্পর্কে শিবেনের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। সে শঙ্কিত গলায় বলল, "ভাই ভজহরি, এ তো তে-কোনা একটা বিচ্ছিরি চেহারার জিনিস। এটার কোন মুখ দিয়ে গুলি বেরোয় তা তো জানি না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছায়ামূর্তি বলল, "হাতলটা ধরে নলটা তাক করতে হয়। উলটোপালটা করে ফেললে কিন্তু তোমার পিস্তলের গুলি তোমাকেও ছেড়ে কথা বলবে না।"

"ওরে বাবা, এ তো খুব বিপদের জিনিস ভাই ভজহরি!"

ছায়ামূর্তি একটু দূরে সরে গিয়ে আড়াল থেকে বলল, "খুব বিপজ্জনক। প্রাণ হাতে করেই কাজ হাসিল করতে হবে। থিসিসটার জন্য এটুকু বিপদ কি খুব বেশি হল হে শিবেন?"

"কিছু না, কিছু না। থিসিসের জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।"

"বাঃ, এই তো বীরের মতো কথা!"

শিবেন এক হাতে পিস্তল, অন্য হাতে থিসিসের ফাইলটা শক্ত করে ধরে অন্ধকারে সাবধানে ঘর পেরিয়ে জানলা গলে বেরিয়ে এল। ভজহরির খপ্পর

থেকে থিসিসটাকে বাঁচাতে হলে তাকে কিছু বিপদের ঝুঁকি নিতেই হবে, অন্য উপায় নেই।

বাগান পার হয়ে খাজাঞ্চিখানায় পৌঁছে সে সোজা শ্যামাচরণের দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখল, শ্যামাচরণের দরজা হাট করে খোলা। ভিতরে কেউ নেই। নিবু-নিবু টর্চের আলোয় সে ঘরখানা ভাল করে দেখে নিয়ে বাইরে এসে চারদিকটা খুঁজল। লোকটা গেল কোথায়?

॥৫॥

নিজের বাড়িতে পাঁচু যে ঘরটায় শোয় সেটাকে ঘর বললে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। ঘর হতে গেলে যা-যা লাগে তার অনেক কিছুই নেই। যেমন ঘরের জন্য চাই চারটে দেওয়াল বা বেড়া। তা পাঁচুর ঘরখানার বেড়া মোটে তিনটে। অন্য দিকটা হাঁ করে খোলা। বারান্দার এক কোণে দু'দিক কোনওরকমে বেড়া দিয়ে ঘিরে পাঁচুর বৈঠকখানা তৈরি হয়েছে। দরজা মোটে নেই, তার দরকারও হচ্ছে না। একটা দিক উদোম খোলা। তা তাতে পাঁচুর কোনও অসুবিধেও নেই। রাতবিরেতে রাস্তার কুকুর-বেড়ালরা এসে তার নড়বড়ে তক্তপোশের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। বর্ষাবাদলায় আর এই শীতকালটায় যা একটু অসুবিধে। তা সেসব পাঁচু গায়ে মাখে না। ওসব তার সয়ে গেছে। উদোম ঘরে থাকে বলে মাঝে-মাঝে নানা ঘটনাও দেখতে পায়। এই যে গাঁয়ের নিশি চৌকিদার ঘুমোতে-ঘুমোতে গাঁ চৌকি দিয়ে বেড়ায়, এ কি কেউ জানে? পাঁচু জানে।

তা একদিন সে নিশি চৌকিদারকে দিনের বেলায় বাজারে পাকড়াও করে বলল, "ও নিশিদাদা, রাতে যখন তুমি গাঁয়ে পাহারা দাও, তখন তোমার নাক ডাকে কেন গো?"

নিশি চোখ বড়-বড় করে বলল, "ওরে চুপ-চুপ! কাউকে বলে ফেলিসনি যেন! অনেক সাধ্যসাধনা করে শেখা রে ভাই, লোকে টের পেলে পঞ্চায়েতে নালিশ হবে, আমার চাকরি যাবে।"

"কিন্তু কেউ কি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে হাঁটতে পারে?"

"আহা, কাজটা এমন শক্তই বা কী! পা দু'খানাকে জাগিয়ে রেখে আমার বাকিটা ঘুমোয়। অব্যেস করলে তুইও পারবি।"

এই যেমন বিষ্ণু চোর। তার স্বভাব হল কারও বাড়ি থেকে সোনাদানা, টাকাপয়সা বা গয়নাগাটি সরাবে না। তার লোভ হল খাবার জিনিস। একদিন গ্রীষ্মকালে বিষ্ণুর পিছু নিয়েছিল পাঁচু। রাত বারোটা নাগাদ বিষ্ণু উদ্ধববাবুর বাগানে বসে আস্ত একখানা পাকা কাঁঠাল, কুড়িখানা পাকা আম খেল। তারপর পশুপতিবাবুর বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে আধ হাঁড়ি পান্তা আর তেঁতুল দিয়ে রান্না চুনো মাছের ঝোল খেল। নরহরিবাবুর বাড়িতে কিছু না পেয়ে খেল আধ ডজন কাঁচা ডিম। ব্যায়ামবীর গদাধরের বাড়িতে সারারাত ধরে নিচু আঁচে এক সের মাংসের আখনি রান্না হয়, সকালে গদাধর ব্যায়ামের পর সেটা খায়, তা বিষ্ণু সেই এক হাঁড়ি আখনি চেটেপুটে খেয়ে যখন শ্রীপদদের বাড়িতে ঢুকে তাদের মিষ্টির দোকানের জন্য রাতে তৈরি করা রসগোল্লার গামলা সাবড়ে ফেলল, তখন পাঁচু আর থাকতে না পেরে সামনে গিয়ে সটান বলল, "বিষ্ণুদাদা, বলি এত খাবারদাবার যাচ্ছে কোথায় বলো তো! ভগবান তো তোমাকে একটার বেশি পেট দেয়নি।"

বিষ্ণু খুব অভিমান করে বলল, "আমার খাওয়াটাই বেশি দেখলি রে পাঁচু! বেহান থেকে শুরু করে সুয্যি পাটে নামা অবধি আমাকে কখনও কুটোগাছটি দাঁতে কাটতে দেখেছিস? সারাদিন উপোসি পেটে পড়ে-পড়ে ঘুমোই, এই নিশুত রাতেই যা দু'টি পেটে যায়। খাওয়াটা দেখলি আর উপোসটা দেখলি না?"

তা আজ রাতেও পাঁচুর ঘুম আসছিল না। তার তক্তপোশের নীচে যে কেলো কুকুরটা থাকে, সেটা মাঝে-মাঝে কেন যেন খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠছিল। থানার পেটা ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে রাত দু'টো বাজল, তখন হাই তুলে উঠে বসে রইল পাঁচু। আজ বড্ড শীত পড়েছে, ছেঁড়া কম্বলে শীত মানছে না। ঠান্ডায় হাত-পায়ে ব্যথাও হয়েছে খুব। চারদিকে ঘন কুয়াশা, অন্ধকার। তবে পাঁচু অন্ধকার আবছায়াতেও অনেক কিছু দেখতে পায়। তার চোখ খুব ভাল। কানও সজাগ। গাছের পাতা খসলেও সে টের পায়।

ঘণ্টার রেশ মিলিয়ে যাওয়ার পরই সে সামনের রাস্তায় যেন একজোড়া খুব হাল্কা পায়ের শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা এতই ক্ষীণ যে, অন্য কেউ টেরই পাবে না। রাতে যারা ঘোরাফেরা করে তাদের পায়ের শব্দ পাঁচু খুব চেনে। কিন্তু এটা চেনা শব্দ নয়। দক্ষিণ থেকে কেউ উত্তরমুখো যাচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছে বেশ ধীরেসুস্থে, যেন বেড়াতে বেরিয়েছে।

পাঁচু বিছানা থেকে নেমে বারান্দা পেরিয়ে সামনের জমিটা ডিঙিয়ে রাস্তায় উঠে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। দেখল, খুব বেঁটেমতো গোলাকার চেহারার একটা কিম্ভূত কিছু দুলে-দুলে আসছে। কাছে আসতেই ভারী অবাক হয়ে গেল পাঁচু। মানুষ নাকি? এ কীরকম ধারা মানুষ?

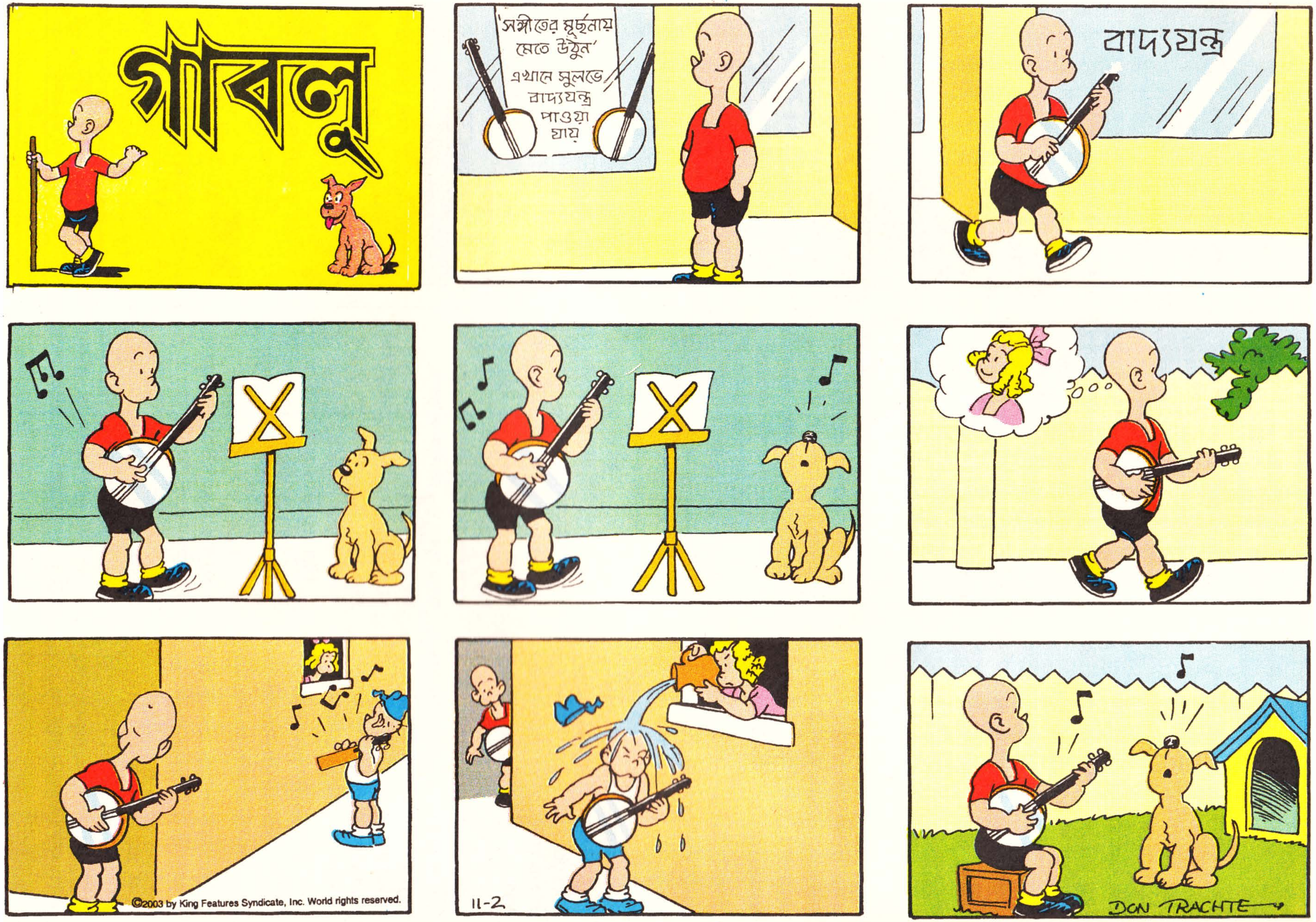
কাছাকাছি আসতেই বস্তুটাকে দেখতে পেল পাঁচু। চোখ কচলে ফের ভাল করে তাকিয়ে দেখল, বস্তুটা মানুষের মতো নয়, আবার মানুষ বললেও ভুল হয় না। বুক, পেট, সব যেন একটা গোলাকার বলের মতো। তার উপরে বেজায় বড় একটা মুন্ডু, দু'খানা বেঁটে পা, দু'খানা ছোট-ছোট হাত, এরকম বেঢপ মানুষ পাঁচু কখনও দেখেনি।

হাঁটতে-হাঁটতে মানুষটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে চারদিকটা চেয়ে দেখে নিল। আর সেই সময় মন্ডুটা দিব্যি ডাইনে-বাঁয়ে পাক খেল। ঘাড় না থাকলেও মুন্ডু যে এমন ঘুরতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। চারদিকটা দেখে মানুষটা হঠাৎ শিসের মতো একটা সরু শব্দ করল। ভারী মিঠে সুরেলা শব্দ। অনেকটা বাঁশির মতো। সুরটা পাঁচুর চেনা সুর নয়। কিন্তু এতই সুন্দর যে, শুনলে প্রাণ-মন ভরে যায়। অল্প একটু শুনেই পাঁচুর যেন ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল।

একটু দাঁড়িয়ে মানুষটা আবার হেলেদুলে হাঁটতে শুরু করল। আর শিস দিচ্ছে না। একটু দূরে থেকে পাঁচু নিঃশব্দে লোকটার পিছু নিল। লোকটা মাঝে-মাঝে দাঁড়াচ্ছে, শিস দিচ্ছে, ফের হাঁটছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না পাঁচু। কিন্তু কে জানে কেন, লোকটাকে তার খারাপ বলেও মনে হচ্ছে না।

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

ছবি: সমীর সরকার


গাবলু
'সঙ্গীতের মূর্ছনায় মেতে উঠুন'
এখানে সুলভে বাদ্যযন্ত্র পাওয়া যায়
বাদ্যযন্ত্র
11-2
DON TRACHTE



ট্রোফি হাতে ইনজ়ামাম-উল হক

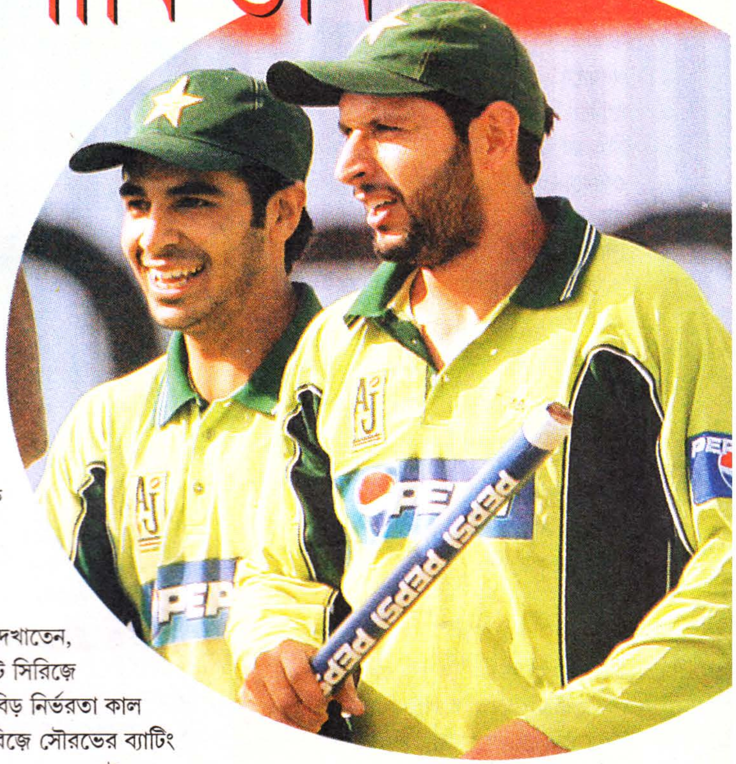
ভারতের মাটিতে শক্তি দেখাল পাকিস্তান

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দু'দেশের ক্রিকেট যুদ্ধের কাছে হার মানবে 'অ্যাসেজ'-ও! মার্চ-এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট সিরিজ়। তারই বিশ্লেষণ করেছেন সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্টে প্রায় পর্যদুস্ত হয়েও ১-১ ফলে সিরিজ় ড্র। ০-২-এ পিছিয়ে থেকে ৪-২-এ একদিনের ম্যাচের সিরিজ় জয়! পাকিস্তান দল যখন 'রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস' ছাড়া ভারতে খেলতে এসেছিল, তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিল এমনটা ঘটবে! হোক না পাকিস্তান, এক বছর আগেও তো ওরা ঘরের মাঠে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল 'টিম ইন্ডিয়া'র কাছে। এবার কাগজে-কলমেও ইনজ়ামামদের তো শিশুই মনে হচ্ছিল সৌরভ বাহিনির সামনে। বলা হচ্ছিল লড়াই হবে গজ-কচ্ছপের! কিন্তু ক্রিকেট খেলাটা যে কাগজে-কলমে হয় না, তা আবার প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন ইনজ়ামামের দল। সেই সঙ্গে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার 'ব্যাটিং গভীরতা'!

মোহালিতে প্রথম টেস্টে প্রথম চারদিন প্রাধান্য রেখেও ম্যাচ জিততে পারল না ভারত। বলা ভাল, জিততে দিল না কামরান আকমল এবং আব্দুর রজ্জাকের ব্যাটিং! সেই যে পাকিস্তান আত্মবিশ্বাসটা পেল, আর তাদের পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কলকাতায় দ্বিতীয় টেস্টে কুম্বলের ঘূর্ণি বোলিংয়ের সুবাদে ১৯৫ রানে টেস্ট জিতলেও, একটা সময় যখন ইউনিস খান এবং ইউসুফ ইওহানা ব্যাটিং করছিলেন, তখন কিন্তু ম্যাচ ৫০-৫০ ছিল। বাঙ্গালোরে পাকিস্তান দলের অধিনায়ক খেলতে নামলেন, তাঁর জীবনের ১০০তম টেস্ট। ম্যাচটা জিতলেনও! প্রথম ইনিংসে নিজে খেললেন ১৮৪ রানের এক 'এপিক ইনিংস'। সামনে থেকে এভাবে দলকে নেতৃত্ব দেওয়াটা কিছুদিন আগে পর্যন্তও একজনই করে দেখাতেন, স্টিভ ওয়! আসলে, টেস্ট সিরিজ়ে অতিরিক্ত সহবাগ ও দ্রাবিড় নির্ভরতা কাল হল ভারতের। সারা সিরিজ়ে সৌরভের ব্যাটিং শ্রীকান্ত, বেদির মতো সমালোচকদের ইন্ধন জুগিয়ে গেল।

শুরু হল একদিনের সিরিজ়। প্রথম থেকেই পাকিস্তানকে এগিয়ে রাখছিলেন ক্রিকেট-বোদ্ধারা। গত চারটি একদিনের ম্যাচে বব উলমারের টিমের কাছে মাত হয়েছিল জন রাইটের টিম। প্রথম দু'টি ম্যাচে হল 'রান-ফিস্ট'! দু'বারই সৌরভ টসে জিতলেন এবং প্রথমে ব্যাট করে বিশাল রান করল 'মেন-ইন-ব্লু'! নজফগড়ের বীরুর দোসর ছিলেন 'দ্রাবিড়-দ্য ওয়াল' এবং মহেন্দ্র সিংহ ধোনী। তাঁদের সামনে প্রায় খড়কুঠোর মতো উড়ে গেল পাকিস্তান! 'ল্যাপটপ কোচ'-এর সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ! কিন্তু কতদিন আর দু'-একজন মিলে ম্যাচ জেতাবেন! ফলে, যা হওয়ার তাই হল! যেই সহবাগ ব্যর্থ, সঙ্গে-সঙ্গে বিপর্যস্ত ভারত! আফ্রিদি, মালিক, রজ্জাক, এবং সর্বোপরি ইনজ়ামামের ব্যাটিং-ঝড়ে পরপর চারটি ম্যাচ জিতে পাকিস্তান পেপসি কাপ জিতে নিল ৪-২-এ। তার মাঝেই ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের 'সৌজন্যে' সৌরভের কপালে জুটল ছ' ম্যাচের সাসপেনশন। সিরিজ়ের সেরা নির্বাচিত হলেন নাভেদ-উল হাসান রানা। শোয়েব আখতার ভারতে এলে হয়তো খেলার সুযোগই পেতেন না এই বোলারটি!



একদিনের ম্যাচের সিরিজ় জেতার পিছনে দুই কারিগর, সালমন বাট ও শাহিদ আফ্রিদি

সিরিজ় শেষে ইনজ়ামামরা দেশে ফিরলে তাঁদের জন্য পুরস্কারের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়। আর ভারতের জন্য রইল একরাশি সমস্যা। একে তো দলের কোচ জন রাইটের এটা ছিল শেষ সিরিজ়। তায়, অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ফর্ম। গত দু'বছর যে টিম-গেম খেলে সারা বিশ্বের সমীহ আদায় করে নিয়েছিল 'টিম-ইন্ডিয়া', সেটা দলে ফিরিয়ে আনাটা এখন যিনি কোচ হবেন, তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

ফ্রি স্টাইল

পরাজিত বেকহ্যাম

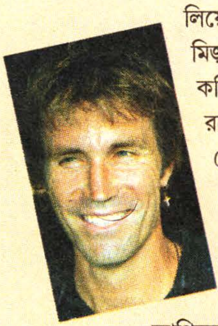
ফের ডেভিড বেকহ্যাম খবরের শিরোনামে। এবার ফ্যাশন যুদ্ধে হেরে যাওয়ার জন্য! এই ফুটবল তারকাকে গ্ল্যামারে হারিয়ে দিলেন রিও ফার্দিনান্দ। বেকহ্যাম শুধু হারেননি, শিরোপা পেয়েছেন 'ওয়ার্স্ট ড্রেসড ম্যান'-এর।



ইংল্যান্ডের একটি মেয়েদের পত্রিকা, 'জি কিউ' আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় জিতেছেন রিও ফার্দিনান্দ। তবে গত তিন বছরের জয়ী বেকহ্যামের সঙ্গে জঘন্যতম পোশাকপরিচ্ছদ পরিহিতদের মধ্যে রয়েছেন নাৎজি পোশাক পরে 'কুখ্যাত' হওয়া প্রিন্স হ্যারি!

কলকাতায় ক্যাশ

বাংলার খুদে টেনিস খেলোয়াড়দের শেখাতে কলকাতায় আসছেন প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন প্যাট ক্যাশ। লিয়েন্ডার পেজ বা সানিয়া মির্জা হওয়ার জন্য কচিকাঁচাদের ভিড় লেগেই রয়েছে টেনিস শেখানোর কেন্দ্রগুলোতে। বাংলা থেকেও সর্বভারতীয় টেনিসে রূপেশ রায়, শিবিকা বর্মনদের মতো উঠতিরা সাড়া জাগিয়েছে। রূপেশ ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়ার সুযোগও পেয়েছে। বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় তিন দিনের এক বিশেষ স্কিমে ছোটদের আরও উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে আসছে ১৯৮৭-র উইম্বলডনজয়ী এই অস্ট্রেলিয়কে। নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

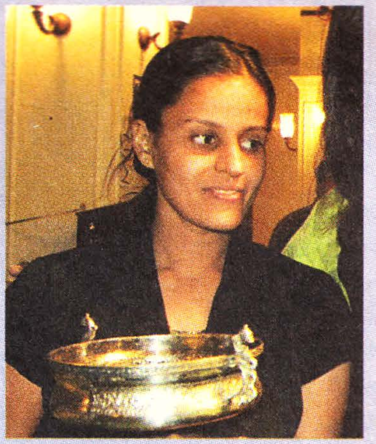


চতুর্থ অস্কার

বাকিদের টেক্কা দিয়ে ফের দাবায় অস্কার জিতে নিলেন ভারতীয় দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ। এবার নিয়ে চতুর্থবার এবং টানা দু'বার। এমন কৃতিত্ব রাশিয়ান দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ ছাড়া অন্য কারও নেই! অ্যাম্বর ব্লাইন্ডফোল্ড ও র‍্যাপিড দাবায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে চতুর্থবার অস্কার জিতে নজির গড়ে ফেললেন ৩৫ বছরের এই ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। এই মুহূর্তে ফিডে রেটিংয়ে তিনি সবচেয়ে উপরে। তাঁর পয়েন্ট ৫,০২৬। ৩,৬৬৪ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন প্রতিযোগিতামূলক দাবা থেকে সদ্য অবসর নেওয়া কাসপারভ। ২০০৪ সালে তিনি জীবনের সেরা দাবা খেলেছেন বলে দাবি করেছেন স্বয়ং আনন্দ। তাঁর সেই দাবিকে জোরদার করল এই অস্কার। এটা তো সবাই জানে যে, দাবায় অস্কার জেতা মানেই দাবা পণ্ডিতদের স্বীকৃতি পাওয়া!

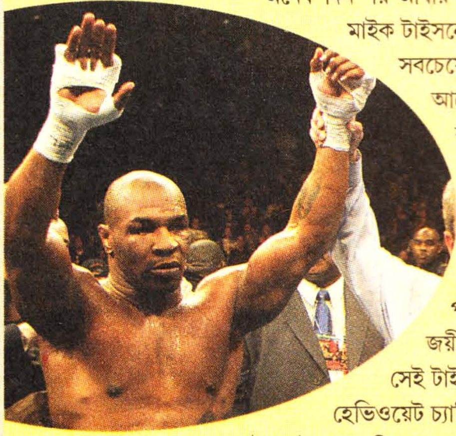


এবার বিলিয়ার্ডসে



খেলাধুলোয় এখন ভারতেরই সময়। সানিয়া মির্জা, পঙ্কজ আডবাণীর পর এবার অনুজা ঠাকুর। এই ২২ বছরের মরাঠি বিলিয়ার্ডসে মহিলাদের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন। ইংল্যান্ড অ্যামেচার বিলিয়ার্ডস অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। পঙ্কজ আডবাণীর বিশ্বজয়ের পর অনুজার এই কৃতিত্ব বিলিয়ার্ডসে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব চূড়ান্তভাবে কায়েম করল। ৭ এপ্রিল কেমব্রিজ স্নুকার সেন্টারে স্কটল্যান্ডের লিনেট হর্সবার্গকে ২৪৩-১৩৬ পয়েন্টে হারিয়ে তিনি এই সম্মান পান। পকেটস্থ করেন ৩০০ পাউন্ড এবং ১৫ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট। গত তিনবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন অনুজার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছিলেন আরও দুই ভারতীয়, অনুজার বোন মিনাল এবং চিত্রা ম্যাগিমাইরাজ। তাঁরা অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালেই হেরে গেয়েছিলেন।

আবার টাইসন



অনেক দিন পর আবার তাঁর নামটা শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, বিতর্কিত বক্সার মাইক টাইসনের কথা বলছি। এক সময় বক্সিং ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হয়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে বক্সিংয়ের পাশাপাশি নানা বিতর্কে জড়িয়ে বারে বারে খবরের শিরোনামে এসেছেন। একবার তো ডব্লিউ বি এ হেভিওয়েট বক্সিং লড়াইয়ে নেমে প্রতিপক্ষ বক্সার হোলিফিল্ডের কান কামড়ে মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছিলেন। ওই কাণ্ডের পরই তাঁর বক্সিং লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। জয়ী হোলিফিল্ডকে যেতে হয়েছিল হাসপাতালে। সেই টাইসন আবার ফিরছেন রিংয়ে। প্রাক্তন এই হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন আগামী ১১ জুন ওয়াশিংটনের এম সি আই সেন্টারে কেভিন ম্যাকব্রাইডের মুখোমুখি হচ্ছেন।

চন্দন রুদ্র

ANANDAMELA MAY 2005 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 INR 15.00
LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06